Aneek 50

Part - II

[1972 July to 1975 July]

Collection of articles from old issues of Aneek

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : অনীক

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

গ্রন্থ সৌষ্ঠব : মিন্টু দত্ত

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০১৩২ থেকে মুদ্রিত

দাম : ২৫০.০০ টাকা

আমাদের কথা

প্রত্যাশামতো অনীক ৫০-এর দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হলো। এই দ্বিতীয় সংকলনের অধিকাংশ লেখাই অনীক-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী নিজেই নির্বাচন করেছিলেন।

এই সংকলনে রয়েছে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের লেখাপত্র। ১৯৭২-এর জুলাই থেকে অনীক তার ইতিপূর্ব চরিত্র পরিবর্তন করে সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতির বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা থেকে রূপান্তরিত হয় মূলত সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকায়। এই রূপান্তরের পেছনে যেমন পাঠকদের ধারাবাহিক দাবি ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পত্রিকার পক্ষ থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক থাকার তীব্র আকুতি।

এই সময়সীমায় ঘটে ভারতের বুকে নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান, বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনে ভাটার টান, পোখরান-১ নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ, ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, ভারতের সিকিম-গ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্র তার গণতান্ত্রিক আবরণটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে।

একটি আইনি এবং রেজিস্টার্ড পত্রিকা প্রকাশের দায়ে প্রয়াত সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী কারারুদ্ধ হন। অনীক-এ প্রকাশিত সিকিম বিষয়ক প্রবন্ধগুলিই নাকি এই কারাবাস-এর আপাত কারণ। অনীক-এর জুলাই, ১৯৭৫ সংখ্যায় যে ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তাতে স্পষ্টতই জরুরি অবস্থা জারির মতো চরম সম্ভাবনার উল্লেখ ছিল। এই সংকলনে প্রকাশিত লেখাগুলি সেই উত্তাল সময়ের বিশ্বস্ত দলিল।

অনেক ব্যস্ততা এবং শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও এই সংকলনের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রী বদরুদ্দীন উমর। তিনি অনীক-এর দীর্ঘদিনের সুহৃদ। শ্রী অজয় গুপ্ত সেই যে আমাদের আকর্ষণ করে নিলেন প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ সৃজন করে, আমরা তাঁর কাছে এবারেও বাঁধা পড়লাম।

প্রেসের বন্ধুরা আমাদের ঘরের মানুষ— তাঁরা হাসিমুখে আমাদের নানান বাস্তব-অবাস্তব দাবিকে সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছেন। পাঠকদের ধন্যবাদ, আমাদের পাশে ধারাবাহিকভাবে থাকার জন্য।

২৭.১.২০১৪ সম্পাদকমণ্ডলী

ভূমিকা

বদরুদ্দিন উমর

পঞ্চাশ বছর ধরে একটানাভাবে 'অনীক' প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এটা এক অসামান্য অর্জন। 'পুনশ্চ' নামে ১৯৬৪ সালে এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর, ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে, পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অনীক'। সেই নামেই আজ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত আছে। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়ই 'অনীক'-এর নামের সাথে পরিচিত ছিলাম, যদিও পত্রিকাটির কপি তখনও দেখিনি। ১৯৭২ সালে 'অনীক'-এর সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী ঢাকা আসেন। তখনই তাঁর সাথে পরিচয় হয় এবং তিনি আমাকে পত্রিকা দেন।

তাঁর সাথে সে সময় একাধিকবার দেখা হয়েছিল। বাঙলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হতে তিনি বিশেষভাব আগ্রহী ছিলেন। কাজেই সে বিষয়ে তাঁর সাথে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেড়শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সংকলন বের করেছিলেন, যাতে আমার একটি লেখা ছিল। সংকলনটি ১৯৭১ সালে কলকাতায় পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল। তিনি তাতে আমার লেখাটি দেখেছিলেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের ওপর বিস্তারিতভাবে 'অনীক'-এ লেখার জন্য। আমি সম্মত হয়ে লেখা দিয়েছিলাম যা ১৯৭৩ সালে শারদীয় সংখ্যা থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ সংখ্যা পর্যন্ত 'অনীক'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই থেকে 'অনীক'-এর সাথে আমার সম্পর্ক, যা আজ পর্যন্ত বজায় আছে।

বাঙলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবাঙলায় কিছু কথাবার্তা ও লেখা সে সময় হলেও এখানকার পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ বিশেষ দেখা যায়নি। দীপংকর চক্রবর্তী বাঙলাদেশে একাধিকবার এসে বাঙলাদেশের ওপর যে রিপোর্টগুলি লিখেছিলেন তাতে তিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা এবং কিছু বুদ্ধিজীবীর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। সংবাদপত্রে এবং এই বিষয়ক লভ্য সাহিত্য থেকেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তারও পরে বাঙলাদেশের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যাও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারত এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রথম থেকেই 'অনীক'-এ অনেক মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা প্রকাশিত হতো।

ভারতের পরিস্থিতির ওপর ঢাকায় বসে বিশেষ কোন খবরাখবর রাখা সহজ ছিল না। 'অনীক'-এর প্রবন্ধ ও নানা ধরণের রিপোর্ট দেখে সে অভাব অনেকখানি পূরণ হতো।

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'অনীক'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, রিপোর্ট ইত্যাদির সংকলন কয়েক খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা দীপংকর তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে করেছিলেন এবং প্রায় দুই খণ্ডের বিষয়বস্তু নিজেই নির্বাচন করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি এখন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি ছিল ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত। দ্বিতীয় সংকলনটিতে থাকছে ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশিত কিছু রচনা। এর মধ্যে বাংলাদেশের ওপর রিপোর্ট আছে পাঁচটি। কিন্তু বাঙলাদেশের ওপর এই রিপোর্টগুলির আগে ১৯৭১ সালের মে মাসে 'পূর্ব বাংলা কোন পথে' শিরোনামে দীপংকর চক্রবর্তীর (তরুণ রায় নামে) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তিনি লিখেছিলেন তখনকার পূর্ববাংলার তথাকথিত প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির লড়াইয়ের ওপর। নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রভাব তখন পূর্ববাংলার ঘোষিত চীনপন্থী পার্টিগুলির ওপর বড়ো রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'অনীক'-এর এই দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আছে ভারতের কমিউনিস্ট, সিপিআই-সিপিএম সহ রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা, গণবিরোধী রাজনীতি ও তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণ, নির্বাচনের ফাঁদে পড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সৃষ্ট সংকটের ওপর আলোচনা। সিপিএম-এর নেতা সুন্দরাইয়াদের সোভিয়েত পন্থী রাজনীতির ওপর দীপংকর, তরুণ রায় নামে লিখিত দুটি প্রবন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির বিভ্রান্তির উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এই সাথে 'অনীক'-এ প্রকাশিত ভারতের শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট এবং আগ্রাসী চরিত্রের ওপর কিছু রচনাও এতে আছে। ভারতের সিকিম গ্রাসের ওপর লেখাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও 'অনীক'-এ আলোচনার বিষয় ছিল।

সংকলিত রচনাগুলির ওপর বিস্তারিত আলোচনার কোন সুযোগ এখানে নেই। তবে এটি এখানে অবশ্যই বলা দরকার যে, ১৯৬৪ সাল থেকে 'অনীক' ভারতের শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও বিপ্লবী সংগ্রামের একনিষ্ঠ মুখপত্র হিসাবে যেভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে, প্রকাশনার জগতে এর বিশেষ তুলনা নেই। এক্ষেত্রে 'অনীক'-এ কর্মরত এবং 'অনীক'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই অভিনন্দনযোগ্য। তবে বলা দরকার যে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে দীপংকর চক্রবর্তী 'অনীক'-কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন, সেটা এক অতি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশনার সময়ে তাঁর এই নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আশা করি তাঁর অবর্তমানে 'অনীক' তার এই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ঢাকা-১৯/০১/২০১৪

সূচিপত্র

অনীক

জুলাই ১৯৭২ থেকে জুলাই ১৯৭৫

সম্পাদকীয়

অনীক-এর নোতুন জন্ম হোলো।

শুরু হোলো এমন এক সময়ে যখন বাস্তবের কষ্টিপাথরে 'অনীক'-এর প্রয়োজনীয়তা সুনিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হোয়ে গেছে, এবং বর্তমান মুহূর্তে সেই প্রয়োজনীয়তাই গেছে বহু গুণ বেড়ে কেননা, এই মুহূর্তেই আমাদের দেশে নয়া ফ্যাসিবাদের হিংস্র পদসঞ্চার নগ্নতম রূপে আবির্ভূত হোয়েছে, বিরোধিতা বা প্রতিরোধের সামান্যতম প্রচেষ্টাকেই অংকুরে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কিন্তু নির্যাতন যতো বাড়ে, প্রতিরোধও যে ততোই বাড়ে— এই নির্মম সত্যটাকেই এই মানুষখেকোর দল উপলব্ধি কোরতে পারছে না। কারণ, নাকের ডগার চাইতে বেশি দূরে তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি যেতো, তাহোলে তারা বুঝতে পারতো যে, প্রতিরোধের যে আগুণ আজ দাবানলের মতো দাউ দাউ কোরে জ্বলে উঠছে ভিয়েতনামে-লাওসে-কাম্বোদিয়ায়, জ্বলছে দুনিয়ার দেশে দেশে, সেই আগুণের দীপ্তি আজ ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের বুকেও। আপাত-দৃষ্টিতে তার স্ফুলিংগকে নিষ্প্রভ বোলে মনে হোলেও, সেদিন আর বেশী দূরে নেই, যখন এ দেশেও আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙবে, তার গলিত লাভায় লালে লাল হোয়ে উঠবে পূবাকাশ, এবং তার তলায় কবরের চিরশান্তি লাভ কোরতে বাধ্য হবে জনতার সব রংবেরঙের শত্রুরা।

সেই আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে তাকিয়েই 'অনীক' আজ নোতুন ও প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ গ্রহণ কোরছে। গত দশ হাজার বছর ধরে শোষিত জনতা মুক্তির মহান আকাংখায় শ্রেণী-সংগ্রামের যে ঢেউ তুলছেন, 'অনীক' শিল্প-সাহিত্যকে তারই হাতিয়ার কোরে তুলতে চায়। 'অনীক'-এর সামনে রয়েছে উজ্জ্বল এক প্রশস্ত পথ। লাল পতাকা হাতে গোর্কি-লু শুন' আর আংশিকভাবে হোলেও হরিশ মুখার্জী-নজরুল-মানিক-সুকান্তরা এগিয়ে গেছেন সেই পথ ধরেই। ভয় পেলে চলবে না তাতে, পিছিয়ে পড়লেও চলবে না। শত-শহীদের রক্তে রাঙা উজ্জ্বল সেই লাল পতাকাকে কি ভূলুণ্ঠিত হোতে দেওয়া যায়!

আসুন, আমরা এগিয়ে যাই। বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরি সেই পতাকা। শত-সহস্র বিদ্রোহের ঐতিহ্যে ভাস্বর পঞ্চান্ন কোটি জনতার দেশ এই ভারতবর্ষের বুকে।

অনীক, জুলাই ১৯৭২

‘আন্তর্জাতিক’ সঙ্গীত প্রসঙ্গে

সূত্রধর

এ বছর মার্চ মাসে সর্বহারারশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা স্থাপনের প্রথম মহান প্রয়াস প্যারী কমিউনের একশো একতম বার্ষিকী পূর্ণ হোলো। জুন মাসে পূর্ণ হোলো দুনিয়ার মেহনতী জনতার দৃপ্ত রণসঙ্গীত ‘আন্তর্জাতিক’ রচনার একশো এক বছর। আর আগামী নভেম্বর মাসে পূর্ণ হবে ‘আন্তর্জাতিক’ রচয়িতা শ্রমিক-কবি ইউজিন পতিয়েরের মৃত্যুর পঁচাশি বছর।

১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ ফ্রান্সে প্যারীর বীর সর্বহারা ও মেহনতী জনতা অসীম বীরত্বপূর্ণ এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন প্যারী কমিউন। সেটাই ছিলো মানব ইতিহাসের প্রথম সর্বহারা শাসনব্যবস্থা, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব উৎখাত কোরে সর্বহারাশ্রেণীর একানায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম মহান প্রয়াস। বিসমার্কের সমর্থনপুষ্ট দিয়ার্সের সামরিক অভিযান ও রক্তাক্ত নির্যাতনের সামনে প্যারী কমিউন ব্যর্থতা বরণ কোরলেও এই প্যারী কমিউন ছিলো “শ্রেণী-শাসন থেকে মানব জাতিকে চিরমুক্ত করার সামজিক বিপ্লবের রক্তিম প্রত্যূষ” (মার্কস্)।

দেশের ও বাইরের শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে কমিউনের বীর যোদ্ধারা গড়ে তুলেছিলেন এক প্রচণ্ড বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ। সেই রক্তাক্ত দিনগুলিতে প্যারীর পথঘাট বীরদের মৃতদেহে ভরে গিয়েছিলো, সর্বত্র ছড়িয়ে ছিলো রক্তের ছাপ। জুন মাস পর্যন্ত এই হত্যালীলা চলেছিলো। ৩০শে মে ভার্সাই’র একটি দৈনিক পত্রিকায় খবর ছিলো ঃ শ্রমিক-কবি ইউজিন্ পতিয়েরকে গ্রেপ্তার ও খুন করা হোয়েছে। আসলে কিন্তু কবি তখন আত্মগোপন কোরেছিলেন। চারিদিকে যখন আগুণ আর গোলাগুলির আওয়াজ, প্রতি পদে যখন মৃত্যুর আশংকা, গাড়ী গাড়ী শহীদের মৃতদেহ যখন বয়ে নিয়ে যাওয়া হেচ্ছে— তখন পতিয়ের আত্মগোপন কোরে আছেন প্যারীরই উপকণ্ঠে। তিনি আত্মবিশ্বাস হারালেন না, হতাশ হোলেন না, বরং সার-সংকলন কোরলেন ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাগুলির। উদ্দীপনায় ভরপুর দৃপ্ত কবিতা ‘আন্তর্জাতিক’-এ তাঁর বিপ্লবী অনুভূতি ভাষায় রূপ পেলো। ক্রীতদাসরাই যে ইতিহাস তৈরী কোরেছে— এই সত্যটি এই কবিতায় প্রতিফলিত হোলো, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করা হোলো ঃ কমিউনিষ্ট আদর্শ অবশ্যই বিজয় অর্জন কোরবে। এতে ধ্বনিত হোলো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎবাণী— “এসো মোরা মিলি এক সাথ/গাও ইন্টারন্যাশনাল/মিলাবে মানব জাত।” এই কবিতাটি রচনার মাধ্যমে পতিয়ের গড়ে

তুললেন প্যারী কমিউনের এক অমর স্মৃতিসৌধ। আর 'আন্তর্জাতিক' গানের মধ্যে দিয়ে কমিউনের বীর যোদ্ধারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে রেখে গেলেন বিপ্লবকে শেষপর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃপ্ত আহ্বান।

পতিয়েরের মৃত্যুর সাত মাস পরে ১৮৮৮ সালের জুন মাসে পিয়েরে ডিজিটেলে প্রথম 'আন্তর্জাতিক'-এর কথাগুলি পড়লেন। এর বিপ্লবী ভাবাবেগ ফ্রান্সের এই শ্রমিক-সুরকারকে উদ্দীপ্ত কোরে তুললো। তাঁর মনে পড়ে গেলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর সেই প্রথম বিপ্লবী লড়াইয়ের কথা, তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো অজস্র ছবি— মার্কসবাদের প্রতি তাঁর এবং অন্যান্য মেহনতী জনতার আনুগত্য, পতিয়েরের জীবনকাহিনী, প্যারী কমিউনের লড়াইয়ের দৃশ্য.... তিনি যেন ফিরে গেলেন ১৮৭১ সালের সেই মহান দিনগুলির মধ্যে! সেই রাতেই তিনি তাঁর নিতান্ত সাধারণ অর্গানটি নিয়ে বোসে গেলেন 'আন্তর্জাতিক'-এর কথাগুলিতে সুর দেবার জন্য। সারা রাত চেষ্টার পর তিনি যখন সেই কাজ শেষ কোরলেন, তখন নোতুন সূর্যের উদয় হোচ্ছে, সমস্ত পূব আকাশ লালে লাল হোয়ে উঠেছে।

১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে লিলি শহরে সংবাদপত্র বিক্রেতাদের এক জমায়েতে শিল্পীদের ঐকতানে প্রথম বেজে উঠলো 'আন্তর্জাতিক'-এর সুর। তারপর থেকে 'আন্তর্জাতিক' ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ফ্রান্সে এবং তারপর সমগ্র দুনিয়ায়। 'আন্তর্জাতিক' হোয়ে উঠলো দুনিয়ার সমস্ত দেশের সর্বহারা ও মেহনতী জনতার দৃপ্ত রণ-সঙ্গীত।

অনীক, জুলাই ১৯৭২

উত্তরকাল

স্বর্ণ মিত্র

বাসটা এখন ভীড়ে কাৎ হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাল আলো এখনও নেভে নি। এবং সবেমাত্র হেদোর মোড়।

ড্রাইভারের ঠিক পেছনের দিকের সিটে আমি বোসে। মা বোসেছে ঠিক গেটের মুখে। লম্বা লেডিজ সিটে। হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার। তার ভেতর নিজের হাতে তৈরী পরোটা আর ফুলকফির তরকারী। টিফিন-ক্যারিয়ারটা সাদা রুমাল দিয়ে বাঁধা। সরু সরু দু'টো হাত দিয়ে মা সেটাকে কোলের ওপর আঁকড়ে ধরে আছে। যাতে কিছুতেই পড়ে না যায়। হাজার ঝাঁকুনিতেও পড়ে যেতে দেবেনা। মাঝে মাঝে হাতের ঘষা ব্রোঞ্জের চুড়িগুলোর সঙ্গে টিফিন-ক্যারিয়ারটির সংঘর্ষের ফলে একটা ক্ষীণ আওয়াজ কানে লাগছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে জানালার দিকে মুখ কোরে বোসে আছে মা। বৃদ্ধা হওয়ার আগেই প্রায় সব চুল সাদা হোয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা কাঁচা চুল জেগে আছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোলকাতা আসার সময় প্রথম বহির্বিশ্বের রূপটা প্রত্যক্ষ কোরেছিলো। তারপর আঠেরোটা বছর হেঁসেলের ঝুল-কালি আর উনুনের আগুন দেখেই কেটে গেছে। এ বছরের প্রথম মাস থেকে আবার সে সংসারের গণ্ডি ভেদ কোরে বাইরে আসবার সুযোগ পেয়েছে। পেয়েছে বোললে হয়তো সে প্রতিবাদ কোরবে। বলা উচিত, বাধ্য হোয়েছে।

কপাল পর্যন্ত লালপেড়ে শাড়ীর টানা ঘোমটাটা খসে পড়েছে। কপালজোড়া অজস্র আঁকিবুঁকির মাঝখানে বড়ো সিঁদুরের টিপ। কিছু সিঁদুর ঝরে পড়েছে নাকের ডগার ওপর। গালের দু'পাশে শুক্‌নো নালার মতো কালো ভাঙনের ছাপ। নাকে একটা ছোটো পাথর-বসানো নাকছাবি। দাঁতটা সামান্য উঁচু। চোখে যেন বিষণ্ণতা আর হাজার প্রশ্ন পিচুটির মতো লেগে আছে।

অধীর আগ্রহে জানালার দিকে মুখ কোরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে মা। মুখস্ত-করা পথটুকু শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। ঐ তো সেই বড়ো কাপড়ের দোকানটা চলে গেলো। তাহোলে আর কতো বাকী?

বাসটা ছাড়তেই একদল ছাত্র উঠলো। কী নাম তাদের জানিনা। কোন্ কলেজের ছাত্র, বয়েসটা কতো, তা-ও আমার পক্ষে জানা মোটেই সম্ভবপর নয়। তবু তাদের গোঁফের আবছা রেখা, কথাবার্তা, চাল-চলন দেখলে মনে করা স্বাভাবিক, এটা কৈশোর থেকে যৌবনে যাওয়ার বর্তমানটুকু। ছেলেগুলো হৈ-হৈ কোরে ওঠা মাত্র মা তাকালো।

স্নেহভরা চোখে সে যেন একটা বিষম খেতে খেতেও ঢোক গিলে কাশিটাকে চেপে দিলো। আমারও মনটা আন্‌চান্ কোরে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একদল ছেলের মুখ। ক্রমশ তারা যেন সংখ্যা হারিয়ে ফেলছে। যাদের সঙ্গে এই কলেজের ছাত্রগুলোর ভীষণ মিল চোখে পড়ছে, এরাও তাদের সঙ্গে এক হোয়ে যাবে কিনা, কে জানে। হয়তো! কিন্তু বর্তমানে দু'য়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল লোহার গরাদ, মাথা কাৎ-করা মসৃণ দীর্ঘ পাঁচীল। যার চারপাশ বন্দুক দিয়ে ঘেরা।

মা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলো। কাজটা এমনভাবে কোরলো যে বাকীরা ভাবলো, চোখে ধুলোটুলো পড়েছে। তাই দু'এক ফোঁটা জল ঝরলো চোখ থেকে। হয়তো আরো কতো শত মা এমনিভাবেই চোখের জল মোছে। বাসে ট্রামে! রাস্তাঘাটের আনাচে-কানাচে! মা একবার আমার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকালো। ভুরু দু'টো তার ঈষৎ কুঁচকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। ইস্? ভীষণ দেরী কোরছে! সত্যি, ড্রাইভারগুলো কি মানুষের যাতায়াতের গুরুত্ব বোঝে না? কতো সুখ-দুঃখের লেন-দেনের জন্য যাত্রীরা যে ঠায় বোসে আছে, সেটুকুও কি উপলব্ধি করার মতো চেতনা এদের নেই? কেন, এদের ঘরেও কি সুখ-দুঃখের তেমন কোনো জোয়ার-ভাটা দেয় না?

"বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধ জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!" "বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ!" "ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও!" "ইয়াহিয়া নিপাত যাক্! নিপাত যাক্!" বাসটা আবার দাঁড়িয়ে গেলো।

মিছিল এগোচ্ছে। বেশ দীর্ঘ মিছিল। মিছিলের শ্লোগানদাতারা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের ওপর ইয়াহিয়ার নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। শ্লোগানে সায় দিচ্ছে প্রায় সকলেই। তবে সকলের স্বর সমান নয়। কেউ কেউ সচেতনভাবে। অনেকেই আচম্‌কা প্রশ্নের জবাবের মতো। মিছিলের কোনো কোনো অংশ দ্রুত হাঁটছে। কোনো অংশ পায়ে পায়ে। কোনো অংশ হাল্কাভাবে, চারপাশ দেখতে দেখতে। শ্লোগানদাতার ধমক খেয়ে আবার দ্রুত হাঁটতে শুরু কোরছে।

এরা কারা? পার্টির লোক? শরণার্থী? নাকি, একদিনের খোরাকের তাগিদে? কে জানে!

আবার আমি ঘড়ি দেখলাম। হাতে আধঘন্টা মোটে সময়। সবেমাত্র বৌবাজার! সেখান থেকে বাস পাল্টে যেতে হবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। ওটাই এখন খোকাদের আবাসস্থল। আমরা দেখা কোরতে যাই। কথা বলার সময় পাঁচ থেকে দশ মিনিট। তা-ও লাইন দিতে হয়। দেওয়ালের ঘুপরির মধ্যে দিয়ে ওরা একে একে চোখ বের করে, কথা বলে। কিন্তু কিছুই যেন বলা যায় না। প্রতিটি সেকেণ্ডকে এতো দ্রুত দখলে রাখতে হয় যে, উত্তেজনায় বাড়ী থেকে সাজিয়ে-আনা নানা খবরা-খবরগুলো কোথায় যেন তলিয়ে যায়। তখন নির্বাক্ দৃষ্টি-বিনিময় ছাড়া অন্য সব কিছুই চাপা পড়ে যায়। ওয়ার্ডারের ঘন্টাধ্বনিতে সকলে সম্বিৎ ফিরে পায়। তারপর ধীরে ধীরে সকলে বড়ো গেটের বাইরে, একেবারে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ায়। তার অনেক আগেই বন্দীদের ফাঁক-ফোঁকড়

আটকে দেওয়া হয়। তবু বাবা-মা-ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজন সকলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ততঃ যদি এক পলক খোকার মাথাটা দেখা যায়, দাদার চোখ-দুটো, বুকের-রক্তে-গড়া সন্তানের গলার স্বরটুকু। গরাদ বন্ধ করার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। শেকলের ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। সবই অন্ধকারের আড়ালে। ধীরে ধীরে গরাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে। জেলের বিরাট ফটকের ওপর নেমে পড়ে গভীর নির্জনতা।

গাড়ীটা আবার চলতে শুরু কোরেছে। মা ভুরু কুঁচকে উস্‌খুস্ কোরছে। কারণ ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

না, গাড়ীটা এবার তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছুলো। এস্‌প্ল্যানেডে। সেখানেও মিছিল। লাল পতাকা— কাস্তে-হাতুড়ি-তারা— নানা রকম ধ্বনিঃ বাংলাদেশের মানুষের ওপর নারকীয় অত্যাচার চলবে না, চলবে না। ইয়াহিয়ার কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও! শেখ মুজিব জিন্দাবাদ! মুক্তি বাহিনী লাল সেলাম!

আমার মনে পড়লো, কাগজে দেখেছি, আজ ময়দানে বামপন্থী সমাবেশ। বিষয় : বাংলাদেশ! প্রধান বক্তা ঃ জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত। তাছাড়া অন্যান্য মার্কসবাদী নেতা।

আমার মনে ভেসে উঠলো বারাসাতের ঘটনা, নোয়াপাড়ার হত্যাকাণ্ড, বরানগরের নারকীয় যজ্ঞলীলা, ডায়মণ্ডহারবারের গলিত দেহ, আর বিভিন্ন জেলের বন্দী যুবকদের রক্তাক্ত দেহগুলো। এসব ঘটনাগুলো কেন নিবিড় নির্জনতার মধ্যে সরিয়ে রাখা হোয়েছে? এসব নিয়ে বামপন্থী সমাবেশ হোলো না কেন? নাকি আদর্শ-বিরোধী? রাজনীতিতে পারদর্শী নই, মনোবিদ্যাতেও অভিজ্ঞতা একেবারেই শূণ্য। সুতরাং আজও তার জটিল ব্যাখ্যা বুঝে উঠতে পারি না। কী জানি, বলা যায় না এটাও হয়তো একটা পেতি-বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট! হয়তো কোনো এক ভলিউমে এসম্পর্কে বিষদ ব্যাখ্যা আছে। যেটা আমরা জানি না। কোনোদিন জানতেও পারবো কিনা, কে জানে!

মা'র হাত ধরে আমি বাস পরিবর্তন কোরলাম।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। বাস জুড়ে "বাংলাদেশের" গল্প। বিশেষত কার কোথায় দেশ ছিলো এবং কার দেশ কোন্ খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

ডবল ডেকার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটছে।

গাড়ীটা যতো এগোচ্ছে, ততোই আমার মনে পড়ছে খোকার মুখটা। 'ওর' কমরেডদের প্রত্যয়ভরা চোখগুলো। সকলেই রোগা হোয়ে গেছে। চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে। গাল ভেঙেছে। খোকার ঠোঁটের গোড়ায় একটা জ্বর-গোটা উঠেছে। খুব কষ্ট পাচ্ছিলো দেখে এসেছি। মা বারবার গোটা-টার ওপর হাত দিতে না কোরেছে। আমিও।

সেদিন বাড়ী ফেরার পথে মা খোকার ছোটোবেলার গল্প কোরছিলো। ভয়ানক দুষ্টু ছিলো। আমি তখন একটি বে-সরকারী ফার্মে কাজ কোরতাম বোলে বেশ কয়েকবছর বাইরে বাইরে থাকতে হোয়েছিলো। বাড়ীর অনেক খবরই পেতাম না। ওই যতোটুকু

চিঠিতে জানা যায়। বাকীটুকু শুনতাম বাড়ীতে এসে। খোকার বয়স তখন বছর দেড়। মেজোভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। বোনটার সদ্য বিয়ে হোয়েছে। সংসারে মাছের পাট বন্ধ। এবং একবেলা রুটি। কারণ, বোনের বিয়ের দায়ে অনেক টাকা ঋণ কোরতে হোয়েছে। যাই হোক, খোকাকে প্রথম একবছর আমি দেখি নি। শুনেছি, শুধু সে তেমন সুস্থ শরীরের ছেলে হয়নি। কিন্তু বেজায় দুষ্টু। মা সেই গল্প কোরছিলো। গল্পটা অনেক পুরোণো। মা যে এই নিয়ে কতোবার বোললো। তবু যেন তার আশা মেটে না। বোলেই চলে। খোকার স্মৃতি চারণ কোরতে গিয়ে প্রথমেই তার সেই এক বছর বয়েসের দুষ্টুমিভরা মুখটার কথা মনে পড়ে। মা'র তখন প্লুরিসি। মা'র কাছে খোকার যাওয়া বারণ। কিন্তু মা ও ছেলে কেউই সেই নিষেধ মানতোনা। খোকা সারাদিন মা'র বুকের কাছেই থাকতো। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ ছিলো— বুকের দুধ দেবেন না। ছেলে যাতে বুকের দুধ খেতে না চায়, সে জন্য মা দুধের মুখে খয়ের গুলে লাগিয়ে রাখতো। কিন্তু এক বছরের খোকা প্রথমে দুধের বোঁটা চুষে খয়ের ফেলে দিয়ে বুকের দুধ খেতে শুরু কোরতো। "অনেক বোঝাতাম আমি। কিন্ত কে শোনে কার কথা!" মা'র হাসিমুখটা ধীরে ধীরে শান্ত হোয়ে আসে। শান্ত আর স্তব্ধ।

মা'র মুখটা দেখে আমারও খোকার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সংসারের মায়া ছেড়ে বিপ্লবী কাজে যোগ দেওয়ার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তের চিঠিটা : দাদাভাই, তুমি সত্যি কোরে বলো তো!—লুকোবেনা কিন্তু!—এই সমাজে বাস কোরে এতোটুকু শান্তি আছে কি তোমার বুকে? অফিস যাও আর বাড়ী আসো। মাঝখানের সময়টুকুও সংসারের জটিলতায় পরিপূর্ণ। এতোটুকু শান্তি আছে কি? তোমার হয়তো রাগ হয় মেজদার ওপর, বোনদের ওপর, অবশেষে আমার ওপরেও। কিন্তু আসল দোষী কি এরা? কখনোই না! আসল আসামী হোচ্ছে এই সমাজটা—যার জন্ম সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে। সুতরাং শান্তি কেউ পাবে না, কেউ পেতে পারে না—যতোক্ষণ পর্যন্ত এই মুৎসুদ্দি বণিতাদের নিয়মকানুনের অস্তিত্ব থাকবে! একে ভাঙতে হবে। ভেঙে আমাদের সকলের সমাজ গড়তে হবে। এবং সেই কাজে তোমার মতো একজন অসুখী মানুষকেও প্রয়োজন। যার অনেক অভিযোগ জমা হোয়ে আছে। বুঝলে দাদা, দিন দিন সমস্যা বাড়বে— পাহাড় পরিমাণ জমতে থাকবে আমাদের অভাব-অভিযোগ। কিন্তু এই সমস্যার মূল সমস্যা ভূমি সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান যেদিন হবে, সেদিনই আসবে আমাদের সকলের শান্তি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বিপ্লব—কৃষি-বিপ্লব! নতুবা শান্তি কোথায়? আমাদের যখন বড়ো কোরেছো, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যখন এই বত্রিশটা বছর ধরে যুঝলে, তখন নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো না ভেবে ফেলে দেবে না! এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস...!

গাড়ী এসে থামলো কালীঘাট ব্রীজের মুখে। ওয়ান-ওয়ে! ওপারের গাড়ী না গেলে এপারের মুক্তি নেই। ব্রীজের ডান দিকে সি. এম. ডি. এ-র লোহা পেটানোর শব্দ।

গাড়ী থেকে ঘড়র্ ঘড়র্ কোরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মা আর ধৈর্য ধরতে পারলো না।

আমাকে হাত দিয়ে ইসারা কোরলো, নামবার জন্য।

মা কোনো দিন এতো চট্‌পটে ছিলো না। কোলকাতায় হাঁটা-চলা কোরতে রীতিমতো থতোমতো খেয়ে যেতো। কিন্তু আজ প্রায় এক বছর জেল আর বাড়ী কোরে কোরে দুনিয়ার সব রকমের কারচুপি যেন বুঝে ফেলেছে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে জেলের কাছাকাছি এলাম। গেটের মুখে ভীষণ ভীড়! ভীড় রোজই হয়। প্রিয়জনদের। কিন্তু আজ যেন বড়ো বেশী লোক জমা হোয়েছে। যাদের দাঁড়াবার কথা নয়, তারাও এসে জড়ো হোয়েছে। মাঝে মাঝে ট্রামের ড্রাইভার ঘন্টা বাজিয়ে রাস্তা ফাঁকা করার নির্দেশ দিচ্ছে। তবু যেন ভীড় নড়ে না।

এবার দেখলাম পুলিশ লাঠি তুলে ভীড় হাল্কা কোরছে।

আমি একটা ঢোক গিলে মা'র হাত থেকে টিফিন-ক্যারিয়ারটা নিয়ে তার বাঁ হাতটা চেপে ধরলাম। কেউ কারো হাতের শীতলতা অনুভব কোরতে পারছি না। অথচ বুঝতে পারছি, সব কিছু ঠাণ্ডা হোয়ে যাচ্ছে! এবং বাকী পথটুকু কেমন কোরে যাবো, কী দেখবো, বুঝতে পারছি না! কানের কাছে ঢং ঢং কোরে সি. এম. ডি. এ-র লোহা পেটানোর শব্দ বাজছে।

বেশ কয়েকবার গলা ঝেড়ে মা'র হাতটাকে শক্ত কোরে ধরে ট্র্যাফিক কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা কোরলাম "কী হোয়েছে ওখানে?" সে আমার কথা শুনতে পেলো কিনা জানিনা। আমি কিন্তু নিজেই নিজের কথা শুনতে পেলামনা। শীতের বিকেলে দু'জনের কপালেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

আবার গলা ঝেড়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "কী হোয়েছে ওখানে? কোনো গণ্ডগোল কি?"

মা কৌতূহলভরা চোখে কাঁপা গলায় প্রশ্ন কোরলো, "ক'জন মরেছে?"

"ওসব যুদ্ধের ব্যাপার-সেপার আছে! রাস্তা থেকে স-রে দাঁড়ান।"

দু'জনেই যেন স্বস্তি ফিরে পেলাম। উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়লো। হন্তদন্ত হোয়ে হেঁটে গেলাম। জেল গেটের মুখে। সামান্য এই পথটুকু ধরে আমি আর মা শুধু একটি কথাই বলাবলি কোরলাম—"যাক্! এ যাত্রায় তাহোলে....!"

জেল-গেট বন্ধ। মুখে একটা প্রকাণ্ড তালা ঝোলানো। সারি সারি সশস্ত্র প্রহরী—ভেতরে এবং বাইরে। এ ছাড়া চারপাশে গিশ্ গিশ্ কোরছে সি. আর. পি.। দূরে ষ্টাফ্ রিপোর্টার, নিজস্ব-সংবাদদাতা! গেটের মুখে একটা বড়ো নোটিশ ঝোলানো। কালো কালি দিয়ে বড়ো হরফে বাংলায় লেখা ঃ বন্দীদের সহিত আজ হইতে সাক্ষাৎ বন্ধ। কোন্ কোন্ সেলের, তার নম্বর নীচে দেওয়া হোয়েছে।

কেন? কোথায় তারা? কী অপরাধে তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হোলো? এ সব প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়ার জন্য কেউই ওখানে নেই। তবে জেলের গোপন খবরটাই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো ঃ সেই সব বন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে। অনেক দূরে—!

সকাল বেলার ঘরের কাগজের একটা ক্ষুদ্র হেডলাইনের কথা মনে পড়লো। মা

মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতের ওপর বোসে পড়লো। হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা থপ্ কোরে পড়ে গেলো। পাশের ভদ্রমহিলা এতক্ষণের চেপে থাকা কান্নাটি নিয়ে এইবার ভেঙে পড়লেন।

আমি কী বোলবো, কী কোরবো, বুঝতে পারছি না! এ তো রোগ-ভোগে মৃত্যু নয়, সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সাজানো ভাষাও এখানে অকেজো! অথচ চোখের সামনে স্বজন হারাণো চোখের জল, ভাইবোনের হাহাকার, বাপ-মায়ের বুক-ফাটা আর্তনাদ! এরাও তো ভারতবর্ষের নাগরিক! পথের ওপর বোসে পড়েছে। জেল-গেটের মুখে। দাদাকে না দেখে যাবে না, ছেলেকে বুকে না তুলে ঘরে ফিরবেই না। খোকার ঠোঁটের ওপর জ্বর-গোটাটা কেমন আছে না দেখে বাড়ী ফিরবে কেমন কোরে মা? সেই জন্যই তো রোজ আসা— জেল থেকে বাড়ী, বাড়ী থেকে জেল! আমি কী কোরবো? এখন আমার কী করণীয়? খোকার মুখটা চোখের সামনে ভাসছে। কানের কাছে ভাসছে খোকার সেই চিঠির ভাষাগুলো— দাদাভাই, তুমি সত্যি কোরে বলো তো! —লুকোবে না কিন্তু!—এই সমাজে বাস কোরে এতোটুকু শান্তি আছে কি তোমার বুকে?..... শান্তি.... কোথায়?....যতোক্ষণ পর্যন্ত এই পঙ্গু-সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে না পারছো, ততোক্ষণ কেউ কোনো শান্তি পেতে পারে না। কারণ, যতোদিন সমস্তরকম শোষণ-উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ না কোরবে, যতোদিন শুধু জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই সংগ্রাম কোরে চলবে, ততোদিন কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। সুতরাং......।

একটা ট্রাম চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি যেন চমকে উঠলাম। ট্রাম চলছে। জানালা দিয়ে সারি সারি যুবকের মুখ বেরিয়ে আছে। চোখ জুড়ে প্রশ্ন আর উৎকণ্ঠা।

চোখটা আমার ঝাপ্‌সা ঠেকলো। এখনও ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছে। এটা ট্রাম? না, সেই ট্রেনটা? যার কামরায় কামরায় ভরা তাজা যৌবন—আঠেরো থেকে একুশের সজীব রক্ত। বুকগুলো লোহার শেকলে বাঁধা। হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি। একসঙ্গে সেগুলো যেন গর্জন কোরে উঠছে। ভয় পেয়ে ট্রেনটা দারুণ গতিতে এগোবার চেষ্টা কোরছে। সর্পিল পথ ধরে। কিন্তু শত শত যুবকের কড়া-পড়া একতায় যেন বাধা খাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ষ্টিয়ারিং! বরং নির্বাসিত বন্দীদের নির্দিষ্ট পথেই যেন ট্রেনের চাকা ঘুরতে শুরু কোরেছে! হয়তো এতোক্ষণে ওরা শুরু কোরে দিয়েছে হাজার কণ্ঠস্বরে— আন্তর্জাতিকের সুর। সেই সুরকে চাপা দেওয়ার জন্যই কি আজ সি. এম. ডি-এর লোহা-লক্কর পেটানোর আওয়াজটা ক্রমশ গর্জে উঠছে? হয়তো!

ট্রামটা কখন যে চলে গেছে, টের পাইনি। রাস্তাটা আবার ফাঁকা হোয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট গাড়ী ছুটে চলেছে। টেলিগ্রাফের তারে সারে সারে কাক বোসেছে।

গেটের দিকে তাকাতেই আবার চোখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো নোটিশটা। খোকারা নির্বাসিত! কারণ, তারা কোটি কোটি মানুষের মুক্তি চেয়েছিলো! পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি! শোষণের হাত থেকে মুক্তি! কিন্তু সরকারী মতে এটা নিষিদ্ধ! কেন? স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের ওটা জানতে নেই!

হঠাৎ আমার মনে পড়লো— আসবার সময় আমি একটা মিছিল দেখেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা দীর্ঘ মিছিল! মুক্তির মিছিল! বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিছিল। শ্লোগানগুলো আমার কানের মাঝে বাজছে ঃ জঙ্গী-শাহী নিপাত যাক্! বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা জিন্দাবাদ। জয় মুজিব! জয় ইন্দিরা! জয়! জয়!.....

শ্লোগানগুলো যেন আলিপুর জেলের লোহার গরাদের ওপর গর্জন হেঁকে চলে গেলো।

নোটিশটা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এবং খোকারা নির্বাসিত। আমার হাসি পেলো।

মনে পড়লো— এস্প্লানেড্। বামপন্থী সমাবেশ! বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের জ্বালাময়ী ভাষণ! নানা শ্লোগান! নানা ফেস্টুন! নির্বাচনের কতো দেরী জানিনা!

কিন্তু এখন আমি কী দেখছি?

আলিপুর জেলের প্রকাণ্ড লোহার গেট। নির্বাসিত বন্দীদের খবর। গেটের মুখে অগণিত বাপ-মা-ভাই-বোন! ওরা উঠবে না? পুলিশ ধমক দিচ্ছে! তাহোলে ওরা কি শুধু মুখে খালি হাতে উঠবে না?

আবছা অন্ধকার নেমে এলো।

ব্রীজের এধারে অন্ধকার-মাখা আলিপুর জেলের গেট। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাওয়া নোটিশ। মায়েদের বুকফাটা চাপা কান্না। বাপেদের দীর্ঘশ্বাস। পুলিশের রূদ্র কটাক্ষপাত।

ব্রীজের ওপারে বাঁশের ডগায় আলো জ্বালিয়ে সি. এম. ডি. এ-র কাজ এগোচ্ছে। দ্রুত গতিতে। ব্রীজটাকে বড়ো করা হোচ্ছে— পথটাকে পাকা-পোক্ত করা হোচ্ছে— জনগণের সেবায়! তাদের সঠিকভাবে পথ চলার সুবিধের জন্য। লোহা পেটানোর একটানা আওয়াজ কানে এসে লাগছে।

স্থানীয় বস্তিবাসীরা বলে, যেখানে কাজ চলছে, ঠিক ঐখানেই নাকি কয়েকজন বন্দীকে গুলি করা হোয়েছিলো! শোনা যায়, ছেলেগুলো নাকি জেল টপকে পালাবার চেষ্টা কোরেছিলো।

আবছা অন্ধকার গাঢ় হোতে শুরু কোরেছে।

এক একটি পরিবার উঠছে অত্যুগ্র ঘৃণা আর ক্রোধ বুকে কোরে!

আমি মাকে নিয়ে হাঁটা শুরু কোরলাম। মা আজ তেমন কাঁদে নি। হয়তো সে-ও পোড় খেয়ে গেছে। ঠেকে ঠেকে এতোদিনে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। হাঁটতে হাঁটতে মা বোললো, "তাজা ছেলেগুলোই যদি এমনভাবে প্রাণ দেয়, তা হোলে আমাদের মতো বুড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলো, যাদের তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, তারাই বা কেন চুপ কোরে গর্দভের মতো বোসে থাকি? আমরাই বা কেন—"

"দাদা! শুনছেন!—"

আমরা দুজনেই একটু থতোমতো খেয়ে পেছন দিকে তাকালাম। আধ-পাকা চুল মাথায়, এক রোগা চেহারার ভদ্রলোক। মুখটা চেনা। প্রায়ই ওর ছোটো ভাইকে জেলে

দেখতে আসতেন। বাড়ী বাঁশদ্রোণীতে। কাছে এসে উনি বোললেন "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। সমস্ত অভিভাবকদের নিয়ে একটা প্রতিবাদ মিছিল বেরোবে। চলে যাবেন না, কেমন?" আমরাও মিছিলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

ব্রীজের দু'ধারের আলোগুলো একের পর এক জ্বলতে থাকলো। জ্বলতে জ্বলতে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে— আলোর মধ্যেই মিলিয়ে গেলো।

খানিক বাদেই প্রতিবাদে ভরা এক জীবন্ত মিছিল ব্রীজের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। পেছনে পেছনে আসছে দু'টো কালো ভ্যান।

কোনো ফেস্টুন নেই, পতাকা নেই, অধিবেশনের আয়োজনও নেই।

অনুশোচনার গর্ভে জন্ম নিয়েছে এক আগুণের মতো জ্বলে-ওঠা প্রতিবাদ মিছিল। ব্রীজের ওপর পৌছুতেই আমি আর মা সেই জনস্রোতের ভেতর একটা অংশ হোয়ে মিশে গেলাম। যেন পৃথক কোরে চেনা না যায়!

অনীক, জুলাই ১৯৭২

দাঁড়কাক

সুজন সেন

দাঁড়কাক জুটলো হটাৎ
উট্‌কো চোয়াড়
কালকুটে ঠ্যাং, বোস্‌লো ডালে শ্যাওড়া ন্যাড়া।
ভাগাড়ে ট্যারচা চোখে
পাতলো আড়ি—
এক নাগাড়ে শুকনো হাড়ে ধুঁকছে কারা?
আরে ব্বাস্! অগুণ্‌তি লাস!
বরাতটা খুব—
বেঁচে থাকো বছর বছর চাঁড়াল স্যাঙাৎ!
তবে কিনা মাংসটা কম
বড্ডো রোগা—
বিশ বচ্ছর খায়নি কিছুই কিপ্‌টে বেজাত!
হেথা দেখি ফোস্কা গায়ে
ঘর পুড়েছে
ফালতু গোঙায় পাগলী দু'টো, খট্‌খটে বুক।
ছানা দু'টো কুঁকড়ে পোকা
দগ্‌দগে ঘা
চোখের পাতায় ন্যাংটো পাছায়, পেট-জোড়া মুখ।
হোথা দ্যাখ্ বিকট আওয়াজ
সানাই বাজে,
কার বিয়ে আজ? মোট্‌কা পুরুত ঘামছে বেজায়!

আহা মরি লাখ্‌রাজ আজ
বর সেজেছে
লাজে মরে গয়না গায়ে মিচ্‌কে কনে—
লাখ মন ধান যৌতুকে যায়।
দূর! যাক্ ওসব চুলোয়
কাজ কী আমার—
দালাল মানুষ আয় দি' ঠোকর ফুল্‌কো পেটে।
ওমা! দেখি হাত মুঠো সব
আধমরা তেজ—
তাতেও চেঁচায় লাফায় মিছিল কাস্তে হাতে।।

অনীক, জুলাই ১১৭২

বিপ্লবই আজ সারা দুনিয়ার সর্বপ্রধান ধারা

সত্য রায়

রক্তের স্বাদ পেয়ে উন্মাদ
মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ
দিকে দিকে হানে হিংস্র আঘাত।
কাগুজে বাঘের চরিত্র তার ধরা পড়ে গেছে
জনতার কাছে,
ব্যারিকেড গড়ে জনতাও আজ
মুখের ওপরই দিচ্ছে জবাব
জনযুদ্ধের দামামা বেজেছে দুনিয়ার প্রতি দেশে দেশে।।

ভিয়েতনামে বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে মরণ-ফাঁদ—
মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ
ভয়ে থরথর কম্পমান,
সে বিপদ দেখে প্রাণের দোসর রুশ নয়া জার হাত বাড়ান—
মস্কোর শত হাজার চুক্তি পারে কি আনতে পরিত্রাণ?

কাম্বোদিয়ায়, ভিয়েতনামে ও লাওসের বুকে—
জনতাই আজ উঠেছে রুখে—
ইন্দোচীনের এ তিন দেশের
সম্মিলিত জনযুদ্ধের
প্রতিরোধের বজ্রাঘাতেই শয়তানেরা দিশেহারা।।

খোদ আমেরিকার প্রতিটি প্রান্তে
জনতা জেগেছে আঘাত হানতে
ভাঙবেই তারা শোষণের ফাঁদ—
মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ
ঘরে-বাইরের সংকটে আজ হোয়েছে মরিয়া বেপরোয়া।।

এই দুনিয়ায় কে আজ আসলে ভয় করে কাকে?
শয়তানদেরই ভয় জনতাকে,
হাওয়ায় পাতার নড়ার আওয়াজে
কেঁপে ওঠে তারা ভয়ে সন্ত্রাসে—
ন্যায়যুদ্ধের ক্রম-বিস্তৃতি তাদের কবর খোঁড়ে।।

"স্বাধীনতা চায় দেশগুলি,
আজ জাতিগুলি চায় মুক্তি
আর জনগণ চায় বিপ্লব"— তাই
এই দুনিয়ায় যেদিকে তাকাই
ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম কাজ কোরে যায় দেশে দেশে।।

শোধনবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ
যতোই হানুক হিংস্র আঘাত,
জনতাও আজ ঐক্যবদ্ধ—
নোতুন যে কোনো বিশ্বযুদ্ধ
হয় এনে দেবে গণ-বিপ্লব,
না হয় সে ঝড়ে যুদ্ধই হবে চির নীরব—
বিপ্লবই আজ সারা দুনিয়ার সর্বপ্রধান ধারা।।

অনীক, জুলাই ১১৭২

বসন্ত বিদ্রোহ আনে

ইন্দু সাহা ('বাংলাদেশ')

এবার বসন্ত আসে মুখে তার ঝল্সানো আগুণ
এবার বসন্ত আনে লড়াকুর হৃৎপিন্ডে আগ্নেয় ফাগুন
এইবার বসন্তের প্রচণ্ড উদ্দাম ডাকে বিদ্রোহের গান
বসন্ত এবার বুঝি চালাবেই ঘরে ঘরে হাতিয়ারে শান্।।
এই তো এখানে এই আমার বিধ্বস্ত দেশে ক্লিন্ন হাহাকার
ব্যঙ্গ করে 'মুক্তি'কে। মুখোশের অন্তরালে শোষকের সার
যতোই করুক গান—আনবেই সুখ তারা এই বাংলা দেশে,
সমাজতন্ত্র দেবে—ঘোড়া দেবে—হাতী দেবে ভালো বেসে বেসে—
এসবই ভাঁওতাবাজী জানে এই বাংলার বিধ্বস্ত মানুষ
জানে এই শ্লোগানে শোষকেরই ঘরে ফোটে ধনের জৌলুস
সবহারা কিষাণেরা মজুরেরা রক্তাক্ত অনাহারী চেতনায় তাই
উদ্ধত বিদ্রোহ নিয়ে ক্রমাগত পার হয় উৎরাই-চড়াই।।
কে বলে স্বাধীন দেশ? কে বলে কে জনতারা সুখী?
কে বলে বাংলাদেশে অবশিষ্ট নেই আর দুখী?
কে লেখে কবিতা গান 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' রব?
এ ক্যামন স্বাধীনতা অনাহারে জমে যেথা মানুষের শব?
কে বলে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা পলাতক আজ?
কে বলে কায়েম আজ এই দেশে মজুরের রাজ?
কারা গায় কীর্তন ঢেকে রেখে জননীর ছিন্নবাসে শিশু?
মজুরের রক্তে রাঙা হাত নিয়ে কারা বলো সাজে আজ যীশু?
আমাকে জিজ্ঞাসা করো— বাংলাদেশে শান্তি এলো কিনা?
আমাকে প্রশ্ন করো— বাংলায় কতোখানি পুঞ্জীভূত ঘৃণা?
নিশ্চিত উত্তর শোনো— বাংলায় মার্কিনী গুপ্তঘাতকেরা
সমাজবাদীর বুকে চাকু মারে প্রত্যহ রাজপথে রক্তের ছড়া।
গ্রামে গ্রামে ফাঁসী নেয় পরম নিশ্চিন্তে আজ অনিকেত মুখ
আহা কী ভীষণ এই গলায় ঝুলন্ত দড়ি স্বাধীনতা সুখ!

আহা কি তোমরা জানো আজও শত ময়না আর হাজার আতিয়া
নিশ্চিন্তে ধর্ষিতা হয় এই দেশে ছিন্ন কোরে শুভ্রতার হিয়া?
এমন সুখের 'মুক্তি' পৃথিবীতে বলো দেখি এসেছে কোথায়?
মুজফ্ফর-মণিসিং 'ন্যাপ' আর 'কম্যুনিষ্ট' বগল বাজায়,
শাসকের সঙ্গীতে শোষকের সুরে সুরে নেচে নেচে বলে—
ছিলো রে সমাজতন্ত্র, সীমান্ত ওপারে এক দেবীর আঁচলে!
এই তো বিধ্বস্ত বাংলা ক্ষুধিতের কান্নায় ধর্ষণের জ্বালা
আমার হৃদয়ে আনে ক্রমাগত উত্তাল বিদ্রোহের পালা,
রুশপন্থী মণিসিং লেনিনের সংগ্রাম কবরে পাঠায়
বিশ্বাসঘাতকেরা অস্তিত্ব ঢেলে দিলো শোষকের ঘৃণিত দু'পায়।
এবং হে স্বদেশ রাশিয়ার ছদ্মবেশ উন্মোচন করো,
দেখবে অন্তরে তার সমাজতন্ত্র নয়, তীক্ষ্ণ নখ থাবা বড়ো বড়ো,
সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ মিত্রের বেশ ধরে বাংলাদেশে আজ
উপনিবেশিকতার স্বার্থে 'গুরগানভ্'কে দিয়ে নিত্য করে কাজ।।
তাই তো জনতা জাগে বিদ্যুৎ প্রবাহে আজ ক্ষুধিত জঠর
কবরের স্তূপ ঠেলে উঠে আসে কারা যেন কঠিন কঠোর
চোখে চোখে প্রতিশোধ জোনাকীর প্রোজ্জ্বল উদ্ধত আলোক।
সাবধান বর্ণচোরা জনতার বন্ধুবেশী ধূর্ত সব বিশ্বাসঘাতক।।
এই যে সবুজ মাঠ-সাগরের সোনা মাছ কারখানা-কল
এই যে নগর আর পল্লীর সম্ভাবনা-সোনালী ফসল
ভোগ করে বাংলায় কতিপয় ধনাঢ্য প্রাসাদবাসীরা—
এতোকাল আমরা— দ্বারে সর্বহারা উচ্ছিষ্টভোগীরা—
দু'হাত পেতেই শুধু সকরুণ করুণায় কুড়িয়েছি ঘৃণা
এ বসন্তে দেখা যাক্ চেষ্টা কোরে আমরাও দাঁড়াতে পারি কিনা!
দাঁড়াবার শক্তি নিয়ে এসো দেখি জোট বেঁধে কমরেড এবার
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়ে তুলে নেই শান্-দেয়া তীক্ষ্ণ হাতিয়ার
অনাহারে মৃত্যু নয়, এ বসন্তে কৃষ্ণচূড়া শহীদের ফুলে
আমরা মহান হবো মৃত্যুভয়ে ক্লীবতার ব্যক্তি-সুখ ভুলে।।
কমরেড, নির্ভীক হও মহান লেনিন ডাকে দৃপ্ত ইতিহাস
বিদ্রোহের গানে গানে সুস্ফীত অরণ্য ও কালের বাতাস।
এবার বসন্তে তাই দুই হাতে পূর্ণ করো সূর্যের আগুণ
আমরা প্রত্যেকে হবো মহীয়ান শোণিতে ফাগুন।।

অনীক, জুলাই ১১৭২

সম্পাদকীয়

বাঁধভাঙা জোয়ার যখন ছুটে আসে হাজার ঢেউয়ের হাততালি দিতে দিতে, ঢেউগুলো যখন নাচতে থাকে হাজার হাজার ফণা তুলে, তখন কি কাউকে বোলে দিতে হয় যে জোয়ার এসেছে? কিংবা, আকাশে যখন সূর্য ওঠে পূর্ণ দীপ্তিতে, তখন কি আর লণ্ঠন জ্বেলে দেখার দরকার হয় যে, সূর্য উঠেছে কিনা? বাঁধভাঙা কল্লোল বা সূর্যের প্রোজ্জ্বল দীপ্তিই তখন মনে জাগায় আশার গান, প্রেরণার শক্তি, এগিয়ে যাবার অদম্য উৎসাহ।

কিন্তু যখন ভাটার টান শুরু হয়, থেমে যায় জোয়ারের কল্লোল—তখন? কিংবা যখন গভীর কালো ঘন মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলে— তখন? তখন কি হতাশা আর অবসাদের কীটগুলোই চেতনাকে কুরে কুরে খেতে শুরু করে না, মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে না নির্জীবতা আর ক্লীবতা? তখনই দরকার হোয়ে পড়ে সেই চারণ-কবিদের, যারা শোনাবে আশার বাণী, গাইবে প্রেরণার গান, লক্ষ মনে জাগিয়ে তুলবে আগামী দিনের সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন।

এমনি এক ভাটার মুহূর্তের মধ্যে আমরা আজ বাস কোরছি— সূর্য যখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, আশা আর প্রেরণার ফুলগুলো যখন অকালেই শুকিয়ে গেছে। আমরা যদি সত্যিসত্যিই জনতার চারণ-কবি হোতে চাই, তাহোলে এই হোচ্ছে সময়, যখন আমাদের দায়িত্ব যাচ্ছে অনেক বেড়ে, এবং সেটা হোয়ে পড়ছে অনেক বেশি সুকঠিন। এই হোচ্ছে সেই মুহূর্ত, যখন আমাদের বেছে নিতে হবে দু'টি পথের যে কোনো একটি পথকে : হয় আগামী দিনের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নটাকে চায়ের বা তাসের আসরের গপ্পের রসদে পরিণত করা, বা এদেশে যে কিছুই হবেনা, সেই ক্লীব সিদ্ধান্তটাকেই বারবার আঁকড়ে ধরা এবং অন্যদের মধ্যেও সেই বিষ সঞ্চারিত কোরে দেওয়া; না হয় গভীর অধ্যবসায়ে নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আদর্শের রূপায়ণে দীর্ঘায়ত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা, ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির পথটাকে অবিচলভাবে সামনে তুলে ধরা, এবং অন্যদের মধ্যেও এই চেতনার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। কোনো জ্ঞানপীঠ বা সাহিত্য-অ্যাকাডেমি পুরস্কার জুটবেনা (কী জুটবে, তা না বুঝবার মতো মূর্খ এদেশে আর কেউ আছে কী?), এটা জেনেও—আমরা দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিচ্ছি।

অনীক, আগস্ট ১৯৭২

সরোজ দত্ত স্মরণে

শুধুমাত্র সেই সরোজ দত্তকেই স্মরণ কোরে আমরা থেমে যেতে রাজী নই— যিনি যশোরে জন্মেছিলেন, যিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকের চাকরী কোরতেন এবং বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার 'অপরাধে' যাঁর চাকরী যায়, যিনি চল্লিশের দশকের ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং 'অগ্রণী', 'অরণি', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্রিকার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন এবং যিনি বিদেশী কবিতার চমৎকার অনুবাদ কোরে খ্যাতি অর্জন কোরেছিলেন।

আমরা যে সরোজ দত্তকে স্মরণ কোরতে চাই, উপরোক্ত পরিচয়গুলি তাঁর নিতান্তই গৌণ পরিচয়। আমাদের কাছে তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় হোচ্ছে : তিনি বিপ্লবী ছিলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্র" তথা "সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ"-এর ঐতিহাসিক ভাঁওতাটাকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের উজ্জ্বল আগুণের দীপ্তিতে দীপ্যমান হোয়ে তিনি সব সংশয়, সব মোহ ও সব স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সেই আগুণেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ভারতের দিকে দিকে সেই আগুণের দাবানল ছড়িয়ে দেবার মহান ও সু-কঠিন লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কোরেছিলেন, তিনি ভারতের পঞ্চাশ কোটি শোষিত জনতাকে চিরতরে শোষণ ও নিপীড়নের জোয়াল থেকে মুক্ত করার দুর্বার শপথে আত্মনিয়োগ কোরেছিলেন, এবং বিপ্লবের আগুণকে নিভিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় "ভারতের সর্বাপেক্ষা সংগঠিত সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী" (এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকের রায় থেকে উদ্ধৃত) পুলিশের দল কালো রাত্রির কুৎসিৎ অন্ধকারের মুখোশে মুখ ঢেকে তাঁকে হত্যা কোরেছিলো।

"বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হোতে পারে না" (মাও সে-তুং : "বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় টেনে আনুন")। এবং একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবির দায়িত্ব যে সম্মান-প্রতিপত্তির লোভে বা "আপন মনের খেয়ালে" জ্ঞানের বা বুদ্ধির চর্চা করা নয়, বা জ্ঞানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে আঁকড়ে ধরা নয়—বরং বিপ্লবের স্বার্থে কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের শোষণ-মুক্তির স্বার্থে তাঁর সমগ্র জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনাকে ও সমগ্র সত্তাকে নিয়োজিত করা, মেহনতী জনতার বিপ্লবী লড়াইয়ের প্রবাহে মনে-প্রাণে ও কাজে সামিল হওয়া— সরোজ দত্ত তাঁর সমগ্র জীবন ধরে এবং নিজের জীবন দিয়ে তাঁর চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে স্থাপন কোরে গেছেন।

আর সেজন্যই আমরা তাঁকে আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ কোরছি।

অনীক, আগস্ট ১৯৭২

সরোজ দত্তকে নিবেদিত কবিতা

বিচার

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্যায় মানুষ করে,
বিচারের ভার দেবতার—
নাকি দানবের?
আপনি জীবিত না কি মৃত—
তার প্রশ্ন অর্থহীন;
চোখের সামনে কতো নিষ্পাপ শিশুরা
গুলিবিদ্ধ হোয়েছে—
প্রশ্ন করি নি, প্রশ্ন কাকে কোরবো?
এ দেশে মানুষ কেউ আছে নাকি?
আমিই কি এখনো মানুষ?

অনীক, আগস্ট ১১৭২

চারু মজুমদার প্রসংগে

চারু মজুমদার মারা গেছেন।

কিন্তু ঠিক কীভাবে তিনি মারা গেছেন—মারা গেছেন, না তাকে মেরে ফেলা হোয়েছে—এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই সোচ্চার; এবং তার যুক্তিযুক্ত কারণও রয়েছে। প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও গত চার বছর ধরে যিনি আত্মগোপন কোরে বেঁচে ছিলেন, গ্রেপ্তার হবার মাত্র বারো দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু (তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণের ঘোষণাটি একটা নির্মম ঠাট্টা যেন!) সত্যিই সন্দেহের উদ্রেক করে। তাঁকে গুলি কোরে মারা হোয়েছে— এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তাই সে অভিযোগ আমরা তুলছি না। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর ওপর ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়ে (সরকারী ভাষায় যার নাম 'জিজ্ঞাসাবাদ'।) তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়নি— এমন কথা কে বিশ্বাস কোরবে! কাজেই, চারু মজুমদার যেভাবেই মৃত্যু বরণ করুন না কেন, তার দায়িত্ব অবশ্যই বর্তাবে এদেশের 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদী' শাসকবর্গেরই ওপর।

চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুকে উপলক্ষ্য কোরে বৃহৎ 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলি অনেক মেকী শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরে নিজের নির্মম রসিকতাবোধের প্রমাণ দিয়েছে। আর সবচেয়ে নির্লজ্জ ভূমিকা নিয়েছে সি.পি.এম-প্রভাবিত পত্র-পত্রিকাগুলি! এ ব্যাপারেও তারা 'সি.আই.এ-র এজেন্ট' চারু মজুমদার ও নকশালপন্থীদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর 'গোপন যোগসাজশ' আবিষ্কার কোরেছে। সি. পি. এম-সহ এদেশের প্রতিটি ভোট-বিপ্লবী দলের উচ্চপদস্থ নেতারা যখন বহাল তবিয়তে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং সেটাও প্রায়শঃই পুলিশ-সি. আর. পি-র নিরাপদ পক্ষপুটে (সৎ ও জঙ্গী কর্মীদের কথা বলা হোচ্ছে না), তখন শাসকবর্গের ভীতি ও সন্ত্রাস-উৎপাদনকারী এবং বিপ্লবের জন্য আত্ম-উৎসর্গকারী চারু মজুমদার ও অন্যান্য নকশালপন্থী নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে তাদের মৌলিক ব্যবধানটা বড়ো বেশি প্রকট হোয়ে পড়ে। এবং এতে এদেশের মেকী বামপন্থী ও সংশোধনবাদী নেতৃবর্গের মুখোশটাই সশব্দে উন্মোচিত হোয়ে পড়ে।

আর একথা কেউই অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে, এদেশের বামপন্থী আন্দোলন যখন পার্লামেন্টারি গাড্ডার কানাগুলিতে ডুবতে বোসেছিলো, বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রের ধ্বংসের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত মার্কস্বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে গদির লোভে বিসর্জন দিয়েছিলো, তখন চারু মজুমদারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাতেই

নকশালবাড়ীতে জেগে উঠেছিলো বিপ্লবের বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ— সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের পথটা হোয়ে উঠেছিলো উজ্জ্বল। এজন্য চারু মজুমদার ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে চিরকাল অমর হোয়ে থাকবেন। পরবর্তীকালে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলকে কেন্দ্র কোরে চারু মজুমদার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে মতবিরোধ হোয়েছিলো, এবং সেটা ছিলো বিপ্লবী আন্দোলনের স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ— অনেক ভুল চিন্তা ও কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে নেবার সম্ভাবনাই এতে উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিলো। ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল কোন্‌টা— বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে অতি অবশ্যই তার সমাধান হোয়ে যাবে। এবং কেবলমাত্র তখনই চারু মজুমদারের চূড়ান্ত মূল্যায়ণ করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে অন্ততঃ এই সিদ্ধান্তে বিনা-বিতর্কেই উপনীত হওয়া যায় যে, চারু মজুমদার ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রগতির পথে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ কোরেছিলেন, বিপ্লবের স্বার্থে তিনি আত্ম-উৎসর্গ কোরেছিলেন, এবং বিপ্লবীর মতোই তিনি মৃত্যু বরণ কোরেছেন।

চারু মজুমদারের প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন কোরছি।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭২

বহু-RUPEE'র খেল!

বিবেক গুপ্ত

টাকায় কী না হয়! 'জাতীয়' সংস্কৃতির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কও জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত হন! 'সৎ' নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা শম্ভু মিত্রের কথা বোলছি। চল্লিশের দশকে তাঁকে দেখেছিলাম গণনাট্য-আন্দোলনের প্রথম সারিতে। ব্যাপক জনপ্রিয়তার বাজার তৈরী কোরে নেবার পর পঞ্চাশের দশকে তাঁকে দেখেছিলাম তথাকথিত রাজনীতি-নিরপেক্ষ নাট্য-আন্দোলনের 'বহুরূপী' পুরোধার ভূমিকায়। ষাটের দশকে তাঁকে দেখেছিলাম নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে ফেলে শাসকদলের নির্বাচনী চারণ-কবির ভূমিকায়। এসবের ফলশ্রুতিতে শাসকশ্রেণীর সভা-নাট্যকারের যে গৌরবময় ভূমিকা তিনি পেয়েছিলেন, তারই জোরে সত্তরের দশকে তাকে দেখলাম জালিয়াতের ভূমিকায়! 'সাংস্কৃতিক' মুখ্যমন্ত্রীর কৃপায় জনগণের দশ লাখ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্য 'আমাদের অঙ্গীকার'-এর যে সার্কাস তিনি খুললেন কোলকাতার ষ্টেডিয়ামে, কে জানতো যে তার পরিকল্পনা ও চিত্রনাট্যটা আসলে কেন্দ্রীয় তথ্যবিভাগের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের পরিচালক লেঃ কর্ণেল এইচ. ভি. গুপ্তে'র— যদিও শম্ভু মিত্র সমগ্র সার্কাসটাকেই তাঁর 'মৌলিক প্রতিভা'র ফসল বোলে ঘোষণা কোরেছিলেন! 'বহুরূপী'-র 'সৎ' নায়ক যে বহু-Rupee'র আকর্ষণে এমন অসৎ উপনায়কে পরিণত হবেন, এটা তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক শিষ্য-প্রশিষ্যরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন?

টাকায় কী না হয়। 'জনতার কল্লোলে কল্লোলিত' নায়কও জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতক কবির সংগে একই খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়েন! 'বিপ্লবী' নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা উৎপল দত্তের কথা বোলছি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা উৎপল দত্ত যে মার্কিণী একচেটিয়া ফিল্ম-কোম্পানী 'দি গুরু'র হাতছানিতে লক্ষ টাকা ইনামের লোভে সরকারের পদতলে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলেই গেছিলাম! তারপর গত বছর দেখলাম, তিনি রাষ্ট্রীয় 'ভরত' পুরস্কার মাথা পেতে নিলেন। মনে পড়লো ১৯৬৬-র সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা, যখন তিনি জনতার দাবীতে "শাহেনশা, তোমার পুরস্কার তোমারই থাক" বোলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দেখলাম, তিনি 'বাংলাদেশ' চক্রান্তের মূল নায়ক শেখ মুজিবের পক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন! শাসকশ্রেণীর কাছে 'গুড বয়' সার্টিফিকেট এবং উপযুক্ত ইনাম পাবার জন্য এসব তো কোরতেই হবে! তবুও যখন রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে

খেয়োখেয়িতে তাঁর নাট্যানুষ্ঠান বিঘ্নিত হোলো, তখন তিনি আসরে নামলেন আবৃত্তিকারের ভূমিকায়—এইচ. এম. ভি রেকর্ড কোম্পানীর অভিভাবকত্বে! কার কবিতা তিনি আবৃত্তি কোরলেন? কেন, সুভাষ মুখুজ্যের! মনে কি পড়ে উৎপলবাবু, ১৯৬৭ সালে কাকে উপলক্ষ কোরে আপনি লিখেছিলেন ঃ "দেখেছি বিপ্লবী রাজপথ ছেড়ে প্রাক্তন বিপ্লবী/লাল গোলাপের সৌরভে ছুটে যাচ্ছে/ তোমার নাগরা-চুম্বনের অধিকার পেতে"? তাঁরই কবিতার বাণীকার হোয়ে আপনি কি তাঁরই দলে ভিড়ে গেলেন না? একথা ভেবে দেখবার মতো বিবেকটুকুও কি আপনার অবশিষ্ট আছে?

কিন্তু—না থাক, এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই! শম্ভু মিত্র, সুভাষ মুখুজ্যে আর উৎপল দত্তের মতো জনতার শত্রু-শিবিরের প্রতিনিধিদের কথা ভেবে লাভ নেই! আমরা ভাববো অন্ধ্রের বীর শহীদ সুব্বারাও পাণিগ্রাহী, শ্রীশ্রীজ্বালামুখী ও এম.টি.খান, বাংলার সরোজ দত্ত, উত্তরপ্রদেশের কাঞ্চন কুমার ও রাম ধ্বনি, দিল্লীর হন্‌স্‌রাজ রেহ্‌বর, পাঞ্জাবের লাল সিং দিল, দর্শন খট্‌কর, অমরজিৎ চন্দন, হরভজন হালভার্‌বি, পাশ ও গুরুদীপ গাড়ওয়ালদের কথা— যাঁরা শাসকশ্রেণীর হাতে হয় প্রাণ দিয়েছেন বা এখনও নির্যাতন ভোগ কোরছেন, কিন্তু মাথা নোয়ান নি— তাঁরাই আমাদের বিপ্লবী সংস্কৃতির পুরোধা, জনতার কবি। তাঁদের আমরা ভালোবেসে মাথায় কোরে রাখবো, তাঁদের পথে এগোবার চেষ্টা করবো—আর শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্তদের নিক্ষেপ কোরবো আবর্জনার স্তূপে।।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭২

'বাংলাদেশে' কী ঘটছে?

সত্যপ্রকাশ কর

গত ৭ই জুন ঢাকার এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব মুনাফাবাজ-চোরাকারবারীদের ১৫ দিনের মধ্যে ঠাণ্ডা কোরে দেবার যে বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারপর প্রায় সাত-আট পক্ষ কেটে গেলো, কিন্তু মুনাফাবাজদের হৃদয়-পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখা যায় নি, 'বাংলাদেশে' দুর্ভিক্ষ ও জিনিষপত্রের আকাশ-ছোঁয়া দামের সমাধানের কোনো চিহ্নও নেই, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন যথারীতি চলছে, মুষ্টিমেয়সংখ্যক লোকের ভুঁড়ি অবশ্য যথারীতি বেশি বেশি মোটা হোয়েই চলেছে, সারা দেশ জুড়ে এক অরাজকতা, বিক্ষোভ ও মোহভঙ্গের ছবি— এ সবই পুরোণো কথা— এ সব সত্যকে আর চেপে রাখা যাচ্ছে না।

এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এবং ঘটে চলেছে। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হোচ্ছে, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের প্রধান স্তম্ভ ছাত্র লীগ দু' ভাগে বিভক্ত হোয়ে গেছে— শেখ মুজিবের আশীর্বাদপুষ্ট মাখন-সিদ্দিকি গ্রুপ 'বাংলাদেশে' মুজিববাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে দৃঢ়-সংকল্প, আর রব-সিরাজের গ্রুপ মুজিববাদের ওপর অনাস্থা প্রকাশ কোরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। আবদুর রব তো স্পষ্টভাবেই ঘোষণা কোরে দিয়েছেন যে, "আমাদের জাতির পিতা, আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সবই নকল" ('নতুন দেশ' পত্রিকা, যশোর, ১০ই সেপ্টেম্বর '৭২)—"আমাদের আবার অস্ত্র হাতে লড়তে হবে" (আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮ই সেপ্টেম্বর)। বাস্তব তথ্য থেকে মনে হোচ্ছে, মুজিব-বিরোধী গ্রুপই ছাত্রদের মধ্যে বেশি প্রভাবশীল, মুজিবপন্থীদের গুণ্ডামি ও কুৎসা সত্বেও রব-সিরাজ গ্রুপের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। ছাত্র লীগের এই ভাঙন স্বভাবতঃই আওয়ামী লীগের পায়ের তলা থেকে মাটি অনেক পরিমাণে সরিয়ে দিয়েছে। সরকারী কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনেও ভাঙনের ছোঁয়া লেগে গেছে। সব মিলিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা এখন খুব ভালো চলছে না।

অবশ্য এর মধ্যেই শেখ মুজিব তাঁর গল-ব্লাডার অস্ত্রোপচারের জন্য স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য সভাসদ ও পারিষদদের নিয়ে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বিদেশে কাটিয়ে এলেন। এবং সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনের যে ব্যয়বহুল হোটেল ক্লারিজ-এ তাঁরা উঠেছিলেন, তাতে প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ মাত্র তিন হাজার টাকা!

রাষ্ট্রসংঘে 'বাংলাদেশের' অন্তর্ভূক্তির প্রশ্নে চীনের ভেটোকে কেন্দ্র কোরে শাসকগোষ্ঠী

চীন-বিরোধী এক হিষ্টিরিয়া জাগিয়ে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা কোরেও খুব সফল হোতে পারছে না। 'বাংলাদেশে' এখনও ভারতীয় সৈন্য রয়ে গেছে— এই মর্মে চীনের অভিযোগ অনেকেই অস্বীকার কোরতে পারছেন না। লেঃ কর্ণেল জিয়াউদ্দিন প্রকাশ্যেই অভিযোগ তুলেছেন ঃ "গোপন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করা হোয়েছে।" ('মুখপত্র' ঢাকা, ৩রা সেপ্টেম্বর)। ভারত 'বাংলাদেশ' থেকে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে নিয়ে যায় নি— এই মর্মে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ঘোষণার বিরুদ্ধে 'স্পোকস্‌ম্যান' পত্রিকা কিছু নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ কোরেছে— আজ পর্যন্ত তার জবাব পাওয়া যায় নি। এবং এ সব কিছুই ভারত ও 'বাংলাদেশ' সরকারের বিভিন্ন বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সন্দিহান কোরে তুলেছে।

আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যে 'বাংলাদেশ'-এর সার্বভৌমত্বকে কী চোখে দেখে— সম্প্রতি তার একটা জলজ্যান্তো প্রমাণ পাওয়া গেছে একটি ঘটনায়। 'বাংলাদেশ'-এর ছাত্রদের জন্য ১০০টি রাশিয়ান স্কলারশিপের জন্য 'বাংলাদেশ' সরকার যে ১০০ ছাত্রকে মেধানুসারে নির্বাচিত করে, তাদের মধ্যে ৪১ জনকে সোভিয়েত সরকার বাতিল কোরে দেয়, এবং তার বদলে "সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি নামক দালাল সমিতি এবং বাংলাদেশস্থ কে.জি.বি. এজেন্টদের মনোনীতদের বৃত্তি দেওয়া হয়" ('দেশ বাংলা', ঢাকা, ১৩ই আগষ্ট)। বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় 'বাংলাদেশ' সরকারের এবং তাদের রুশ-ভারতীয় প্রভুদের এই সব কীর্তিকলাপ ফাঁস হোয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই 'বাংলাদেশ'-এর 'গণতান্ত্রিক সরকার' খুব রুষ্ট হোয়েছেন, এবং সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী কোরে সোভিয়েত ও ভারতের বিরোধিতাকে নিষিদ্ধ কোরে দিয়েছেন ('মশাল', কুষ্ঠিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর)। এর আগে 'গণশক্তি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ কোরে দিয়ে এবং 'হককথা'-সম্পাদক ইরফানুল বারিকে গ্রেপ্তার কোরে তাঁরা মুজিববাদী গণতন্ত্রের যে সূত্রপাত কোরেছিলেন, এই অর্ডিন্যান্স তাকেই পরিণতি দিয়েছে— আর এই আইনে গত ৫ই সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হোয়েছে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুখপত্র'-র সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে। এখানেই শেষ নয়, রাষ্ট্রপতির ৯১ নম্বর অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে কোনো লোককে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে পুরে রাখার ক্ষমতাও (আমাদের দেশের মিসা-র মতো) শাসকগোষ্ঠি অর্জন কোরেছে। এ প্রসংগে জনৈক সাংবাদিক মন্তব্য কোরেছেন : "এটাই সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, বাংলাদেশ সরকার যখন রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ পাবার জন্য লড়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষ এখনও-পর্যন্ত-রয়ে-যাওয়া এই মৌলিক অধিকারটি পর্যন্ত কেড়ে নিলেন, এবং এভাবে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের সনদের অন্যতম মূল নীতিটিকেই অস্বীকার কোরে বোসলেন।" ('হলিডে', ঢাকা, ২০শে আগষ্ট)।

শোষণ ও নিপীড়নে জর্জরিত এবং ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত জনগণ স্বভাবতঃই প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এখনও পর্যন্ত তেমন জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠতে পারছে না। বামপন্থী শক্তিগুলি প্রায় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, কোনোরকম কার্যকরী সংহতি তারা আজ পর্যন্ত গড়েই তুলতে পারেন নি। মৌলানা

ভাসানির সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ব্যাপক গণ-সমর্থন আছে। অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁকে কেন্দ্র কোরে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু হোচ্ছিলো। কিন্তু অতি সম্প্রতি তিনি 'বাংলাদেশ'-এর সংগে পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে যোগ কোরে 'বৃহত্তর বাংলা' গড়ে তোলার যে জঘন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী আহ্বান দিয়েছেন, তাতে বিভ্রান্তিই অনেক বেড়ে গেছে, বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তিটাই দুর্বল হোয়ে পড়েছে। ফলতঃ শাসকগোষ্ঠি জনগণকে বিভ্রান্ত কোরবার এক বিরাট সুযোগ পেয়ে গেছে, এবং খাদ্য-বস্ত্রের দাবীতে কেউ বিক্ষোভ দেখালেই তাকে ''চীন-মার্কিণ চক্রান্ত' বোলে ঠাণ্ডা কোরে দেবার চেষ্টা কোরছে।

তবুও এ আশা নিশ্চয়ই কোরবো যে, প্রকৃত বামপন্থীরা সঠিক পথে আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং 'বাংলাদেশ'-এর জনগণকে শোষণ থেকে প্রকৃত মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭২

চাষীর গান

সুজন সেন

বস্তাপচা সস্তা বুলি চতুর্দিকে ছুঁড়ছে কারা?
ছুটছে গুলি অন্ধ কারায়—
থ্যাৎলানো মুখ ভ্যাপ্‌সা কাদায়
ঘসছে কারা?

ভুলবে কি ভাই
রক্তফেনায় মুখ-ডুবানো কিষাণ সবাই—
থুথুতে কি চিঁড়ে ভেজায়?
ওদের ওই ধাপ্পাবাজী বুক্‌নিবাজী
যে কারসাজি খেলছে ওরা—
দাবাড়ের ঘুঁটির চালে
আয় তোরা সব মাত্‌ কোরে দিই!

বলে সব—"হিংসা কেন?
মজবে ভুবন অহিংসাতেই!"
আহা হা হায় মরে যাই!
আয়রে দালাল! আয়রে সেপাই!
গুলি বারুদ ফ্যাল্‌ ছুঁড়ে সব,
কোলে নিয়ে বাগান বেড়াই!
আবার বলে— "অনাহারে মরছেটা কে?
আছে তো ভাত-কাপড়ে সুখেই সবাই!"
আহা হা হায় মরে যাই!
সুদখোর আর জোতদার দোষ ধরিস্‌নে ভাই!
গঞ্জে-হাটে যেথায় পাবো
মুণ্ডুটা তার কাটবো হাতে!

ফের বলে—"ভোট দিবি চল্‌!
তাক্‌দুমাদুম্‌ দেখবি সবে কেমন মজা!"
আহা হা হায় মরে যাই!
অনেককালই চোখ ফুটেছে,
বিশ বচ্ছর ভোট দিয়েছি—
এ পোড়া মুখ কোথায় লুকাই!

তখন বলে— "দেশের শত্রু!
ভরবো জেলে! কাটবো মাথা
মা-বোনেরাও পাবেনা রেহাই!"
আহা হা হায় মরে যাই!
তাই তো বলি— আয় রে জামাই!
আমাদের লাঙল-পাচন-তীর-ধনুক আর
ছিনিয়ে নেওয়া বন্দুকে যে মরচে পড়ে—
আয় রে তোদের বুকেই ঝালাই।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭২

আমাদের প্রতিনিধি 'বাংলাদেশে' গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরে এসেছেন, তারই বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন বর্তমান প্রবন্ধটিতে।

'বাংলাদেশে' কী দেখে এলাম?

পর্যবেক্ষক

'বাংলাদেশে' গিয়েছিলাম বিরাট এক ঔৎসুক্য নিয়ে। ঔৎসুক্যটা সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে, রাজনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য সম্পর্কে, সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে। এই ঔৎসুক্যটা বিফলে গেছে, এমন কথা নিশ্চয়ই বোলবো না; কিন্তু বাস্তবতঃ 'বাংলাদেশে'র রাজনীতির সংগে আমার পরিচিত ভারতীয় রাজনীতির বিরাট একটা কিছু ব্যবধান খুঁজে পাইনি— বরং বলা যায় 'বাংলাদেশে'র দর্পণে ভারতীয় রাজনীতিরই যেন প্রায় অবিকল একটি প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। কেন এমনটা মনে হোলো, সেকথায় পরে আসছি।

ঢাকায় এবং অন্যত্র বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংগে কথা বোলে দু'টো ব্যাপার খুব বেশি কোরে অনুভব কোরেছি : প্রথমতঃ, বর্তমান শাসন সম্পর্কে গভীর একটা অনাস্থা; দ্বিতীয়তঃ, 'বাংলাদেশে'র ব্যাপারে বিদেশী শক্তিগুলির, বিশেষত ভারতের, নাক গলানোর ও নিয়ন্ত্রণমূলক মাতব্বরির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সোচ্চার এক বিক্ষোভ। এবং এর কোনটাই আকস্মিক নয়, দু'টোর পেছনেই রয়েছে বাস্তব ভিত্তি।

একথা অস্বীকার কোরে কোনোই লাভ নেই যে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের ফাঁস এবং জাতিগত বৈষম্যের নগ্ন প্রকাশ সেখানকার সাধারণ মানুষকে বার-বার বিক্ষুব্ধ কোরে তুলেছে, বারবার তাঁরা লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁদের এই গভীর ও ন্যায়সংগত বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই শেখ মুজিব প্রথমে 'স্বাধিকার'-এর এবং পরবর্তীকালে 'স্বাধীনতা'র দাবী তুলেছেন। শেখ মুজিব মূলতঃ কোন্ শ্রেণী-স্বার্থে এসব দাবী তুলেছেন, মার্কিন-রুশ-ভারত প্রভৃতি বিদেশী শক্তিগুলি কে কীভাবে তাতে মদৎ জুগিয়েছে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী স্বার্থকে সিদ্ধ কোরতে চেয়েছে —অতো সব বোঝেননি সাধারণ মানুষ। এবং বোঝেননি বোলেই তারা শেখ মুজিবকে 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়ে মাথায় তুলে নেচেছেন— একদিকে যেমন প্রচণ্ড অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ কোরেছেন, অন্যদিকে তেমন মনে মনে স্বাধীন ও সুখী একটি দেশের স্বপ্ন রচনা কোরেছেন। নিজের স্বার্থেই ভারত সরকার যখন পাকিস্তানী সামরিক

বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার নাম কোরে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে এবং একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার কোরে ও সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ সমর্থনে বলীয়ান হোয়ে সৈন্য পাঠিয়ে 'বাংলাদেশ'কে 'স্বাধীন' কোরে দিয়েছে— তখন সে দেশের জনগণ এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেন নি যে একটি দেশ অন্য দেশে গিয়ে বিপ্লব কোরে দিয়ে আসতে পারে না। বুঝতে পারেন নি বোলেই তাঁরা গত ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করেননি, বরং তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন, বিপুল জনসমর্থন নিয়ে এবং ভারতীয় সৈন্যের উপর নির্ভর কোরে 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোয়েছে।

কিন্তু বাস্তব বড়ো নির্মম। কয়েক মাসের মধ্যেই, উত্তেজনা ও আবেগের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হোতেই, সেদেশের সাধারণ মানুষ অস্বস্তি উদ্বেগ ও বিক্ষোভের সংগে লক্ষ্য কোরেছেন— তাঁদের এতোদিনের গড়ে তোলা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি দেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় জনগণকে প্রচুর আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, এবং 'বাংলাদেশ'-এর জনগণ সেটা ছিলেনও। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা কী দেখলেন? তাঁরা আগেই দেখেছেন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ তারস্বরে 'স্বাধিকার'-এর দাবী উচ্চারণ কোরেছে, উত্তেজনা সৃষ্টি কোরেছে, আবার ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে গোপনে দর-কষাকষি কোরেছে, এবং অবাঙালীদের বিরুদ্ধে হিস্টেরিয়া তুলে নিরীহ শ্রমজীবী অবাঙালীদেরও ধরে ধরে খুন কোরেছে। আওয়ামী লীগের এই বিদ্রোহের মোকাবিলা কোরতে গিয়ে পাকিস্তানী সৈন্য যখন সাধারণ মানুষের ওপরেও নির্মম অত্যাচার শুরু কোরলো, তখন শেখ মুজিব গান্ধী-মার্কা পথে জেলে গিয়ে প্রাণরক্ষা কোরলেন, আর বাঘা বাঘা আওয়ামী লীগ নেতারা এবং অধিকাংশ বাঙালী জোতদার-মহাজন-পুঁজিপতি-আমলারা ধনসম্পত্তি-পরিবার নিয়ে ভারতে গিয়ে বহাল তবিয়তে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কেয়ার অফে 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার' যখন ক্ষমতায় বোসলো, তখন সমস্ত নেতা ও বিত্তশালী লোকেরা আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কোরে যথারীতি দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি নিয়ে বিলাসব্যসনে দিন কাটাতে লাগলেন এবং মাতব্বরি কোরতে লাগলেন। যে ভারতীয় সৈন্যদেরকে জনগণ দু' বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে তথ্যভিত্তিক অভিযোগ উঠতে লাগলো— তারা অসংখ্য সম্পদ, কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভারতে পাচার কোরছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 'মুক্তি বাহিনী'র দু'তিনজন মেজরকে সাসপেণ্ড হোতে হোলো। যে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রতি জনগণ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরে এসেছেন, তথ্যভিত্তিক অভিযোগ উঠতে লাগলো— সেই ভারত সরকারই 'বাংলাদেশ'কে নানারকম গোপন ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে সম্প্রসারণবাদী থাবার মধ্যে কব্জা কোরে রেখেছে, সেই ভারত সরকারের সহায়তাতেই ব্যাপক স্মাগলিং ও চোরাকারবার চলছে, ভারতের বিভিন্ন কোম্পানী দ্বিতীয়

শ্রেণীর মাল তৈরী কোরে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ছাপ মেরে সেই মাল অনেক বেশি দামে সেদেশে বিক্রি কোরছে। আর তার চেয়েও বড়ো কথা, জনগণের জীবন ধারণ করাটাও প্রায় অসম্ভব হোয়ে উঠেছে— জিনিষপত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। যেটুকু আছে তা-ও অভূতপূর্ব দামে কিনতে হোচ্ছে, যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপক সাধারণ মানুষের এতে জীবন রক্ষা করা কষ্টকর হোয়ে উঠলেও, মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তশালী লোক হেসে খেলেই দিন কাটাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই 'দালাল' বা 'গুপ্তচর' আখ্যা পেতে হোচ্ছে। অস্ত্র শস্ত্র ফেরৎ দেবার জন্য আইন কোরে এবং ভারতীয় ও বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর যৌথ-উদ্যোগে 'কুম্বিং' অপারেশন চালিয়ে সাধারণ মানুষের হাত থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা হোলো, কিন্তু আওয়ামী লীগের মাস্তানদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েই গেলো। এবং স্বভাবতই তারা এর পূর্ণ 'সদ্ব্যবহার' কোরে চললো। 'নকশাল' দেখলেই গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হোলো, এবং এ সুযোগে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের উপর তো বটেই, এমন কি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের ওপরেও প্রচণ্ড নির্যাতন চললো। খাদ্যের দাবীতে এবং মাইনে বৃদ্ধির দাবীতে ব্যাপক জনগণের ধূমায়িত বিক্ষোভকে চাপা দেবার জন্য শেখ মুজিব ঘোষণা কোরলেন— আগামী তিন বছরের জন্য সমস্ত আন্দোলন বন্ধ রাখতে হবে। এইসব অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে জনমতকে স্তব্ধ করার জন্য একের পর এক 'গণশক্তি', 'হক্‌কথা', 'মুখপত্র', 'Spokesman' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ কোরে দেওয়া হোলো। গণ-বিরোধী চরিত্রের জন্য কুখ্যাত পুরোণো আমলা ও মাতব্বর ব্যক্তিরা নোতুন শাসন ব্যবস্থায় তাদের খ্যাতি অনুযায়ী যোগ্যতার পরিচয় দিতে লাগলো। পলাতক অবাঙালী মালিকদের সমস্ত কারখানা ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্টায়ত্ত কোরে তার প্রত্যেকটিতে আওয়ামী লীগের লোকদের 'প্রশাসক' হিসেবে নিযুক্ত করা হোলো। ফলতঃ শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন দমন কোরবার এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ভুঁইফোড় ইউনিয়ন গড়ে তুলবার পথ প্রশস্ত হোয়ে গেলো। প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকার মাথায় নৈবেদ্যের কলার মতো একজন কোরে আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দিয়ে সরকারের বিরোধিতা করার সমস্ত পথই বন্ধ কোরে দেওয়া হোলো। সোভিয়েত কে.জি.বি গুপ্তচর সংস্থা এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা তো আগে থেকেই সক্রিয় ছিলো, বিভিন্ন বিদেশী ত্রাণ সংস্থার মুখোশের আড়ালে বা মার্কিণ স্বীকৃতি লাভের পর প্রত্যক্ষভাবেই মার্কিণ সি. আই. এ গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতাও বৃদ্ধি পেলো। ভারতীয় সামরিক 'উপদেষ্টাদের' প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'জাতীয় রক্ষী দল' নাম দিয়ে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক বিশেষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হোলো। গত মার্চ মাসে বহু ঘটা কোরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিদায় নেবার পরেও বহু জায়গায় সাদা পোষাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-র পোষাকে ভারতীয় সৈন্যদের দেখা যেতে লাগলো। গত জুন মাসে রাজশাহীর কাছে, আত্রাই অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবীদের অভ্যুত্থানকে দমন

করার জন্য প্রকাশ্যেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোরলো।* এবং এ সব কিছুই জনগণের চোখের সামনে ঘটে চলেছে— গত দশ মাস সময়ের মধ্যেই। এবং এরকম অসংখ্য ঘটনাই বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী শক্তির (বিশেষ কোরে ভারতের) হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল কোরে তুলেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও সাধারণ মানুষ মুজিব শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হোলেও শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে শেখ মুজিবের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার জোয়ারেও খুব দ্রুত ভাটা আসছে। আমি নিজে যাঁদের সংগে আলোচনা কোরেছি— তাঁরা সবাই-ই আমাকে এই একই তথ্য দিয়েছেন। আর ভারত-বিরোধী মনোভাব? ভাবা যায় না! এতো বেশি তার প্রচণ্ডতা। প্রথম দু' একদিন তো আমার বেশ অসুবিধেই হোয়েছে সাধারণ লোকের সংগে কথা বোলতে। আমি ভারতীয় শুনেই তারা কেমন আড়ষ্ট হোয়ে গেছেন, ভালো কোরে কথাবার্তাই বোলতে চান নি। দু' তিন দিন এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে শেষে ঠেকে শিখেছি, তারপর থেকে নোতুন কারো সংগে আলাপের সূত্রপাতেই জানিয়ে দিয়েছি— আমি ভারত সরকারের 'বাংলাদেশ' নীতির বিরোধী। সংগে সংগে দেখেছি আশ্চর্য পরিবর্তন। অসংখ্য তথ্য তারা আমাকে দিয়েছেন, মনের সমস্ত বিক্ষোভ আর বেদনা উজাড় কোরে দিয়েছেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত সরকারের সম্প্রসারণবাদী কাজ-কারবারের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা থাকলেও, তাদের দুঃখ-বেদনার সমব্যথী হিসেবে আমার মতো একজন ভারতীয়ের প্রতি সামান্যতম অসৌজন্যও তাঁরা দেখান নি— বরং আমাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেই দেখেছেন, প্রচুর ভালোবাসা আদর-যত্ন দিয়ে আমাকে ভরিয়ে দিয়েছেন।) একজন প্রৌঢ় রিক্সাওয়ালা তো আমাকে খোলাখুলিভাবেই বোললেন, "আগে ইয়াহিয়া খাঁ আমাগো শাসন করত, অখন করে ইন্দিরা গান্ধী। কী লাভ হইল ক'ন তো, আমাগো অ্যাতো রক্ত দিয়া!"

এতো গভীর ভারত-বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও তাঁরাই আবার সতর্কবাণী উচ্চরণ কোরেছেন চক্রান্ত সম্পর্ক। অনেকেরই মতে, ভারত-বিরোধী এই মনোভাবকে একদিকে

* এ সম্পর্কিত কোনো খবর শুধু আমাদের দেশেই নয়, 'বাংলাদেশের' কোনো দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় নি। 'লাল পতাকা' পত্রিকার ২০শে অক্টোবর '৭২ সংখ্যায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য বেরিয়েছে। তাছাড়া ঐ পত্রিকাতেই ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়েছে : সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রামের 'সোনালী বোর্ডিং' থেকে পুলিশ স্থানীয় জনগণের দাবীতে নারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দু'জন ভারতীয় নৌ-সেনাকে গ্রেপ্তার করে (কোতয়ালী থানা কেস নাম্বার : ১১৮৮)। নৌ-সেনা দু' জনের নাম— রমেশ চন্দ্র (বাবার নাম : কেশব লাল, গ্রাম : মালেশ্বগঞ্জ, দিল্লী) এবং বিজয় কুমার (বাবার নাম : অশোক কুমার, ৩৪ গৌসঘোল, বোম্বাই)। তদের স্বীকৃতি অনুযায়ী, তারা নিউ মুরিং নৌ-ঘাটিতে ক্যাপ্টেন বি. সি. মহাপাত্রের অধীনে কাজ কোরছে। ভারত সরকার ও 'বাংলাদেশ' সরকারের দাবী অনুযায়ী, বাংলাদেশে যদি ভারতীয় সৈন্য না-ই থাকে, তবে এরা কারা? —এ প্রশ্নও ওই পত্রিকায় তোলা হোয়েছে। ঢাকা ছাড়ার মুহূর্তে আমি শেষ খবর পেলাম— এই 'লাল পতাকা' পত্রিকাটির প্রকাশও বন্ধ কোরে দেওয়া হোলো। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যেমন মার্কিণী চরেরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহার কোরতে চাইছে, ঠিক তেমনি দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা এই ভারত-বিরোধী এবং বর্তমান শাসন-বিরোধী মনোভাবকে সঠিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত কোরে সাম্প্রদায়িক দাংগার পথে নিয়ে যেতে চাইছে। সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বোলেই এ বছর দুর্গাপূজার সময় ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচণ্ড উস্কানি সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দাংগা খুব ব্যাপক আকার নিতে পারে নি— যদিও তার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই বিভিন্ন তরফ থেকে নেওয়া হোয়েছিলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও দেখলাম, এ ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এর আরেকটি কারণ হোচ্ছে 'জয় বাংলা'-র যে উগ্র জাতীয়তাবাদী স্লোগানটি শেখ মুজিব হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কোরেছিলেন, তার ভিত্তিই ছিলো সাম্প্রদায়িকতা— শ্রেণী-নির্বিশেষে অবাঙালীদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ঘৃণার জঘন্য মানসিকতা। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই যে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ নিয়েছে, তাকেই আবার ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যেতে খুব বেশি অসুবিধের কোনো কারণ থাকে না। ঢাকা থাকার সময়েই এ ধরণের একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে গেলো। সংবিধান নিয়ে গণ-পরিষদে আলোচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার নির্দলীয় সদস্য শ্রীলার্মা যখন সংবিধানে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতির সংগে চাক্‌মা প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতিও দাবী করেন, তখন আওয়ামী লীগ সদস্যরা কুৎসিৎ আচরণ কোরে তাঁকে থামিয়ে দেন, এবং বিক্ষুব্ধ শ্রীলার্মা প্রতিবাদে গণ-পরিষদ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন।

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাও যে কতো অসম্ভব হোয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ আমি নিজেও পেয়েছি। বেনাপোল বর্ডার দিয়ে 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডে প্রবেশ কোরে প্রথম চা খাবার জন্য তিরিশ পয়সা দাম দিতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ কোরতেই চাওয়ালা বোললো— "বাবু, কী করি কয়েন— একসের চিনির দাম ষোলো থিকা আঠারো টাকা!" ঢাকার দোকানে দোকানে ঘুরে দেখেছি, খাবার দাবার-কাপড়-ওষুধ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দাম ভারতের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ বেশি। অথচ মাত্র দেড় বছর আগেই এসবের দাম ছিলো ভারতীয় দামের প্রায় অর্ধেক। ঢাকা শহরে বাস প্রায় নেই বোললেই চলে। রিক্সা অবশ্য আছে— ভাড়া কোলকাতার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। অটো ট্যাক্সিও আছে— ভাড়া কোলকাতার ট্যাক্সির তুলনায় তিন গুণ। আমি যে ক'দিন ঢাকায় ছিলাম, প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য গড়ে দশ টাকা (কোলকাতায় যেখানে লাগে এক থেকে দুই টাকা), খাবার জন্য গড়ে ছয় থেকে আট টাকা (কোলকাতায় যেখানে লাগে টাকা তিনেক) এবং ধূমপানের জন্য গড়ে তিন টাকা (কোলকাতায় লাগে ১.২৬ টাকা) খরচ কোরতে হোতো। আমি শুধু অবাক হোয়ে ভাবতাম— এখানকার সাধারণ মানুষ বেঁচে আছে কী কোরে!

আমি ঢাকায় থাকাকালীন সেখানকার পার্লামেন্টে (গণ-পরিষদ) 'বাংলাদেশ'-এর নোতুন সংবিধান গ্রহণের আলোচনা চলছিলো। এ সম্পর্কে বদরুদ্দিন উমরই সবচেয়ে

ভালো কথা বোললেন, "এই সংবিধান হোচ্ছে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটা মৌলিক ব্যবস্থা।" এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই, শুধু দু'টো কথা বলা যথেষ্ট। যদিও সংবিধানে নাগরিকদের সমস্ত চিরাচরিত অধিকারই দেওয়া হোয়েছে, তবুও "যুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ ও সশস্ত্র বিদ্রোহের" মোকাবিলা করার জন্য বা "বিশেষ কারণে" রাষ্ট্রপতি যখন খুশি সমস্ত নাগরিক অধিকারকে বাতিল কোরে দিতে পারেন। সংগঠন বা আন্দোলন গড়ে তোলার এবং মত প্রকাশের অধিকারও দেওয়া হোয়েছে, কিন্তু "বিশেষ কারণে" বা "কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে" কথা বোললে এসব অধিকারও কেড়ে নেওয়া যাবে। এর বিরুদ্ধে যদি আদালতে মামলা করেন, তবুও কিছু হবে না— কারণ রাষ্ট্রপতির কোনো শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতের কিছু করার অধিকারই নেই। এবং রাষ্ট্রপতি চলবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যা খুশি কোরবে "বিশেষ কারণ"-এর অজুহাত দেখিয়ে, কারো কিছু কোরবার নেই! আমাদের দেশের সংবিধানকেই যাঁরা অগণতান্ত্রিক বলেন (যুক্তিযুক্ত কারণেই), তাঁরা 'বাংলাদেশ' সংবিধানকে কী বোলবেন— এ প্রশ্নের উত্তরটা জানতে ইচ্ছে করে!

অথচ, মজার কথা, যে কথা আমি শুরুতেই বোলেছি, এ সমস্ত কিছুই আমার বড়ো বেশি পরিচিত বোলে মনে হোয়েছে। কারণ, শাসকশ্রেণীর এ ধরণের শোষণ-নির্যাতন, পরনির্ভরশীলতা ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা, এবং এ সবের বিরুদ্ধে জনগণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ অথচ অসহায়তা, বিভ্রান্তি, ভীতি ও আসন্ন ঝড়ের সুস্পষ্ট আভাষ এ মুহূর্তে ভারতের প্রতিটি কোণেই প্রায় দেখতে পাচ্ছি। 'সমাজতন্ত্র'-এর মোড়কে গা ঢেকে আমাদের দেশে "এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তাধারা" কাজ কোরে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে, 'বাংলাদেশে' কাজ কোরছে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মুজিববাদ"— এবং এ দুয়ের প্রকৃত স্বরূপ লোকে ক্রমশঃ বুঝে ফেলছে, তাদের বিক্ষোভ বাড়ছে, তাদের মানসিক প্রস্তুতি সংহত হোচ্ছে। একদিকে সরকারী প্রশাসন ও সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর এবং অন্যদিকে শাসক দলের পোষ্য গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্যে ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের কায়দাটাও দু'দেশে প্রায় একই রকম। সামাজিক-আর্থনীতিক বিচারেও দু' দেশের সাধারণ শত্রুরা প্রায় এক। এবং দু' দেশেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর 'বি টিম' হিসেবে কাজ কোরছে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল পার্টিগুলি— আমাদের দেশে সি. পি. আই, এবং ও দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিং) ও ন্যাপ (অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর)। মস্কোর নির্দেশে আমাদের দেশের মতো ওদেশেও এই পার্টিগুলি শাসক দলের সংগে নিজেদের ব্যবধান বোঝানোর জন্য কিছু কিছু প্রগতিশীল বুলি ও লোক দেখানো আন্দোলন সম্প্রতি শুরু কোরেছে।

সাদৃশ্যটা এখানেই শেষ নয়। এদেশের মতো ওদেশেও বিরোধী দলগুলিকে সাধারণভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ একদিকে আছে সেই সব প্রকাশ্য দলগুলি, যারা 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' বা 'সমাজতন্ত্র'-এর কথা বলে সুস্পষ্টভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের

প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না, এখনও পর্যন্ত বাস্তবতার অজুহাত দিয়ে পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কথা বলে, এবং কার্যতঃ নির্বাচনী রাজনীতির কানাগলির মধ্যেই বিপ্লবের প্রতি শুভেচ্ছাসম্পন্ন জংগী দলীয় কর্মীদের আটকে রাখতে চায়— যেমন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (আবদুর রব-মেজর জলিল) ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি—লেনিনবাদী (অমল সেন), বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি (দেবেন শিকদার-আবুল বাসার) প্রভৃতি; অন্যদিকে আছে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী গোপন দলগুলি, যারা নিজ দেশে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না— যেমন, কমিউনিষ্ট পার্টি— মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী (মোহাম্মদ তোয়াহা), পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি— মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী (আবদুল হক), পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি— মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী (আলাউদ্দীন-মতিন), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিরাজ শিকদার)। ওদেশের এই দু' ধরণের বামপন্থী পার্টির প্রায় প্রত্যেকটিরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা কোরে একটা জিনিষই ধরা পড়েছে আমার কাছে— চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতির দিক দিয়ে এদের সঙ্গে আমাদের দেশের এই দু' ধরণের পার্টিগুলির কিছু কিছু অমিল আছে বটে, তবে ব্যবধান খুব একটা বেশি নেই।

প্রথম ধরণের দলগুলির বক্তব্য আলোচনা কোরলে দেখা যাবে, এদের প্রায় সবারই মতে, ওদেশে গত বছর পাকিস্তান সরকারের শাসন ও জাতিগত বৈষম্য এবং সামরিক বাহিনীর দমন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতেই স্বাধীনতা অর্জিত হোয়েছে— যদিও সে স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। ওরা নিজেরাই আমার কাছে একথা স্বীকার কোরেছেন যে, বাংলাদেশ'কে কেন্দ্র কোরে মার্কিণ, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি বিদেশী শক্তিগুলির যৌথ বা আলাদা আলাদা কিছু পরিকল্পনা বা অভীপ্সা ছিলো। আওয়ামী লীগ জনগণের বিপ্লবী লড়াইয়ের সঙ্গে সামিল না হোয়ে এসব শক্তিগুলির হাতিয়ার হিসেবেই কাজ কোরেছে। তাই মৌলানা ভাসানির মতে, বর্তমান 'বাংলাদেশ' সরকার রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাঁবেদার দালাল সরকার। দেবেন শিকদার-আবুল বাশারের মতে, এটা ভারতের ওপর নির্ভরশীল সরকার। অমল সেন-কাজী জাফরদের মতে, এই সরকার পুরো স্বাধীন বা পুরো পরাধীন— কোনোটাই নয়। তবে এদের প্রত্যেকেরই মতে, 'বাংলাদেশ' এখনও সাদা পোষাকে প্রচুর ভারতীয় সৈন্য রয়েছে। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আমি কথা বোলে দেখেছি, তারাও এই মতই পোষণ করেন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি দলই 'বাংলাদেশ'-এর ব্যাপারে ভারত সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে গত বছর সমর্থন কোরেছেন বা ধন্যবাদ জানিয়েছেন— এমনকি ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশেরও কোনোরকম বিরোধিতা অন্ততঃ প্রকাশ্যে করেন নি। কিন্তু আমায় সঙ্গে আলোচনায় এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু ভারত সরকারের মতিগতির এবং বিশেষ কোরে ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশের (তাঁরা সবাই একে আজ 'আক্রমণ' বোলছেন) বিরোধিতা কোরলেন। গতবছর তাঁরা কেন তঁদের বর্তমান বক্তব্যকে প্রকাশ্যে

তুলে ধরেননি— আমার এ প্রশ্নের উত্তর মৌলানা ভাসানী এড়িয়ে গেছেন; দেবেন শিকদার-আবুল বাশাররা জানালেন— নিজেদের জীবনরক্ষার তাগিদেই তারা প্রকাশ্যে একথা বলেন নি (কমিউনিষ্টরা প্রকৃত সত্যকে উদঘাটিত করার চেয়ে নিজেদের জীবন রক্ষাকেই প্রাধান্য দেয় কিনা, এ প্রশ্ন অবশ্য আমি সৌজন্যবশতঃ করিনি!); অমল সেন-কাজী জাফররা যুক্তি দিলেন— জনগণ ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানানোয় তাঁরা এর বিরোধিতা কোরতে পারেন নি (জনগণ অসচেতনভাবে একটি ভুল লাইনকে অনুসরণ কোরলেও কমিউনিষ্টরা সেই ভুলকে মেনে নিয়ে লেজুড়বৃত্তি করে কিনা, এ প্রশ্নটিও আমি সৌজন্যবশতঃ করিনি!)। তবে এসব থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হোয়ে যাচ্ছে যে, গত বছর জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়েই তাঁরা ভারত সরকারের বিরোধিতা করেন নি, এবং এবছর ঠিক ওই একই কারণে তাঁরা এর বিরোধিতা কোরছেন। অর্থাৎ মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী রাজনীতি নয়, জনপ্রিয়তার বিচারেই তাঁরা নীতি নির্ধারণ কোরেছেন। অবশ্য এব্যাপারে মৌলানা ভাসানীর বক্তব্য অনেক সুস্পষ্ট। তিনি আমাকে জানালেন— "আমি তো কমিউনিষ্ট নই, আমি মুসলমান", "আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মার্কস্‌বাদ বা মুজিববাদ কিছুই থাকবে না, থাকবে শুধু ঐশ্লামিক সমাজতন্ত্র।" বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

'বাংলাদেশ' প্রশ্নে চীনের ভূমিকাকে এঁরা সবাই ভুল মনে করেন,— কিন্তু চীন বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসেছে, এমন কথা কেউ মনে কোরছেন না। এঁদের মতে, চীন 'বাংলাদেশ'-এর জনগণের মানসিকতা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি বোলেই এ ভুল কোরেছে; তবে এ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা কোরে চীন ঠিকই কোরেছে। এ প্রসঙ্গে আমি নিজেও বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে কথা বোলে দেখেছি, তাঁরা মোটেই চীনের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ কোরছেন না (যেমনটা তাঁরা আজ কোরছেন মার্কিশ, রাশিয়া ও ভারতের বিরুদ্ধে) বরং তাদের মনোভাবটা অনেকটা ভুল বোঝাবুঝির মতো। এবং একারণেই আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী পার্টি দু'টি কর্তৃক বিঘোষিত "মার্কিন-চীন যৌথ ষড়যন্ত্র"-এর তত্ত্বে কেউই বিশ্বাস করেন না।

বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাসানী এবং দেবেন শিকদার-আবুল বাশাররা 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী' বোলে মনে করেন। কিন্তু অমল সেন-কাজী জাফররা মনে করেন, এমন কথা বলার মতো তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি— যদিও সোভিয়েতে ১৯৫৬ সাল থেকে সংশোধনবাদীরাই ক্ষমতায় রয়েছে, এবং সেখানে কিছু কিছু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এঁদের কারও নীতিগত আপত্তি নেই। তবে 'বাংলাদেশ'-এর আগামী নির্বাচনে ১৯৭২-এর পশ্চিমবংগ নির্বাচনের পদ্ধতি অনুসৃত হোতে পারে বোলে তাঁরা আশংকা কোরছেন।

উপরোক্ত দলগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় এদের সবার অবস্থান অনেকটা আমাদের দেশের সি. পি.এম, আর. এস. পি, এস. ইউ. সি প্রভৃতির মতো। অমল সেন-

দের 'লেনিনবাদী' পার্টি তো খুব স্পষ্টতঃই আমাদের দেশের 'মার্কস্‌বাদী' পার্টির বিশেষ ঘনিষ্ঠ পার্টি। তবে কয়েকটি ব্যাপারে এ দুই দলের পার্থক্যটা খেয়াল করার মতো : (১) 'লেনিনবাদী' পার্টি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংশোধনবাদী বোললেও চীনকে, 'বামপন্থী হঠকারী' বোলতে রাজী নয়। কিন্তু সি. পি. এম সোভিয়েত ও চীনকে বর্তমানে বিপ্লবের পথ থেকে সমপরিমাণে বিচ্যুত বোলে মনে করে। 'বাংলাদেশ' প্রশ্নেও 'লেনিনবাদী' পার্টির তুলনায় সি. পি. এম অনেক বেশি চীন-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ কোরেছে। (২) 'লেনিনবাদী' পার্টি 'বাংলাদেশে' ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশের সুস্পষ্ট বিরোধী (অন্ততঃ বর্তমানে)। এদেশের সি. পি. এম এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে সুস্পষ্ট সমর্থনই জানিয়েছিলো। (৩) 'লেনিনবাদী' পার্টি ওদেশের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের ভুল বোলে মনে করেন, কিন্তু এক কথায় তাদেরকে পুলিশ-এজেন্ট ও প্রতিবিপ্লবী বোলে চিহ্নিত কোরতে রাজী নন— বরং তাদের বিরাট আত্মত্যাগের প্রতি এঁরা শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আর এদেশের সি. পি. এম কোনোদিনই সশস্ত্রে বিপ্লবে বিশ্বাসীদের একটি রাজনৈতিক শক্তি বোলেই মনে করেন নি, তাঁদের ওপর ব্যাপক পুলিশী দমন নির্যাতনেরও বিরোধিতা করেননি— বরং পুলিশদের সঙ্গে তাদের "গোপন যোগসাজসের তত্ত্ব"-ই তারস্বরে প্রচার কোরে এসেছেন।

এবং আরেকটি ব্যাপারেও ওদেশের আইনী বামপন্থী আন্দোলনের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমি মৌলানা ভাসানীর কথা বোলছি। ভারতের বামপন্থী রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভাসানীর মতো বিরাট জনপ্রিয় কোনো একক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অবশ্য ভাসানী তাঁর এই বিরাট জনপ্রিয়তাকে কতোদূর পর্যন্ত জনগণের কাজে লাগিয়েছেন, সেটা বিতর্কের বিষয়। প্রথমতঃ, তাঁর জনপ্রিয়তার ভিত্তি যতোখানি রাজনৈতিক তার চেয়েও বেশী ধর্মীয়। দ্বিতীয়তঃ, অতীতে জনগণের দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র কোরে প্রতিটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সামনের সারিতে তাঁকে দেখা গেছে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ওই আন্দোলনগুলিকে জনগণের চূড়ান্ত মুক্তির লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি বরং প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি কোরেছেন বারবার। অতি সম্প্রতি খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র কোরে সারা 'বাংলাদেশ' জুড়ে ক্ষুধিত জনতার যে আন্দোলনের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিলো, তার পরিণতিতে দেখা গেলো ভাসানী তাঁদের সামনে বাঁচবার পথ হিসেবে হাজির কোরলেন 'অবিভক্ত বাংলা' গড়ে তোলার কর্মসূচী। সমগ্র আন্দোলনটির শেষ পরিণতি হোলো বিভ্রান্তি ও হতাশায়। আর 'বাংলাদেশ'-এর সঙ্গে পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতির ভারতীয় বাঙালীদের নিয়ে তিনি যে 'অবিভক্ত বাংলা'র কর্মসূচী হাজির কোরেছেন তাতে ভারতীয় বাঙালীদের মানসিকতা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয়ই নিহিত রয়েছে। দীর্ঘদিনের জাতিগত বৈষম্যের কারণে এবং উগ্র-জাতীয়তাবাদের 'কল্যাণে' ওদেশের বাঙালীদের যে মানসিকতা গড়ে উঠেছে, এদেশে বাঙালীদের ক্ষেত্রে সেটা যে খুব একটা প্রধান ব্যাপার নয়— এ কথাটাই তিনি খেয়াল করেন নি। তৃতীয়তঃ, আজ মুজিব সরকারকে তিনি বিদেশী শক্তির তাঁবেদার বোলে

অভিহিত কোরছেন, কিন্তু গত বছর তো তিনি বাংলাদেশ'কে ঘিরে বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের চক্রান্তের বিরুদ্ধে একটি কথা বলাও দরকার মনে করেন নি। এবং এ সব কিছুর ফলে ভাসানীর সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপই উৎকেন্দ্রিক ও লক্ষ্যবিহীন এক ভাববাদী আন্দোলনের রূপ নিতে বাধ্য হোচ্ছে।

সদ্যগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলটি (রব-জলিল) এখনও একটি ''অজানা'' ব্যাপার, কিছুটা রহস্যময়ও বটে। এর বর্তমান নেতারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও 'মুজিববাদী বিপ্লব'-এর অন্যতম সূত্রধর ও পুরোহিত ছিলেন। এঁদের দলের নামটি কেন হিটলারের দলের নামের (নাজী পার্টি, বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) সঙ্গে পুরোপুরি এক, তার ব্যাখ্যা এঁরা দেওয়া দরকার মনে করেন নি। এরা প্রথম আত্মপ্রকাশেই ''বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র''-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কোরেছেন— যদিও তার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি, এবং 'সশস্ত্র জনযুদ্ধ'' ঘোষণা কোরে দিয়েছেন— যদিও নেতারা বহাল তবিয়তে গাড়ী হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে এ কথা ঠিক, ছাত্র লীগের নেতৃস্থানীয় অনেক কর্মীই এঁদের সঙ্গে চলে আসায় শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে অন্ততঃ বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন্ পরিণতি লাভ করেন— তা খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

এবার ওদেশের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী দলগুলির কথায় আসা যাক্। আমাদের দেশে সি. সি. আই (এম এল) দলের মধ্যে রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে যে বিতর্ক গত বছর থেকে শুরু হোয়েছে, ওদেশেও মোটামুটি একইভাবে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে বিতর্ক চলেছে, এবং তারই ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) এখন দ্বিধাবিভক্ত হোয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি— এম এল (মোহাম্মদ তোয়াহা) বর্তমান বাংলাদেশ'কে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশ মনে করে, আর ই. পি. সি. পি— এম-এল (আবদুল হক) একে সোভিয়েতের উপনিবেশ মনে করে। এই উভয় পক্ষের মতেই এখন ওদেশের মূল দ্বন্দ্ব হোচ্ছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তোলাই এখন বিপ্লবীদের মূল দায়িত্ব। তৃতীয় দল পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি-এম-এল (আলাউদ্দিন মতিন) এখনও 'বাংলাদেশ'-এ সামন্ততন্ত্রের সংগে জনতার দ্বন্দ্বকেই মূল দ্বন্দ্ব মনে করে, অর্থাৎ তাদের মতে, জাতীয় গৃহযুদ্ধ এ মুহূর্তের দায়িত্ব। চতুর্থ একটি দল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিরাজ শিকদার) 'বাংলাদেশ'কে ভারতের উপনিবেশ মনে করে, এবং অন্যান্য ধরণের শোষণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় শোষণও চালাচ্ছে বোলে মনে করে।

রণনীতিগত ও রণকৌশলগত ক্ষেত্রে মোহাম্মদ তোয়াহারা গোপনে ব্যক্তিগত খতমের লাইনকে বর্তমানে স্বীকার কোরছেন না; পার্টিকে গোপন রেখে গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর (সম্ভব হোলে প্রকাশ্যেও) জোর দিচ্ছেন; শহরে খতম অভিযান বা স্কুল-কলেজ পোড়ানোর এবং মূর্তি ভাঙার লাইনের বিরোধিতা কোরছেন; সমভূমি অঞ্চলে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী বা জংগলে ঘেরা

দুর্গম এলাকায় গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরছেন। অতীতে নিজেদের ভুল লাইন অনুসরণের ফলে যে ক্ষতি হোয়েছে, এঁরা সেটা স্বীকার কোরছেন, এবং খুব খোলাখুলিভাবেই আত্ম-সমালোচনা কোরছেন।

আবদুল হকরা এখনও খতমের লাইন অনুসরণের পক্ষপাতী; গণ-আন্দোলন বা গণ-সংগঠনের বর্জনের লাইনেও তাঁরা অবিচল আছেন; অন্যান্য বিতর্কিত প্রশ্নে তাঁরা মতামত জানাতে রাজী হন নি।

আলাউদ্দীন মতীনরাও খতমের লাইন অনুসরণ কোরছেন। এঁদেরই এক নেতৃস্থানীয় কর্মী ওবেইদুর রহমানের নেতৃত্বে গত মে-জুন মাসে রাজশাহীর আত্রাই অঞ্চলে এক গেরিলা-এলাকা গড়ে ওঠে, কিন্তু পরবর্তীকালে খতমের লাইনের ওপর অত্যাধিক নির্ভরতার ফলে এঁদের গণ-ভিত্তি অনেকটা দুর্বল হোয়ে যায়, এবং এই সুযোগে ভারতীয় ও 'বাংলাদেশ' সেনাবাহিনী যৌথ আক্রমণ এবং প্রচণ্ড নির্যাতন ও খুনের রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে সেই আন্দোলনকে দমন করে। ওবেইদুর রহমান ও মতীন প্রচণ্ড আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। ৫০/৬০ জন বিপ্লবী কর্মী নিহত ও প্রচুর সংখ্যক আহত ও বন্দী হন।

ওদেশের প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবি বদরুদ্দিন উমরের (যিনি অতীতে ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর প্রকাশ্য মুখপত্র 'গণশক্তি'র সম্পাদক ছিলেন) সঙ্গে আলোচনা কোরে যেটুকু বুঝলাম, তিনি মতাদর্শগত বিরোধের কারণে বর্তমানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্র এখনও জনগণের প্রধান শত্রু। পার্টির উচিত, জাতীয় পরিস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা, এবং নিজস্ব উদ্যোগে লাইন ঠিক করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তিনি পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও পার্টির পক্ষ থেকে তাঁকে 'প্রতিবিপ্লবী' বোলে চিহ্নিত কোরে দেওয়া হয় নি।

ওদেশে সশস্ত্র আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখলাম, অন্ততঃ তিনটি দল (মোহাম্মদ তোহায়া, আব্দুল হক এবং আলাউদ্দীন-মতীনদের নেতৃত্বাধীন) পরস্পরকে 'প্রতিবিপ্লবী' চিহ্নিত কোরে দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে 'শ্রেণীসংগ্রাম' শুরু করেনি, বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ পর্যন্ত কিছু পরিমাণে আছে। এমনকি প্রকাশ্য বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের সঙ্গেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্পর্ক শত্রুতামূলক নয়। অর্থাৎ ১৯৭০-৭১-এর পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম—সি. পি. আই. এম-এল কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক হত্যার লাইন (যার মূল দায়িত্ব অবশ্যই সি. পি. এম-এর, যদিও সি. পি. আই. এম. এল-এরও যথেষ্ট দায়িত্ব এব্যাপারে ছিলো) এঁরা গ্রহণ করেন নি। তার একটা কারণ মনে হোলো, এখানকার উপরোক্ত তিনটি সশস্ত্র বিপ্লবে আস্থাবান দলের মধ্যে কোনোটাই ওখানকার ব্যাপক জনগণের থেকে, বিশেষ কোরে গ্রামাঞ্চলের থেকে, বিচ্ছিন্ন নন।

ওদেশে সশস্ত্র বিপ্লবে যাঁরা আস্থাবান, তাঁদের মধ্যে আর একটি অত্যন্ত সুস্থ ও অনুসরণযোগ্য প্রবণতা লক্ষ্য কোরলাম। উপরোক্ত তিনটি দলকে ব্যাপক ও গভীর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিতর্কের মাধ্যমে এবং অতীতের প্রতিটি ভুল কাজ ও নীতির সমালোচনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোরে তোলার একটি সচেতন প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের

দেশেও কানু সান্যাল, নাগভূষণ পটনায়েক, সৌরেন বসু প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা ঐ একই পদ্ধতিতে অতীত ভুলের সমালোচনার ভিত্তিতে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ কোরে তোলার এক সময়োপযোগী আহ্বান যখন জানিয়েছেন, তখন ওদেশেও ঠিক একই প্রচেষ্টা চলছে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক।

উপসংহারে একটি কথাই আমি বোলতে চাই। বর্তমান ভারতের মতো বর্তমান 'বাংলাদেশে'ও আমার মনে হোয়েছে, এক আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস শোনা যাচ্ছে। দু'দেশের ব্যাপক জনতাই হতাশা, বিভ্রান্তি ও মোহ কাটিয়ে উঠছেন, নিজ-নিজ দেশে তাঁদের চাঞ্চল্য ও স্বতঃস্ফূর্ত পদসঞ্চার শোনা যাচ্ছে। ১৯৬৭-র 'বসন্ত নির্ঘোষ'-এর মতো নোতুন নির্ঘোষই কেবল আজ পারে দু'দেশের জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত পদসঞ্চারকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে। এবং তারই প্রস্তুতিতে দু'দেশের বিপ্লবীরাই আজ নোতুন কোরে সংঘবদ্ধ হবার, নোতুন এক জোয়ার তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এব্যাপারে এ দু'দেশের আগামী বিপ্লবী আন্দোলন পরস্পরকে অতি অবশ্যই সাহায্য কোরবে, নোতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কোরে তুলবে। ইন্দো-চীনের তিন জনতার ঐক্যবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল শিক্ষা আমাদের চোখের সামনেই আছে। ইন্দো-চীনের সেই শিক্ষার আলোকে ভারত-'বাংলাদেশ'-এর জনতাও (এবং সম্ভবতঃ পাকিস্তানেরও) আগামী দিনে তাদের সাধারণ শত্রুদের মোকাবিলা কোরতে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে, অথচ নিজ নিজ নেতৃত্বের নির্দেশিত পথেই, আরব সাগর থেকে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত এক যৌথ ও ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দেবেন না— এমন কথা কে বোলতে পারে! 'বাংলাদেশ' ঘুরে এসে আমার মনে অন্ততঃ এ সম্ভাবনার কথাটা বার বার উঁকি দিয়ে গেছে।

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭২

১৯৭২ সালের জুন মাসে বিশাখাপত্তমে সি. পি. আই (এম-এল)-এর কয়েকজন নেতা কর্তৃক জেলের ভেতর থেকে প্রচারিত বোলে বর্ণিত নিম্নোক্ত দলিলটি 'Frontier' পত্রিকার ৪ঠা নভেম্বর '৭২ সংখ্যা থেকে নেওয়া হোয়েছে।

পিকিং এবং সি. পি. আই (এম-এল)

কমরেডগণ,

আমরা সকলকে আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের মনে হোচ্ছে, আমরা এই মতামতগুলি আপনাদের কাছে পাঠাবার উপযুক্ত নই। কিন্তু পার্টির মধ্যে যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ কোরছে, তার জন্য আমরা এ পথ নিতে বাধ্য হোচ্ছি।

ইতিমধ্যেই আশা করি আপনারা জানতে পেরেছেন যে, ভারতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে মহান, গৌরবপূর্ণ ও সঠিক চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি আমাদের কাছে কিছু অত্যন্ত মূল্যবান ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মতামত পাঠিয়েছিলেন।

আমাদের সুবিধের জন্য এই মূল্যবান মতমতগুলির কিছু অংশ আমরা নীচে তুলে দিচ্ছি :

১) বামপন্থী হঠকারিতা এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি— এই উভয় বিরোধী (alien) প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই চীনের পার্টি গড়ে উঠেছে এবং বিকাশলাভ কোরেছে।

২) তিনটি শক্তিশালী হাতিয়ারের সাহায্যে চীনের বিপ্লব সফল হোয়েছে : (ক) পার্টি, (খ) গণফৌজ (গ) যুক্তফ্রন্ট।

৩) একটি পার্টির চেয়ারম্যানকে অন্য পার্টির চেয়ারম্যান বলা ভুল এবং..... এতে এদেশের শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় মানসিকতা আহত হবে।

৪) যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে আপনাদের ধারণা ভুল। আপনারা বোলেছেন, কয়েকটি ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠার পরেই কেবল যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে। এটা একটা যান্ত্রিক ধারণা। যুক্তফ্রন্ট হোচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে, এবং আবার তা ভেঙে যায়। এটা কোনো চিরস্থায়ী সংগঠন নয়। নিঃসন্দেহে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যই হোচ্ছে এর প্রধান ভিত্তি। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের পেছনে প্রধান ধারণাটা হোচ্ছে শোষিতদের সঙ্গে শোষকদের ঐক্য (সেই সব শোষকরা, যারা বিপ্লবের মূল লক্ষ্য নয়)। বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে মুৎসুদ্দি বলে অভিহিত করাটা ভুল।

৫) প্রকাশ্য ট্রেড ইউনিয়ন, প্রকাশ্য গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন যুগোপযোগী নয়

(out of date) এবং গোপনে হত্যার পথই একমাত্র পথ— এই তত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায় ঃ এ সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করা উচিত। আগে আপনাদের 'খতম' কথাটির আমরা ভুল অর্থ কোরেছিলাম। আমরা ভাবতাম, এই ধারণাটি বুঝি আমাদের চেয়ারম্যানের খতমের লড়াইয়ের ধারণা থেকে নেওয়া হোয়েছে। কিন্তু 'লিবারেশন' পত্রিকার (সি. পি. আই. এম-এল-এর মুখপত্র) জুলাই, ১৯৭০ সংখ্যা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম, এই খতম মানে গোপনে হত্যা করা।

৬) আপনারা লিন পিয়াও'র জনযুদ্ধের তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ কোরেছেন। লিনের গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব একটি সামরিক বিষয়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় আমাদের যখন ১০ লক্ষের এক ফৌজ ছিলো, তখন সেনাবাহিনীর কিছু কমরেড এই শ্লোগান তুলেছিলেন যে, অবস্থানগত ও সচল যুদ্ধের কৌশলই (Positional and mobile warfare) জনগণকে সমবেত (mobilise) করার পথ। এই ভুল তত্ত্বের উত্তরে কমরেড লিন বোলেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধই জনগণকে সমবেত করার একমাত্র পথ। এই সামরিক তত্ত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নের কোনোই সম্পর্ক নেই।

৭) কোনো বিপ্লবী যদি শ্রেণী শত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত না করে, তবে সে কমিউনিষ্টই নয়— এই তত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায় ঃ এই যদি একজন কমিউনিষ্টের মাপকাঠি হয়, তবে সেই কমিউনিষ্ট পার্টি আর কমিউনিষ্ট পার্টি থাকে না।

৮) কৃষি-বিপ্লবের ওপর কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের শ্লোগানটিকে ভূমি-সমস্যার বিপরীত হিসেবে তুলে ধরা হোয়েছে। কোনো ভূমি-কর্মসূচীও নেই।

৯) গণ-সংগ্রাম ও গণ-সংগঠন ছাড়া কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম টিকে থাকতে পারে না। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নকশালবাড়ীর সংগ্রামকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবেই সমর্থন করে নি। নকশালবাড়ীর সমর্থনে চীনে প্রকাশিত এবং 'লিবারেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ' প্রবন্ধটি এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবে।

১০)একজন নেতার কর্তৃত্ব ও মর্যাদা তৈরী করা যায় না, তা গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে।

১১)সি. পি. আই (এম-এল)-এর সাধারণ দিক্‌নির্দেশ সঠিক, কিন্তু তার নীতি ভুল।

ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টির এই মূল্যবান মতামত ও সমালোচনাগুলিকে আমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কোরছি। আমরা গভীরভাবে অনুভব কোরছি যে, আমাদের দেশের কৃষি-বিপ্লবের স্বার্থে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত উপরের মতামত ও সমালোচনাগুলিকে গ্রহণ করা উচিত ছিলো, আত্ম-সমালোচনা করা উচিত ছিলো, এবং ভুলগুলি শুধরে নেওয়া উচিত ছিলো।

কিন্তু গভীর হতাশা, দুঃখ ও বিরাগের সঙ্গে আমরা দেখেছি, কমরেড চারু মজুমদার এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটি উপরের মূল্যবান মতমতগুলি থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার কোরেছেন। আমাদের মতে, তাঁর যদি ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টির মতামতগুলি সম্পর্কে

কোনো দ্বিমত থাকতো, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃমূলক পার্টির মতামতগুলিকে সমস্ত পার্টি-ইউনিটে আলোচনার জন্য পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ পথ গ্রহণ কোরতে ব্যর্থ হন, এবং তার ফলে পার্টির মধ্যে আলোচনা ও মত-বিরোধ জেগে ওঠে। এটা হোচ্ছে ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অনুসৃত পুরোণো এক বাজে পদ্ধতি ও অভ্যেস। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পার্টি লাইন গৌরবময় নকশালবাড়ী কৃষক অভ্যুত্থানের পথ থেকে বিচ্যুত হোয়েছে। অর্থাৎ, কৃষক আন্দোলনের ওপর তাঁদের রিপোর্টে প্রদর্শিত পথ মূলগতভাবে আমাদের সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত 'বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ' প্রবন্ধে রূপায়িত পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হোয়েছে। আমরা গভীর ভাবে উপলব্ধি কোরছি যে, আমাদের নীতিতে বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতি ঘটেছে এবং তার ফলে ভুল বামপন্থী হঠকারী পদ্ধতি অনুসৃত হোয়েছে।

ফলশ্রুতিতে বর্তমানে আমাদের পার্টি বাস্তবতঃ বিভিন্ন গ্রুপ ও উপদলে বিভক্ত হোয়ে গেছে। কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরী এই পদ্ধতিরই শিকার হোয়েছেন। এবং এজন্য আমাদের দেশের সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের স্বার্থ ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কোরছি যে, আমরা কোনো গ্রুপ বা উপদলের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশ কোরছি না। মাওসেতুং চিন্তাধারায় বিশ্বাসী সি. পি. আই (এম-এল)-এর ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অশত্রুতামূলক। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতির জন্য পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড চারু মজুমদার মূলতঃ দায়ী। এবং একই সঙ্গে, আমরা এটাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পার্টির প্রথম কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যরা এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে মনোনীত (Co-opeted) সমস্ত সদস্যরা তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না— কারণ তাঁরাও কম-বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতির জন্য দায়ী।

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা, সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে আমাদের ভুল স্বীকার কোরছি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা কোরছি যে, আমরা এ প্রসঙ্গে আমাদের কমরেডদের সমালোচনা বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ কোরবো। আমরা নিজেরাও পূর্ণ সততার সঙ্গে আত্ম-সমালোচনা কোরছি। আমরা পূর্বতন ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যদেরকে আমাদের সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের স্বার্থে তাঁদের ভুল স্বীকার কোরতে এবং আত্ম-সমালোচনা কোরতে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা আমাদের পার্টির সমস্ত সদস্য ও সমর্থকদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ কোরছি, তাঁরা যেন বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে এসে কমরেড চারু মজুমদার কর্তৃক প্রবর্তিত বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতির লাইনকে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁকে সততার সঙ্গে আত্ম-সমালোচনা কোরতে এবং আমাদের সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাঁর ভুল স্বীকার কোরতে আহ্বান জানান। আমরা আমাদের কমরেড ও সমর্থকদের আরও অনুরোধ কোরছি, তাঁরা যেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদেরকেও সমালোচনা করেন, এবং

তাঁদেরকে নিজেদের ভুল স্বীকার কোরতে এবং সততার সঙ্গে আত্ম-সমালোচনা কোরতে আহ্বান জানান। বর্তমানে পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ বামপন্থী-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে আমাদের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেও বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা আমাদের পার্টির সমস্ত সদস্যদের কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন নিজ নিজ এলাকার সংগ্রাম সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রণয়ন করেন; সমগ্র পার্টির মধ্যে আলোচনা শুরু করেন; 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' প্রবন্ধে রূপায়িত নকশালবাড়ীর পথের আলোকে, এবং মহান, গৌরবময় ও সঠিক চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মতামতগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ কোরে, ভুলগুলিকে বিনা দ্বিধায় শুধরে নেবার প্রচেষ্টা চালান; এবং সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নোতুন এক ঐক্য গড়ে তোলেন।

কানু সান্যাল
চৌধুরী তেজেশ্বর রাও
সৌরেন বসু
ডি. নাগভূষণম্ পট্টনায়ক
কোল্লা ভেংকটাইয়া
ডি. ভুবনমোহন পট্টনায়ক

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭২

ভারতের বুকে বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ

চীনের 'পিপলস্ ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়।। ৫ই জুলাই, ১৯৬৭

প্রচণ্ড গর্জনে ভারতের বুকে ধ্বনিত হোয়েছে বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির একটি বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক লাল এলাকা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে এটি এক প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ।

গত কয়েকমাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের কৃষক জনতা ছিঁড়ে ফেলেছেন আধুনিক সংশোধনবাদের বন্ধন, চূর্ণ-বিচূর্ণ কোরেছেন তাঁদের পায়ের শৃঙ্খল। তাঁরা জমিদার ও বাগিচা-মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন শস্য, জমি ও অস্ত্রশস্ত্র, শাস্তি দিয়েছেন স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদমাস বাবুদের, অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছেন তাঁদের দমন কোরবার জন্য প্রেরিত প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী ও পুলিশদের ওপর, এবং এভাবে প্রমাণ দিয়েছেন কৃষকদের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচণ্ড শক্তির। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী, দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদমাস বাবুরা, এবং প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী ও পুলিশেরা বিপ্লবী কৃষকদের কাছে তুচ্ছ হোয়ে গেছে, এদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য তাঁরা দৃঢ়সংকল্প হোয়েছেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ পুরোপুরি সঠিক কাজ কোরেছেন, এবং এটা কোরেছেন চমৎকারভাবে। সারা দুনিয়ার মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী ও বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনগণও দার্জিলিং অঞ্চলের ভারতীয় কৃষকদের এই বিপ্লবী ঝড়কে উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ভারতীয় কৃষকদের বিদ্রোহ ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লব হোচ্ছে অনিবার্য। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শাসন এছাড়া আর কোনো বিকল্প রাখেনি। কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত, নামে স্বাধীন হোলেও, বাস্তবতঃ এখনও একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামন্ত রাজপুত্র, বৃহৎ জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব কোরছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে ভারতীয় জনগণের ওপর নির্দয় নির্যাতন ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার পুরোণো প্রভু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল থেকেই সে তার নোতুন প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার এক নম্বর সহযোগী সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এভাবে সে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে ব্যাপক ভাবে বিকিয়ে দিয়েছে। কাজেই ভারতীয় জনগণের বিশেষ কোরে

শ্রমিক ও কৃষক জনতার, পিঠের ওপর বিরাট পাহাড়ের মতো চেপে আছে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ। গত কয়েক বছরে কংগ্রেস সরকার অনেক বেশি তীব্রভাবে ভারতীয় জনগণের ওপর তার নির্যাতন ও শোষণ বাড়িয়েছে এবং জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ কোরছে। ফলতঃ বছরের পর বছর ধরে দেশে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ। জনগণের অনাহারে মৃত্যু হোয়ে দাঁড়িয়েছে একটি অতি সাধারণ দৃশ্য। ভারতীয় জনতার, বিশেষ কোরে কৃষক জনতার, বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হোয়ে দাঁড়িয়েছে। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকরা ফেটে পড়েছেন বিদ্রোহে, হিংসাত্মক বিপ্লবে। এটা সারা ভারত জুড়ে কোটি কোটি জনতার হিংসাত্মক বিপ্লবেরই সূচনা। ভারতের জনগণ সুনিশ্চিতভাবেই তাঁদের পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলবেন এই বিরাট পাহাড়গুলিকে, অর্জন কোরবেন চূড়ান্ত মুক্তি। এটাই হোচ্ছে ভারতের ইতিহাসের সাধারণ ধারা। দুনিয়ার কোনো শক্তিই একে বাধা দিতে বা ঠেকাতে পারবে না।

ভারতীয় বিপ্লব কোন্ পথে এগোবে— এই মৌলিক প্রশ্নটির ওপরেই নির্ভর কোরছে বিপ্লবের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং ৫০ কোটি ভারতীয় জনতার ভবিষ্যৎ। ভারতীয় বিপ্লবকে অবশ্যই গ্রহণ কোরতে হবে কৃষকদের ওপর নির্ভর কোরবার, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার এবং সর্বশেষে শহর দখল করার পথ। এটাই হোচ্ছে মাওসেতুঙের পথ, যে পথ চীন বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছে, যে পথ নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের বিপ্লবের বিজয়ের একমাত্র পথ।

আজ থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাওসেতুং বোলেছিলেন, "চীনের মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে কোটি কোটি কৃষকেরা জেগে উঠবে বিরাট এক ঝড়ের মতো, হারিকেনের মতো। এতো দ্রুত ও ধ্বংসাত্মক হবে তার শক্তি যে, কোনো শক্তি, তা সে যতো বড়োই হোক না কেন, একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের বন্ধনকারী সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে তারা দ্রুত বেগে এগিয়ে যাবে মুক্তির পথ ধরে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং বদ বাবুদের তারা ছুঁড়ে ফেলবে কবরের মধ্যে।"

দীর্ঘদিন আগেই চেয়ারম্যান স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে জনগণের বিপ্লবে কৃষক সমস্যার রয়েছে এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মূল শক্তি কৃষকরাই। তারাই হোচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সংখ্যাবহুল মিত্র। ভারত আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একটি বিরাট দেশ, পঞ্চাশকোটি লোকের বাসস্থান যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হোচ্ছে কৃষক। একবার জেগে উঠলে এই কোটি কোটি কৃষকরাই হোয়ে উঠবেন ভারতীয় বিপ্লবের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হোয়ে ভারতীয় সর্বহারারা সমর্থ হবে বিশাল গ্রামাঞ্চলে দুনিয়া-কাঁপানো সব পরিবর্তন আনতে, হৃদয় দুলিয়ে দেওয়া জনযুদ্ধে যে কোনো শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত কোরতে।

আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, "সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে প্রশ্নের মীমাংসাই হোচ্ছে বিপ্লবের মূল দায়িত্ব, সর্বোচ্চ রূপ। বিপ্লবের এই মার্কস্‌বাদী নীতি চীন এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।"

চীন বিপ্লবের মতো ভারতীয় বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যই হোচ্ছে : সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সাথে সংগ্রাম চালাচ্ছে। সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র সঠিক পথ। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। 'গান্ধীবাদ', 'পার্লামেন্টারি পথ' প্রভৃতি আবর্জনাগুলি হোচ্ছে ভারতীয় জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত আফিং। কেবলমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের ওপর নির্ভর কোরেই এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরেই বাঁচানো যায় ভারতকে, সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন কোরতে পারেন ভারতীয় জনগণ। নির্দিষ্টভাবে বোলতে গেলে, এর মানে হোচ্ছে ঃ কৃষক জনতাকে বলিষ্ঠভাবে জাগিয়ে তোলা; বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারিত করা; সাময়িকভাবে বিপ্লবী বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক প্রণীত জনযুদ্ধের নমনীয় রণনীতি ও রণকৌশলের সমগ্র শিক্ষাকে প্রয়োগ করা; দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পথে অবিচল থাকা, এবং ক্রমাগত পদক্ষেপে বিপ্লবের বিজয় অর্জন করা।

চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধে অবিচল থাকতে হোলে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের পরাজিত কোরতে হোলে "বিপ্লবী কর্মীদের অবশ্যকর্তব্য হোচ্ছে পিছিয়ে থাকা গ্রামগুলিকে অগ্রসর ও সুসংবদ্ধ ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করা, বিপ্লবের দুর্ভেদ্য সামরিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গে পরিণত করা। সেখান থেকেই লড়াই চালাতে হবে সেই সব ঘৃণ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে, যারা গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য শহরগুলিকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এভাবেই ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন কোরতে হবে।"

ভারত একটি বিশাল দেশ। গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক দুর্বল। সেখানেই বিপ্লবীরা অবাধে কৌশলী অভিযান চালাতে পারেন। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তাধারার বিপ্লবী লাইন অনুসরণ কোরলে এবং তাঁদের প্রধান মিত্র কৃষকদের উপর নির্ভর কোরলে ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে পিছিয়ে থাকা বিশাল গ্রামাঞ্চলে একের পর এক অগ্রসর বিপ্লবী গ্রামীন ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং নোতুন ধরণের এক গণফৌজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব। এ ধরণের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা যতো রকম অসুবিধা, বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীনই হোন না কেন কালক্রমে তাঁরা সেগুলির বিকাশ ঘটাতে পারবেন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে বিরাট এলাকায় ছোটো এলাকা থেকে বিস্তৃত এলাকায়, ঢেউয়ের মতো বিস্তৃতিতে। এভাবে ভারতীয়

বিপ্লবের পথে শহরগুলিকে গ্রামাঞ্চল দিয়ে ঘিরে ফেলার অবস্থা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে, শহরগুলিকে চূড়ান্তভাবে দখল করার এবং দেশ জুড়ে বিজয় অর্জনের পথ পরিষ্কার হবে।

ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা দার্জিলিঙের গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হোয়ে পড়েছে। আসন্ন বিপর্যয়ের ইংগিত পেয়ে তারা সাবধানী কাঁদুনী গাইতে শুরু কোরেছে যে, সেখানকার কৃষক-বিদ্রোহ "জাতীয় বিপর্যয়ে পরিণত হবে।" সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা অসংখ্য পদ্ধতিতে দার্জিলিঙের কৃষকদের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন কোরবার এবং অংকুরেই একে বিনষ্ট কোরবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ডাঙ্গে দলত্যাগী চক্র এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মুষ্টিমেয় সংশোধনবাদী পাণ্ডারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীদের এবং দার্জিলিঙের কৃষকদের বিরুদ্ধে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য প্রচণ্ড কুৎসা ও আক্রমণ চালাচ্ছে। দার্জিলিঙের কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত 'অকংগ্রেসী সরকার' প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের পক্ষ নিয়েছে। এই সব দলত্যাগীরা ও সংশোধনাবাদীরা যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদের পদলেহী কুকুর এবং ভারতের বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়াদের দালাল, এটা তারই একটা নোতুন প্রমাণ। তারা যাকে 'অকংগ্রেসী সরকার' বোলে বর্ণনা কোরছে, তা-ও এই জমিদার ও বুর্জোয়াদেরই হাতিয়ার মাত্র।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং আধুনিক সংশোধনবাদীরা তাদের অন্তর্ঘাতমূলক ও দমনমূলক কাজ-কারবারে পরস্পরের সঙ্গে যতোই সহযোগিতা করুক না কেন, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীদের এবং দার্জিলিঙের বিপ্লবী কৃষকদের দ্বারা প্রজ্বলিত সশস্ত্র সংগ্রামের মশালকে নেভানো যাবে না। "একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল জ্বালাতে পারে।" দার্জিলিঙের স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালিয়ে দেবে, এবং সুনিশ্চিতভাবেই ভারতের বিশাল এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেবে। কালক্রমে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক বিরাট ঝড় যে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা সুনিশ্চিত। যদিও ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের পথ হবে সুদীর্ঘ ও আঁকাবাঁকা, তবু মহান মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তধারার পরিচালনায় ভারতীয় বিপ্লব সুনিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন কোরবে।

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭২

কলকাতা '৭১

নবীন দর্শক

এই মুহূর্তে ঠিক এরকম একটা ছবিরই যেন বড়ো বেশি প্রয়োজন ছিলো। আর এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিটা এসেছিলো দু' দিক থেকেই। একদিকে ছিলো পুতিগন্ধময় নর্দমার ঐতিহ্যের অচলায়তন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ধারায় একটা বেশ সাড়া-জাগানো আঘাত হানার কামনা। অন্যদিকে ছিলো ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সাময়িক ভাটার টানে সংশয় ও দোদুল্যমানতার শিকার এবং নিজেদের গায়ের রক্তের দাগ মুছে গা-বাঁচানোর সুবিধেজনক প্রচেষ্টায় সশব্যস্ত মধ্যবিত্তকুলের নিশ্চিন্ত নিস্পৃহতার গালে একটি সশব্দ থাপ্পড় বসানোর বাসনা। এই দ্বিবিধ প্রয়োজনীয়তার সামগ্রিক না হোলেও আংশিক পরিপূরণেই এ ছবির সার্থকতা, এবং সে কারণেই এছবিকে স্বাগত অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই।

অথচ যিনি এ কাজটি কোরেছেন, সেই মৃণাল সেন নিজেই ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একজন বহু পুরস্কার-ধন্য প্রতিষ্ঠিত পুরুষ, এবং শ্রেণী অবস্থানগত বিচারে মধ্যবিত্ত। আর এ ছবিটির নায়ক-নায়িকারাও সবাই মধ্যবিত্তই এবং এর আবেদনও প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে মধ্যবিত্তকুলেরই মধ্যেই। তবুও একথা বিনা দ্বিধাতেই বলা যায় যে, প্রকাশভঙ্গির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হোলেও (এবং অংশতঃ তা অবশ্যই অহেতুক), ভঙ্গি দিয়ে মন ভুলাবার সৌখীন মজদুরীর বদলে (ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণ রেখা' মনে পড়ছে।) ভাবের ওপরেই জোর পড়েছে বেশি; জমাট কোনো কাহিনী না থাকলেও, গতানুগতিক ফর্মূলায় মধ্যবিত্ত বা শ্রমিকদের চিত্রিত করার বদলে (ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' বা উৎপল দত্তের 'ঘুম ভাঙার গান' মনে পড়ছে!) চলচ্চিত্রের পরিণত ভাষায় সামগ্রিক একটা বক্তব্যকেই তুলে ধরা হোয়েছে। একাত্তরের কোলকাতার বিস্ফোরিত ক্রোধকে সহানুভূতি দেখাবার নাম কোরে নাম কেনার প্রচেষ্টা হিসেবে নয়, বরং এর পটভূমিকার শিল্পসম্মত প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্রোহী কোলকাতার আগ্নেয় বিস্ফোরণের ন্যায্যতার রূপায়ণ হিসেবেই এ ছবিকে বিচার কোরতে হবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষতঃ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেলেও পূর্বপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় সাম্রাজ্যবাদের উত্তরধিকার এখনও আমাদের পিঠের ওপর বিরাট

পাহাড়ের মতোই চেপে আছে। তাই সাহেবী পোষাকের অভাবে নিশ্চিত চাকরী লাভে ব্যর্থ রঞ্জিৎ মল্লিকের বিচারের প্রহসন। তার অপরাধ সে সাহেবের মূর্তিটার গা থেকে পোষাক খুলে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটির নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছিলো। কিন্তু সে বিচারের প্রহসনকেও থমকে দাঁড়াতে হয়, চমকে উঠতে হয় সুন্দরী কোলকাতাকে— একাত্তরের কোলকাতার সশব্দ বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায়। আর সেই বিস্ফোরণের নায়ক কুড়ি বছর বয়স নিয়েও হেঁটে চলেছে হাজার বছর ধরে— দারিদ্র্য, মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে পায়ে পায়ে— মনে মনে বয়ে নিয়ে হাজার বছরের ইতিহাস— দারিদ্র্যের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস.....

তিরিশের দশকে সে গরীব এক পরিবারকে দেখেছে বস্তির জীর্ণ ঘরে বর্ষার কান্নার মতো অঝোর ধারায় ভিজতে, রাগে জ্বলে উঠতে (যদিও সে রাগ লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে নিরীহ এক কুকুরের ওপরে গিয়ে ফেটে পড়েছে), এবং শেষ পর্যন্ত বড়োলোকের করুণা ভিক্ষা করার চেয়ে সমগোত্রীয় শোষিত মানুষের সঙ্গকেই বরণ কোরে নিতে। চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলায় সে দেখেছে বাঁচবার তাড়নায় নিরুপায় এক পরিবারকে, দেহ বিক্রি কোরে জীবন ধারণের গ্লানিতে মনের সঞ্চিত রাগে পরস্পরের প্রতি ফুঁসে উঠতে। পঞ্চাশের দশকে সে দেখেছে চালের স্মাগলিং-এর ওপর নির্ভর কোরে বেঁচে থাকা মা আর ছেলেকে, ছেলের স্বাভাবিক জীবন গড়ে তোলার জন্য মা'র যতো স্বপ্নকে সে রূপান্তরিত হোতে দেখেছে বুক-ফাটা আকুল কান্নায়, কিশোর এস্‌মাগ্‌লারের বঞ্চনার ক্রোধকে ফেটে পড়তে দেখেছে সহানুভূতিহীন এক মাস্তান বাবুমশায়ের নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সত্তরের দশকে সে দেখেছে "শ্রমিক-দরদী' এক বিরাট শিল্পপতিকে মদের বোতল হাতে নোতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার এবং উৎপাদন বাড়াবার (না, 'গরীবি হঠাও'-র?) বুকনি দিতে দিতে শ্রমিক ঠেঙাতে। বংশ-পরম্পরায় জমে থাকা এই ক্রোধেরই বিস্ফোরণ ঘটেছে একাত্তরের কোলকাতায়, যার পরিণতিতে আজকের নায়ক প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ঘাতক পুলিশের গুলিতে— আকাশবাণীর দেব-বাণীর মহিমায় ঘোষণা শোনা গেছে 'পথ-দুর্ঘটনায়' এক যুবকের নিহত হবার— অন্ধকার রাত্রির অবসানে উদ্ভাসিত পূর্ব দিগন্ত থেকে নিষ্কলুষ মুক্ত আলোকের বন্যা এসে সস্নেহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিহত সেই নায়কের মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে।

সাধারণ অর্থে কাহিনীহীন এই চলচ্চিত্র কাহিনীকে রূপায়িত কোরতে গিয়ে পরিচালক দশকওয়ারি খণ্ড কাহিনীগুলিকে নিটোল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছবি কোরে রাখেন নি, বরং সেগুলির সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন, একাত্তরের কোলকাতার বিস্ফোরণের ভালো মন্দের বিশ্লেষণ করা নিরুচ্চার সমর্থনের অভিব্যক্তিই আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে, এবং এখানেই ছবিটির সার্থকতা। চলচ্চিত্রের সুষমামণ্ডিত ভাষায় কখনো তির্যকতায়, কখনো বা বলিষ্ঠ ঋজুতায়, আমাদের চেতনায় এসে আঘাত হেনেছে দৃশ্যের ব্যঞ্জনা : সাজানো-গোছানো এক কৃত্রিম বিচারালয়, বিচারক ও সরকারী উকিলের নোংরা অশ্লীলতা, বিচারকের হস্ত ধৃত হাতুড়ির অদৃশ্য ইংগিত, এবং শোষকশ্রেণীর

ধর্মঘট ভাঙার নারকীয় বীভৎসতা ও উল্লাসের কল্পনায় রঞ্জিতের অট্টহাসি; আকাশবাণীর মিথ্যার বেসাতি; বর্ষায় বস্তির বিপর্যস্ত জীবন, অবিশ্রান্ত বর্ষণের সাথে দরিদ্র পরিবারের ব্যথা-বেদনা-কান্নার একাত্মতা, ভেজা বিড়ির মতোই নিভে যাওয়া ক্রোধের আগুন, লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্রোধ, এবং দরিদ্র মানুষের একাত্মতা; মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় থেকে গা বাঁচানো দাদার হৃদয়হীনতা, অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছেও মধ্যবিত্ত জননীর মর্যাদা রক্ষার করুণ প্রয়াস, এবং কলহের আগুনে সঞ্চিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ; সদ্যোজাত পুত্রকে ঘিরে মা'র স্বপ্ন, স্বাভাবিক জীবনের প্রতি পথভ্রষ্ট কিশোরের আকুতি ও ব্যর্থতাজনিত ব্যঙ্গের ঝলক, মধ্যবিত্ত বাবুমশাইদের ঠুনকো মর্যাদাবোধ, মেরুদণ্ডহীনতা ও আত্ম-সমর্পণ, কিশোর বালকের দৃপ্ত প্রতিবাদ; সমাজের উচ্চতম স্তরের কোটিপতিদের সৌখিন মজদুরী, মুরগির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে ক্ষুধার্ত মানবতার ছবি দেখে সহানুভূতির বিলাস, নির্বাচন নামক শয়তানি তামাশার অন্তঃসারশূন্যতা, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওয়া কেড়ে নিয়ে সুখী ভারত গড়ে তোলার হাস্যকর সংকল্প; এবং সবশেষে রাষ্ট্রযন্ত্রের হিংস্র অভিযানের শিকার একাত্তরের কোলকাতার বিদ্রোহী নায়কের জবানিতে মধ্যবিত্তকুলের আত্ম-জিজ্ঞাসা। এ সব অসংখ্য দৃশ্য কখনো ব্যাঙ্গের তির্যকতায় মনকে বিক্ষুব্ধ কোরে তোলে, কখনো বা রাগে জ্বালায় মুষ্টিবদ্ধ কোরে তোলে হাত। সীমাবদ্ধতাটা স্বীকার কোরে নিয়েও বোলবো; মৃণাল সেন অনেকাংশেই আজকের রুদ্ধশ্বাস দিনগুলোর পটভূমিকার সঙ্গে দর্শকদের একাত্মতা (আংশিকভাবে হোলেও) আনতে পেরেছেন, এবং সেজন্য সর্বপ্রথমে তাঁকে অভিনন্দন জানানোটাই হবে এদেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আগেই বোলেছি, 'কার জন্য?' —প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের এই মূল প্রশ্নটির বিচারে মৃণাল সেনের সীমাবদ্ধতা স্বভাবতঃই ধরা পড়ে। নয়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থিতাবস্থাকে মেনে নিয়ে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তবুও, এই সীমাবদ্ধতার শ্বাস-রোধ-করা আবহাওয়ার মধ্যেও, তিনি কি "কলকাতা '৭১" কে আরেকটু বেশি নিয়ে যেতে পারতেন না সাধারণ মানুষের কাছাকাছি? চলচ্চিত্র সৃষ্টি কোরতে গিয়ে চলচ্চিত্রের পরিণত ভাষা ব্যবহার কোরবেন না— এমন দাবী নিশ্চয়ই কোরবো না আমরা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে টেক্‌নিকের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি না দেখালে এ ছবি নিশ্চয়ই সর্বসাধারণের আরো বেশি কাছাকাছি যেতে পারতো, এর আবেদন আরো বেশি সুস্পষ্ট হোয়ে উঠতে পারতো। জানি, সেন্সরের কাঁচির প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে, কিন্তু এই যুক্তি দিয়েই এ ছবির আংশিক টেক্‌নিক-বাহুল্যতার উত্তর কি সত্যি সত্যিই দেওয়া যাবে? মৃণাল বাবু ভেবে দেখবেন।

সবশেষে মৃণালবাবু, জেনে রাখুন, 'ইন্টারভিউ' থেকে 'কোলকাতা '৭১-এ আপনার উত্তরণ আপনাকে যে অভিনন্দন আজ এনে দিচ্ছে, তা-ই আরো বেশি উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ, আরো বেশি সোচ্চার হোয়ে উঠবে, যদি আপনি এ পথেই অবিচল থাকেন। দিল্লী-ভেনিসের হাতছানিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আপনি যদি হৃদয়ে গেঁথে রাখেন মলিন বেশ ঘর্মাক্ত-মুখ সেই তরুণ যুবকটির কথা, ছবি দেখে মেট্রো থেকে বেরিয়ে এসেই যিনি

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে চেপে ধরেছিলেন আপনার হাত, আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বোলে উঠেছিলেন, "আপনাকে কী বোলে অভিনন্দন জানাবো জানি না.... আমার পায়ে এখনও গুলি বিঁধে আছে—একাত্তরের কোলকাতার গুলি!" —কিংবা মনে রাখেন মধ্যবিত্ত ঘরের সেই মহিলাটির কথা, যিনি ছবি দেখে বেরিয়ে এসেই আপনার হাত ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে স্মরণ কোরেছিলেন একাত্তরের কোলকাতায় রাষ্ট্রযন্ত্রের গুলির শিকার তার সেই তরুণ ভাইটির কথা— তবে দেখবেন এদেশের সংগ্রামী জনতা আপনার পাশে পাশেই থাকবে, আপদে-বিপদে-গৌরবে। তার চেয়েও কি আপনি প্রতিষ্ঠার সত্যজিৎ-মার্কা গৌরবকেই বড়ো কোরে দেখবেন? এটাই আজকের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা!

পুনশ্চঃ ভারতীয় চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী বক্তব্যের প্রচার দেখতে অভ্যস্ত 'ষ্টেটস্‌ম্যান'-'আনন্দবাজার'-এর ভাড়াটে সমালোচকরা এ ছবির বিপরীতধর্মী বক্তব্য দেখে অতোটা ক্ষিপ্ত না হোলেও পারতেন। মৃণাল বাবু আর যা-ই করুন, এ ছবিতে চিত্রিত ধর্মঘট ভাঙা বীভৎস শোষক দলের মধ্যে তিনি তো আপনাদের মুখ দেখান নি— এমনকি বিদ্রোহী কোলকাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর বিকৃত (না, বিক্রীত?) মুখগুলো তিনি তো মুখোশের আড়ালেই ঢেকে রেখেছেন!

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭২

বাংলার রেনেশাঁ—পটভূমি ও চরিত্র

উনিশ শতকের বাংলার 'নবজাগরণ' সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু আলোচনা সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। এরকম আলোচনা যত হয় তত ভাল, কারণ তাহোলে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ভবিষ্যতে সহজসাধ্য হবে। এইদিক থেকে আবুল ফজল মীর্জার এই রচনাটি (অনীক— আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২) অভিনন্দনযোগ্য বলে আমি মনে করি।

লেখক বাংলার নবজাগরণ্যের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্-ভূমির যে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, তা মোটামুটি ঠিকই আছে, তবে আমার মনে হয় ব্রিটিশ আমলে নতুন বাণিজ্যিক মূলধনের (Mercantile Capital) বিকাশ, বিকাশের পদ্ধতি, এদেশীয় traditional বণিকসম্প্রদায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) ব্যাপক অর্থনৈতিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। রাষ্ট্রিক পরাধীনতার প্রতিবন্ধকতার কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু যে সমস্ত সামাজিক শক্তি (social forces) কালোপযোগী অর্থনৈতিক গতিরোধে সক্রিয় ছিল, সেগুলি কি, অর্থাৎ তাদের স্বরূপ কি? সেগুলি যে মূলত ফিউডাল বা সামন্ততান্ত্রিক শক্তি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রভাবে এই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক শক্তি ও সংস্থাগুলি (Institutions) আরও অনেক বেশি সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়েছে, তারও যথাযথ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামদুলাল দে সরকার, মতিলাল শীল প্রমুখ উনিশ শতকের বাংলার কয়েকজন নব্যধনিকের বাণিজ্যকর্মজীবন পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যাবে।

তা ছাড়া, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও, তার সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী (Counter revolutionary) ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপের উদঘাটন আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা করেছেন বলে মনে হয় না। করা বিশেষ প্রয়োজন, তা না হলে উনিশ শতকে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্র ও প্রকৃতি বোঝা সম্ভব নয়। এই বন্দোবস্তের কল্যাণে যে বিপুল বাঙালী মধ্যবিত্তের বিকাশ হলো— শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সহ—তাঁরা আধা-urban আধা-rural, ভিতরে নয়া-সামন্ততন্ত্রের পোষাক, বাইরে শহুরে ভদ্রলোক, আধুনিক শিক্ষার ও সামাজিক প্রগতির ধ্বজাধারী। ইতিহাসের নিয়মে যে

মধ্যবিত্তরা প্রধানত Renaissance-এর প্রবর্তক, তাঁরা যদি আমাদের দেশের এই শ্রেণীর মিশ্রচরিত্রের (প্রধানত ফিউডাল) মধ্যবিত্ত হন, তাহলে নবজাগরণের যে বিকলাঙ্গ রূপ হতে পারে তাই হয়েছে বাংলা দেশে।

লেখক তাঁর প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন ঃ "বাংলার রেনেশাঁ সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর আনতে ব্যর্থ হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু বাঙালীর মানসজগতে তা লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিলো।" অর্থাৎ লেখক কি এই কথাই বলতে চান যে সমাজের 'Structure'-এ কোনো উল্লেখ্য মৌল পরিবর্তন ছাড়াই 'Super Structure'-এ বা মানসলোকে পরিবর্তন এসেছিল, এবং সেইটাই বাংলার নব জাগরণের দান। তাই যদি লেখকের বক্তব্য হয়, তাহলে সেটা মারাত্মক ভুল। অন্ততঃ এই উক্তিকে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী সমর্থন করা যায় না। বাঙালীর মানসিকতা উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেও যে কতটা আধুনিক বা পুরোপুরি 'ধনতান্ত্রিক' হয়েছে, তা বিচারসাপেক্ষ। আশা করি, এ বিষয়ে লেখক ভবিষ্যতে তাঁর কোনো রচনায় আলোকসম্পাত করবেন। অভিনন্দন ও নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি।

বিনয় ঘোষ

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৩

বহু RUPEE-র খেল ঃ ভ্রষ্ট ও স্খলিত নট-নায়ক

'অনীক' পত্রিকার আমি একজন পাঠক। আপনাদের বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত বক্তব্যের জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। আজ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর বিশেষ সংখ্যায়) আপনারা উৎপল দত্তের মতো এমন একজন ভ্রষ্ট ও স্খলিত নট-নায়কের মুখোস খুলে দিয়েছেন, যিনি বিগত প্রায় ২৫ বছরেরও বেশি কাল ধরে নাট্য আন্দোলনের জোয়ারে বহু শিল্পী-যোদ্ধাকে দলে টেনেছেন এক অদ্ভুত আকর্ষণে। সে আকর্ষণে ছিলো দীপ্ত নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর। দীর্ঘদিন দলে থাকার দিনগুলিতে যৌবনের প্রায় ১৩-১৪ বছর ধরে দেখেছি নানা উত্থান-পতন, লক্ষ্য করেছি ওপর তলার হাতছানিতে উৎপলবাবুকে পালিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে। মনে পড়ে, যেদিন আমরা মিনার্ভা থিয়েটার নিলাম, তারপর থেকেই ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাবে দেনার পরিমান বাড়তে থাকলো। তখন স্থির হোলো, মোটা দাগের নাটক চাই। হোলো 'অঙ্গার'। সাফল্য এসে গেলো শীঘ্রই। আমরা প্রতিষ্ঠিত হলাম পেশাদারী শিল্পী হিসেবে। যত দিন যেতে লাগলো, বুঝতে পারলাম— আমরা কেবল কথা দিয়ে নানা রঙের জাল বুনে চলেছি। নাটকের ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে আবার রাজনীতির ক্লাস নেওয়া হোতো। সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারিনি, কিন্তু বলার উপায় ছিলো না— আমাদের মধ্যে কথার সঙ্গে কাজের ফারাক রচনা হচ্ছিলো অনেক।

পরবর্তীকালে 'কল্লোল' যখন জনতার কল্লোলের জন্ম দিলো, 'তীর' যখন জাগিয়ে তুললো জোয়ার, তখন নানা অবহেলা আর ভ্রূকুটিকেও আমল দিইনি; কারণ ততোদিনে

আমরা দখল কোরে নিয়েছি লক্ষ মানুষের হৃদয়, মানুষের জীবনের গান গেয়ে। পরে বুঝেছি, সেই সময় থেকেই উৎপলবাবু গড়ে তুলেছিলেন নিজের জন্য ফিল্ড— যাকে বলে 'বক্স অফিস'। লক্ষ টাকার ইনাম দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদী 'গুরু' যেদিন হাতছানি দিয়েছিলো, সেদিন আমরা তাঁকে রুখবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম— আমরা ঐ টাকা তুলে দেবো, আবার ফিরে আসুন আমাদের মধ্যে, অনেক অনেক মুখ আপনার জন্য অপেক্ষা কোরে আছে। কিন্তু তিনি আসেন নি। পরবর্তীকালে নানান কথার যাদুকর উৎপলবাবুকে আর ধরে রাখা গেলো না। শহরে-গঞ্জে তখন বদলা নেবার পালা চলছে, কলকাতা জনজীবন থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে পালা বদলের পালা।

বিশ্বাস করুন, তখন আমরা, লিটল থিয়েটার গ্রুপের সদস্যরা, দারুণভাবে অপেক্ষা করছিলাম— একজন কেউ আসুক, যে অন্ততঃ পারবে একটানে ছিঁড়ে দিতে— প্রগতিবাদীর আড়ালে লুকিয়ে-থাকা অর্থগৃধ্নুতার ও মার্কসীয় দর্শন আওড়ানো একটা মানুষের মুখোশ। কিন্তু কেউ আসেনি আজ পর্যন্ত। আমরাই এককভাবে ভেতর থেকে লড়াই করেছি। এই প্রথম এভাবে সরাসরি বলিষ্ঠভাবে আপনাদের বক্তব্য পড়ে খুশি হলাম। দেরী হোলেও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। সেজন্যই আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পার্টির দায়িত্ব সঠিকভাবে এই নট-নায়কের ওপর পালিত হোলে হয়তো অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারতো। ঠিক সময় সঠিক কায়দায় আঘাত না পড়লে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে ঘটবে না, এরকম কথা বলা যায় কি? এই রকম কতো নাট্যকার বা নামী নট বা সাহিত্যিক-শিল্পী অন্যান্য নিরীহ ও নিষ্ঠাবান শিল্পীদের কাঁধে ভর কোরে নিজের দাম বাড়িয়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম কোরে নেবে— তাই আজকের সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা দরকার। তাই আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি সৎ মানুষকেই প্রতিবাদ কোরতে হবে দীপ্ত গর্জনে ও সঠিক সময়ে।

আমার মনের অনেকদিনের সঞ্চিত আবেগ এভাবে উজাড় কোরে দিয়ে ঠিক করলাম কিনা জানিনা। তবে মাফ কোরবেন, একজন নগণ্য প্রগতিপন্থী শিল্পী হিসেবে এ আবেগ আর সামলাতে পারলাম না। আন্তরিক অভিনন্দনসহ— জনৈক নগণ্য নাট্যশিল্পী

অনীক, জানুয়ারি, ১৯৭৩

ব্লিৎস্‌ক্রিগ

সৈকত রায়

ইতিহাস পথ দেখায় :
মুসোলিনি হিটলারের সেই গুপ্ত চাবি
দিয়েম থিউর হাত ঘুরে
বাঁধা পড়ে গণতন্ত্রের জামদানী আঁচলে।
বিশ্বস্ত সেবক খুসী গোঁফে দেয় চারা,
মাল্‌কিনের প্রসাদে তার সোনার সংসার।

রুদ্ধশ্বাস সেই ভয়াবহ দশক :
অবিরাম রক্তস্রোত সিক্ত করে জার্মানীর মাটি—
এখানেও তার সেই সার্থক প্রবাহ।
একাত্তরের মসীলিপ্ত বিষণ্ণ আকাশে
রাইফেলের নল ক্রমে উষ্ণ হয়ে ওঠে,
উৎসারিত শক্তি তার হিংস্র আক্রোশে
আছড়ে ফেলে একুশের দুরন্ত যৌবন।
ধর্ষিতা নারীদের অসহায় চোখ
আকাশে তাকিয়ে দেখে বিঘূর্ণিত পাখা;
হেলিকপ্টারের কক্‌পিট থেকে
হিটলারের নারীরূপ ছুড়ে ফেলে মনুষ্যত্ব
জঞ্জালের মতো।

"ইতিহাস মোড় ফেরে, পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন"—
রক্তিম পতাকা ওড়ে রাইখের উদ্ধত চূড়ায়,
মুসোলিনির শেষ চিৎকার ইতালির অরণ্য-পর্বতে
প্রতিধ্বনিত হবে না আর,
জনতার কার্‌বাইন সচকিত কোরে দেয় দিয়েমের নিস্তব্ধ কবর।

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখে দেখেছো কি, হে প্রিয়দর্শিনী
নিজের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত দানব?
বিসুভিয়সের অগ্ন্যুদগার? জাপানের ব্যাপ্ত জলোচ্ছ্বাস?
এশিয়ার মুক্তিসূর্যের নকল আলোকচ্ছটা মধ্যাহ্নের গগনেই ম্লান হোয়ে আসে।
আর সেই ফ্যাকাসে আলোয়
হিটলারের আধপোড়া দেহ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে ছুটে আসে
দিল্লীর রাজপথে ব্লিৎস্‌ক্রিগের মতো।।

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৩

কারাগার থেকে কোনো এক বন্ধুকে

সৃজন সেন

এদেশে অনেকে আজ বিকলাঙ্গ ক্রীতদাস
অনেকেই নতজানু রক্তচক্ষু কুক্কুরের ক্রুদ্ধ আস্ফালনে
এদেশে অনেক বোবা, মুখে রক্ত তুলে শুধু ফেলে দীর্ঘশ্বাস
এদেশে মানুষ বাঁচে নেড়ী কুত্তার মতো অন্ধকার কোণে!

এদেশের ঘরে ঘরে অন্ধকারে লজ্জা ঢাকে উলঙ্গের দল
শ্মশানের শান্তি আসে শকুনের ডানা মেলে দুয়ারে দুয়ারে
এদেশের পায়ে বাঁধা ডলারের রুবলের মায়াবী শিকল
এদেশের নাড়িভুড়ি শকুনের মতো খায় 'সুপার পাওয়ার'-এ।

মন্ত্রীরা এদেশে ঠগ, কবিরা এদেশে আজ বেশ্যার সমান
গণতন্ত্র এদেশেতে দুয়ারে বন্দুক হাতে জাগ্রত পাহারা
এদেশের 'কম্যুনিষ্টে' ভোট মঞ্চে চড়ে দাগে বিকট কামান
এদেশের সাংবাদিক দু'পাঁটের বিনিময়ে খেটে যায় ভাড়া!

এদেশে বিচার দণ্ড অর্থের ভারেতে ঝুলে থাকে একদিকে
কালো টাকা সাদা হয় এদেশেতে প্রতিদিন মহান কৌশলে
এদেশের চলচ্চিত্র অবক্ষয়ী যৌনবীজ ছড়ায় চৌদিকে
এবং সে পাপ ঢাকে সস্তায় 'নিরোধ' বেচে মায়ামন্ত্রবলে!

তবুও শোনাই আমি উদাত্ত কণ্ঠে তোকে জীবনের গান
অগ্নিকোণে চেয়ে দ্যাখ্ বিক্ষোভের মেঘ জমে অকাল বৈশাখে,
সে তাণ্ডবে উড়ে যাবে ঘরে ঘরে মৃত্যু শোক লজ্জা অপমান
আবার ফুটবে ফুল মৃতপ্রায় বৃক্ষদের প্রতি শাখে শাখে!

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৩

রামমোহন প্রসংগে

তরুণ রায়

মহামান্য ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাআড়ম্বরে উদযাপিত রামমোহন দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবের প্রবল জোয়ার আপাততঃ স্তিমিত হোয়ে এসেছে। এবং তথ্যবিহীন আবেগপ্রধান রামমোহন স্তুতির কুয়াশা ভেদ কোরে রামমোহন সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী মূল্যায়নের পক্ষে এটাই সম্ভবতঃ প্রশস্ত সময়।

কিন্তু এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিতে গিয়ে প্রথমেই মনের মধ্যে সন্দেহের কিছু কালো ছায়া উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে, যখন দেখি মহামান্য ভারত সরকার, যার জনগণ-বিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সামান্য বিতর্কেরও অবকাশ নেই, রামমোহন সম্পর্কে এতোই বেশি স্পর্শকাতর মনোভাবের পরিচয় দিয়ে ফেলেন যে ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতো প্রবীন ঐতিহাসিকও (যাঁর অতি বড়ো শত্রুও যাঁকে 'বামপন্থী' বলে 'অপবাদ' দিতে পারবেন না।) যখন প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক বক্তব্যের সাহায্যে প্রতিবাদ জানান এবং রামমোহনকে ফাঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বড়ো কোরে দেখানোর বিরোধিতা করেন,[১] তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পর্যন্ত প্রকাশ্যেই তাঁকে প্রচ্ছন্ন সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন না (গত বছর কোলকাতায় রামমোহন দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দ্রষ্টব্য), এবং সরকারের বিশ্বস্ত চাটুকার দেশ-আনন্দবাজার গোষ্ঠির ভাড়াটে লেখকেরা প্রমাণিত তথ্যকে গুলি মেরে তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও কসুর করেন না।[২] বিরোধী বক্তব্যকে সহ্য না করার এই নয়া-ফ্যাসিবাদী প্রবণতাই আজ রামমোহনের পুনর্মূল্যায়নকে আমাদের কাছে আরো বেশি জরুরী কোরে তুলেছে।

এই মূল্যায়ন-প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সমালোচকদের অসুবিধার্থে প্রথমেই এটা জানিয়ে রাখা ভালো যে, (ক) আজকের পটভূমিকায় রামমোহনকে বিচার করলে চলবে না, তাঁকে বিচার করতে হবে তিনি যে যুগে জন্মেছিলেন বা তাঁর কর্মজীবন যে যুগে পরিব্যাপ্ত ছিলো, সেই যুগের প্রেক্ষাপটে; (খ) রামমোহনের মধ্যে মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার প্রকাশ আশা করাটাও ঠিক হবে না, বিশেষত তিনি যখন মার্কসীয় দর্শনের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার আগেই মারা গেছেন এবং (গ) আজকের যুগের মানুষের মধ্যে যে পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী চেতনা পরিলক্ষিত হয়, তাঁর কাছে সেই পর্যায়ের চেতনা আশা করাটাও বাস্তবসম্মত হবে না।

বিচারের মাপকাঠি

এর পরে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে : তাহোলে বিচারের কোন্ মাপকাঠিতে রামমোহনের পুনর্মূল্যায়ন করাটা যুক্তিযুক্ত হবে? এর উত্তরে বলা যায়, রামমোহনের কর্মধারা প্রবাহিত হোয়েছিলো এমন এক সমাজে যার চরিত্র ছিলো ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক। এবং এই সামন্তবাদের পৃষ্ঠপোষকও ছিলো বৃটিশ, ঔপনিবেশিকরাই। এমন একটি সমাজে কোনো ব্যক্তির প্রগতিশীলতা বিচারের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়ে গেছেন অরবিন্দ ঘোষ (প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই উত্তর দেবার সময় অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীই ছিলেন, তখনও পর্যন্ত তিনি অধ্যাত্মবাদী আফিং-এর ফেরিওয়ালা 'শ্রীঅরবিন্দ' হন নি) : "রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হোচ্ছে একটি দেশের জীবনীশক্তি। প্রথমে ও সর্বাগ্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা না কোরে সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, শিল্প-সম্প্রসারণ এবং জাতির নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করাটা হোচ্ছে চরম অজ্ঞতা ও ব্যর্থতার চরম প্রকাশ।"[৩] পরাধীন ভারতের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে রামমোহনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক লালিত-পালিত ও নোতুন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামন্তশোষণের বিরুদ্ধে ভারতের নিপীড়িত ও শোষিত ব্যাপক কৃষক ও মেহনতী জনতার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর অবশ্যকর্তব্যকে আমরা মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করবো।

কিন্তু আমাদের দেশে মার্কস্‌বাদী আবরণ গায়ে জড়িয়ে যে সমস্ত তথাকথিত বামপন্থী তত্ত্ববাগীশরা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির পুরোণো মদকেই নোতুন বোতলে পরিবেশিত কোরে থাকেন, তাঁরা রামমোহনকে বিচারের উপরোক্ত মাপকাঠি সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে এক্ষুনি হৈহৈ কোরে ধমকে উঠবেন : "ভারতের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিৎটাকেই চুরমার কোরে দিয়ে এদেশে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও একমাত্র সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করার কৃতিত্বটা স্বয়ং মার্কস্‌ই কি বৃটিশদের দিয়ে যান নি— এই সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে তিনিই কি ইংল্যাণ্ডকে 'ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করে যান নি? তাহোলে, মার্কস্-এর এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে, সেযুগে বৃটিশদের প্রতি সমর্থন জানানোটাই কি প্রগতিশীলতার লক্ষণ ছিলো না?" এই সব 'মার্কস্‌বাদী' মাতব্বর ব্যক্তিদের এবম্বিধ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই আমাদের দেশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের শ্রেণী-সচেতন চিন্তাধারার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা কোরে এসেছে,[৪] এবং এখনও আসছে।[৫] ভারতে সামজিক বিপ্লবের সূচনার ব্যাপারে বৃটিশদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকার করা এক কথা, আর পররাজ্যগ্রাসী বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের পক্ষাবলম্বন করা আর এক কথা। শ্রেণী চেতনা বিকাশের পরিপন্থী উপরোক্ত ব্যাখ্যা মেনে নিলে, আজকের যুগে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদরী করতে হয়, কেননা প্রাক্-পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরে এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদীরাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছে! কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেকিার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোটি কোটি জনতা কি এ যুক্তি মেনে

নিতে পারবেন। আসল কথাটা হোচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা এই সব দেশের পুরোণো অর্থনৈতিক ভিত্তিটাকে ভেঙে দিয়ে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করে কোনো শুভবুদ্ধির তাড়নায় নয়, বরং নিজেদের শোষণের বনিয়াদটাকেই শক্ত করার জন্য। বৃটিশরাও ভারতে সেটাই করেছিলো। সেকারণেই মার্কস্ ভারতে সামাজিক বিপ্লবের সংঘটনে বৃটিশদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে নিঃসংকোচে স্বীকার কোরে নিয়েও বলেছেন, "ইংল্যাণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হোয়েছিলো শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে,"[৬] "বৃটিশরা হিন্দুস্তানের ওপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে, তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে এমন এক দানবীয় জরাসন্ধের সৃষ্টি করেছে যা সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি দানবীয়।"[৭] এরপরেও যাঁরা মার্কস্‌কে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের সমর্থনে দাঁড় করাবার জঘন্য ব্যাখ্যা হাজির করেন, তাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হবার কোনো যুক্তিই আর থাকতে পারে না।

রামমোহনের যুগ এবং 'রেনেশাঁ'-র চরিত্র

এবার তাহলে দেখা যাক, রামমোহনের যুগটা কেমন ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, সুস্পষ্ট প্রভাবের "সামাজিক ফলশ্রুতি হিসেবে একদিকে দেখা যায় শহর কোলকাতার ক্রমিক অভ্যুত্থান, অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় ইংরেজের ব্যবসা-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ-নির্ভর একটি দেশীয় ব্যবসায়ী বিত্তবান শ্রেণীর ক্রমিক বিকাশ। এরই ফলে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর চেহারাতেও শুরু হয় পরিবর্তন— টাকাকড়ির অধিকতর প্রচলন, বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং বাজারের সৃষ্টি ও বিস্তৃত ব্যবসায়িক উদ্যমের গতিশীল প্রভাব। এ সমস্তই নবাবী আমলের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্রে পরিমাণগত কিছু রূপান্তর আনতে শুরু করে। এই রূপান্তর অত্যন্ত ধীর লয়ে হোতে থাকলেও পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তনের আভাস সুনিশ্চিতভাবেই মিলেছিলো।"[৮] এবং "বাংলার অর্থনীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর এতো বেশি নির্ভরশীল হোয়ে পড়েছিল যে, এই প্রদেশের বিত্তবান ও বণিক শ্রেণীগুলির সামনে যখন বেছে নেবার প্রশ্ন উঠলো, তখন সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন কোরতে তারা সামান্য দ্বিধাও কোরলো না।"[৯]

"পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিধাতা হোয়ে উঠলো, কোলকাতা তখন হোয়ে পড়লো একদিকে এদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-প্রশাসনিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং অন্যদিকে দেশীয় বিত্তবান শ্রেণীর আশ্রয় ও আবাসভূমি। এই বিত্তবানেরা ইংরেজের সহযোগী ও অনুগত একটি শ্রেণী হিসাবে দেশীয় সমাজে বৃটিশ প্রাধান্যের ছায়ানুসারে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কোরতে এবং

নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ়ীভূত কোরতে সচেষ্ট হোলো।

এই প্রচেষ্টার ফলেই এই নোতুন বিত্তবানেরা কোম্পানী-প্রবর্তিত ইজারাদারী প্রথার (farming system) সুযোগে পুরোণো বনেদী জমিদারদের জমিদারী কেনা শুরু কোরলো।...এই ধরণের জমিদারী বন্দোবস্তকেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী রূপ দিলেন। শহর কোলকাতার ধনী ব্যবসায়ীরা স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তার সম্ভাবনা দেখে তাঁদের জমিদারীর স্থাবর আবর্তে বাঁধা পড়ে গেলো। পুরোণো জমিদারীগুলো নীলামে বিকিয়ে যেতে থাকলো, ভেঙে টুকরো টুকরো হোতে থাকলো।"[১০] বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি বৃটিশ-ছত্রছায়ার লালিত-পালিত শহরের চতুর ফড়িয়া বা মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ীদের কবলিত হোয়ে পড়লো।

"ধুরন্ধর কর্ণওয়ালিশ একই ঢিলে দুই পাখি মারলেন— ইংরেজের অনুগত আশ্রিত একটি শ্রেণীকে শহর কোলকাতা ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে বৃটিশের বন্ধু ও সমর্থক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোরলেন, এবং অন্যদিকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের পুঁজিকে জমিতে বিনিয়োগ করিয়ে ইংল্যাণ্ডের উঠতি শিল্পীয় ধনতন্ত্রের এক সম্ভাব্য প্রবল-প্রতিদ্বন্দী পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিলেন।"[১১] কর্ণওয়ালিশের এই 'চিরস্থায়ী' কীর্তি ভারতে বৃটিশদের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক স্বার্থকে এতো সন্তোষজনক কায়দায় সিদ্ধ করলো যে, এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে লর্ড বেন্টিক গভীর পরিতোষ সহকারে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রশ্নে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরাট এক সুবিধে আছে। এর ফলে যে বিপুল সংখ্যক জমিদার উদ্ভুত হোয়েছে, তারা বৃটিশ প্রাধান্য বজায় রাখতে প্রচণ্ড আগ্রহী, ব্যাপক জনসাধারণের ওপরেও তাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে।'[১২] সুবিধেটা এখানেই শেষ হয়নি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে লক্ষাধিক মধ্যসত্ত্বভোগীদের উদ্ভব হোলো, তারাও জমিদারশ্রেণীর মতোই "তাদের সুযোগ-দানকারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হোয়ে পারেনা।"[১৩] ঠিক একই কথা খাটে ইংরাজী শিক্ষিত নোতুন পেশা নির্ভর বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পর্কেও। এবং এই ভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালী জমিদার, মধ্যসত্ত্বভোগী, বর্গাজমির মালিক এবং ইংরাজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবিকানুসারীরা পরস্পর নির্ভরশীল একটি সামাজিক শ্রেণীর রূপ গ্রহণ করলো যে শ্রেণীর স্বার্থ বাঁধা ছিলো ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে— এবং ভূমিব্যবস্থার স্রষ্টা, পালক এবং রক্ষক ইংরেজ-রাজের সংগে।

এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরাজি আন্দোলন, নীল-বিদ্রোহ, পাবনা-অভ্যুত্থান প্রভৃতি যে সব কৃষক বিদ্রোহ ক্রমাগত ভাবে বারবার জেগে উঠেছে, যেগুলো সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে শুরু হোলেও শেষ পর্যন্ত অবধারিতভাবেই সামন্তবাদের আশ্রয় দাতা ও রক্ষাকর্তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্যে পরিণতি পেয়েছে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই প্রত্যেকটি গৌরবময় পদক্ষেপে প্রধানতঃ বিরোধিতাই করেছে এদেশের বৃটিশ-তাঁবেদার জমিদার-মধ্যসত্ত্বভোগী শিক্ষিত বাবুদের দল। এটা তারা করেছে তাদের

শ্রেণীগত স্বার্থেই এবং এভাবে প্রথম থেকেই তারা বারবার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে শত্রু হিসেবে নিজেদের শ্রেণী-স্বরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের সমাজচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, "বাংলার নোতুন মুৎসুদ্দিরা জমিদার হোয়ে বসেছে, এবং নোতুন সমাজের বাছাই অংশ বৃটিশ শাসনের দেশীয় সহযোগী ও দালালে পরিণত হোয়ে বৃটিশ বুর্জোয়াদের 'উদারনীতি'র প্রতিধ্বনি করেছে।"[১৪] এবং এই শূণ্যগর্ভ প্রতিধ্বনির ঐকতানকেই আমাদের দেশের তাবৎ বাঘা বাঘা ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা নাম দিয়েছেন 'রেনেশাঁ'!

"ইতালীর রেনেশাঁর অনুসরণেই বাংলার রেনেশাঁ কথাটি ব্যবহৃত হোয়েছে। কিন্তু ইতালীতে বা পরবর্তীকালে য়ুরোপ মহাদেশে রেনেশাঁ আন্দোলনের যে সামাজিক তাৎপর্য ছিলো, তার সঙ্গে বাংলার রেনেশাঁকে আমরা কতোখানি তুলনা করতে পারি? ইতালীর রেনেশাঁর উদগাতা, সমঝদার তথা সমর্থক ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী— শিল্প, ব্যবসা, পুঁজির কারবারের সঙ্গে যাঁরা ছিলো জড়িত। এই বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রেনেশাঁ আন্দোলন য়ুরোপীয় সামন্ত সমাজকে ভেঙেচুরে নোতুন সমাজ-কাঠামো রচনার সফল প্রচেষ্টা ছিলো।"[১৫] সামন্ত প্রথার সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ ভূমিদাসত্বের (serfdom) শৃংখলে আবদ্ধ কৃষক জনসাধারণ ছিলো য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান শক্তি। আর "বঙ্গদেশের তথাকথিত 'রিনাসান্স' আন্দোলন ছিলো বিদেশী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিজ প্রয়োজনে সৃষ্ট জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের লইয়া গঠিত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিগোষ্ঠীর আত্মসংহতি ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই আন্দোলনে বঙ্গদেশের বিপুল কৃষক জনসাধারণ ছিলো তাহাদের শ্রেণী-শত্রু, সহযোগী নয়। বঙ্গীয় 'রিনাসান্স' আন্দোলন য়ুরোপের 'রিনাসান্সের' ন্যায় সমাজ কাঠামোর কোনো পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে হয় নাই, বিদেশী শাসকগোষ্ঠির সহযোগিতায় ভূস্বামিশ্রেণীর নিজ শোষণব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার এবং আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের তথাকথিক 'রিনাসান্স' আন্দোলনে ছিলো য়ুরোপীয় 'রিনাসান্স' আন্দোলনের বিপরীতধর্মী। বঙ্গদেশের ভূস্বামিগোষ্ঠির এই আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী লেখকগণ য়ুরোপের অনুকরণে 'রিনাসান্স' নামে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা ও চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১৬]

বাংলার 'রেনেশাঁ' সম্পর্কে এই সঠিক ও বস্তুবাদী বিশ্লেষণকে ভারত সরকারেরই 'সেন্সাস কমিশনার' অশোক মিত্র পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হোয়েছেন : "লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামিশ্রেণীই শহরে নিয়ে এলো সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়। এই নবজাগরণকে অনেক সময় ভুল কোরে 'রেনেশাঁ' আখ্যা দেওয়া হয়। ....এই জাগরণ এসেছিলো প্রধানতঃ শহরে। বেন্টিংক যাদের পরজীবী (Parasite) আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই ভূস্বামিশ্রেণীর

মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিলো। এই মুৎসুদ্দি জমিদারগোষ্ঠির অন্তরের কামনা ছিলো গ্রাম থেকে দূরবর্তী শহরে বসে শাসকগোষ্ঠির গৌণ অংশীদার হওয়া। এটা ছিলো 'রেনেশাঁ'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি পেয়েছিলো শাসকগোষ্ঠির সংগে উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর মধ্যে দিয়ে। 'রেনেশাঁ' আন্দোলন দেশের গ্রামীন অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারে নি।"[১৭]

ফলতঃ ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপের মানবতাবাদী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার (যেটা সে যুগে অতি অবশ্যই ছিলো প্রগতিশীল) বুলি আওড়ালেও বাস্তব ভিত্তি না থাকার দরুণ সেটাই হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো এক ধরনের আমদানি-করা ও লোক-দেখানো প্রগতিশীলতা— সে যুগের ভারতীয় সমাজের দুই মূল শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে মূলগতভাবে তার কোনো প্রগতিশীল ভূমিকাই ছিলো না। তাই ইউরোপের প্রগতিশীল 'রেনেশাঁ'র পুরোপুরি বিপরীতধর্মী এই বঙ্গীয় 'রেনেশাঁ' বাস্তবতঃ ছিলো বিরাট "এক ঐতিহাসিক ধাপ্পা।"[১৮]

রামমোহন ঃ ব্যক্তিগত ও শ্রেণী-অবস্থান

বঙ্গীয় 'রেনেশাঁ' নামধারী এই ঐতিহাসিক ধাপ্পাবাজীর প্রাণপুরুষ তথা 'পথিকৃত' হিসেবেই রামমোহনকে দেখতে হবে। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী যুগের জমিদার। ওই সময়ের অন্যান্য জমিদারদের মতো তাঁর পরিবারের লোকেরাও অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে নিমগ্ন হন। কিন্তু তিনি নিজে যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে সামন্তবাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক রেখে কোম্পানির কাগজ কেনা-বেচা এবং বৃটিশদের ধার দেওয়া শুরু করেন, এবং এভাবে কোম্পানির মুৎসুদ্দি হোয়ে ওঠেন। দশ বছর ধরে তিনি বৃটিশদের দেওয়ানগিরি করেন। এবং এভাবে বিরাট পরিমান অর্থ সঞ্চয় কোরে তিনি আবার বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের এক জমিদারী কেনেন, এবং এই কোলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শ্রেণীগত বিচারে তিনি ছিলেন একই সঙ্গে নোতুন ধরনের এক সামন্তভূস্বামী এবং বৃটিশদের মুৎসুদ্ধি। বৃটিশদের সান্নিধ্যের ফলে তৎকালীন ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসার তিনি সুযোগ পান, এবং এই চিন্তাধারার প্রভাবে ভারতীয় সমাজের সনাতন গোঁড়ামি, কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু পরিমানে সোচ্চার হোয়ে ওঠেন। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার এই প্রভাব খুব বেশি গভীর হোতে পারে নি। নিজের বৃটিশ-আশ্রিত সামন্তবাদী শ্রেণী-অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে ইউরোপের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনুসরণে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তিনি মূলগতভাবে কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হোয়েছিলেন।

এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি পুরোপুরি সামন্তবাদী জীবনধারাই বজায় রেখেছিলেন। মাত্র দশ বছর সামান্য মাইনের দেওয়ানগিরি কোরেই বার্ষিক দশ হাজার

টাকার জমিদারী কেনার মতো টাকা সঞ্চয় করাটা কিশোরী চাঁদ মিত্রের মতো ঘনিষ্ঠ লোকের চোখেও খুব অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো, এবং এ ঘটনা রামমোহনের মতো "অনন্যসাধারণ লোকের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে" বলে তাঁর মনে হোয়েছিলো।[১৯] তিনি ছিলেন "ভোগী পুরুষ এবং পুরাদস্তুর অ্যারিষ্টোক্র্যাট..... তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একটা গোটা পাঠা খাইয়া ফেলিতেন এবং সুরাপানও করিতেন... তিনি নিজে অত্যন্ত সৌখীন ও বিলাসী লোক ছিলেন। তিনি সুখৈশ্বর্যের মধ্যে কলিকাতায় থাকিতেন।"[২০] মাঝে মাঝেই তিনি বাড়ীতে প্রচণ্ড বিলাসব্যসন ও আড়ম্বরের মধ্যে পার্টি দিতেন। সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা এবং বৃটিশ রাজপুরুষরা তাতে আমন্ত্রিত হোতেন। নিকী বাঈজীর মতো নর্তকীরা সে সব পার্টিতে নাচতো। এবং এই সমস্ত কিছুই তাঁর শ্রেণী-অবস্থানের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য রামমোহন ভক্তরা তাঁকে নিয়ে হৈচৈ করলেও তান্ত্রিক মতে শৈব বিবাহ পদ্ধতির প্রতি— বর্তমানে যা রক্ষিতা পোষার সমার্থক বলে বিবেচিত হোয়ে থাকে— তাঁর সমর্থন ছিলো।[২১] তিনি নিজে পৈতে পরতেন, বাবার মৃত্যুর পরে নিজের কোলকাতার বাড়ীতে আলাদাভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত করেছিলেন। নিজেকে তিনি পুরোপুরি হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। এবং এখানেই ধরা পড়ে যে, "তাঁহার ভাবের ঘরে চুরি ছিলো", তাঁর চিন্তাধারাগত প্রগতিশীলতা কতো বেশি অগভীর ও মেকী ছিলো।

রামমোহনের ভূমিকা

এবার তাহোলে দেখা যাক ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামমোহন কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, আমাদের পূর্ব-নির্ধারিত মাপকাঠির বিচারে কতোখানি প্রগতিশীলতার পরিচয় তিনি দিতে পেরেছিলেন।

(এক) তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত বিপুল সংখ্যক কৃষক জনতার দুঃখ-দুর্দশায় বিগলিত হোয়ে মুখে কিছু কিছু সহানুভূতির প্রকাশ ঘটালেও তিনি ছিলেন কৃষক জনতার ওপর শোষণ-নির্যাতনের মূল উৎস সামন্ত ব্যবস্থা তথা এই ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচণ্ড সমর্থক ঃ "সম্পত্তির (ভূ-সম্পত্তির) ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের যে ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি) বর্তমানে চালু রয়েছে, কোনোক্রমেই তাকে লংঘন করা উচিত নয়।"[২২] জমিদারী-প্রথাকেই তিনি আদর্শ ভূমিব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৩] (দুই) যে নীলকর দস্যুদের অত্যাচারে বাংলাদেশের কৃষকরা সর্বস্বান্ত হোয়েছিলেন, তাঁর মতে সেই "নীলকর সাহেবরা এদেশে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই করেছে বেশি।"[২৪] (তিন) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবনের ব্যবস্থা একচেটিয়া কোরে নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে এদেশে লবন আমদানি করার যে ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই ৬ লক্ষ লবণ-কারিগর বেকার ও সর্বস্বান্ত হোয়েছিলো, তিনি ছিলেন সেই ব্যবস্থার প্রচণ্ড সমর্থক।[২৫]

এসব তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রামমোহন তার সামন্তবাদী ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী অবস্থান থেকে এদেশের সামন্তবাদী বৃটিশ-নির্ভর ভূমিব্যবস্থার এবং ব্যাপক শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক জনতার বিরুদ্ধে তাঁর শ্রেণীগত দাবি যথাযথভাবেই পালন কোরে গেছেন।

আমাদের দেশের বাঘা বাঘা পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের মতে, রামমোহন ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন! ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভূমিকা প্রতিফলিত হয়— একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এবং অন্যদিকে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে— লড়াইয়ের মাধ্যমে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যে সব জ্ঞানি ব্যক্তিরা বিদেশী উপনিবেশবাদের সহায়তায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব করবার আজগুবি তত্ত্ব হাজির করেছেন,[২৬] তাঁদের বক্তব্যের স্বরূপ আগেই উদ্‌ঘাটিত করেছি। এবার দেখা যাক, উপনিবেশবাদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করার বিপ্লবী লড়াইয়ের বাস্তব মাপকাঠিতে রামমোহনের প্রগতিশীলতা প্রমানিত হয় কিনা। (এক) রামমোহন ছিলেন, "ভারতে বৃটিশ শাসনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক।"[২৭] রামমোহনের অভিমত ছিলো এই যে, "ভারতবাসীদের পরম সৌভাগ্য যে, ভগবৎকৃপায় তারা ইংরেজদের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে।"[২৮] (দুই) রামমোহন নাকি এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবী তুলে দারুণ প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন! কিন্তু এই দাবীর পক্ষে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিলো : "প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত না হোতে পারলে অথবা তার প্রতিকার না হোলে বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সেই বিপদ নিবারণ করতে পারবে।"[২৯] অর্থাৎ, "ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা নয়, তাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কোরে তোলাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।"[৩০] (তিন) বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের দেশীয় তাঁবেদার (নিজের মতো!) গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহী। তাঁর মতে, "কৃষক ও গ্রামবাসীগণ নিতান্তই অজ্ঞ", কাজেই এদেশের অভিজাত ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের "ক্ষমতা ও গুণানুসারে উচ্চপদ দিয়ে মর্যাদা দান করলে বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের অনুরক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।"[৩১] (চার) যে রামমোহন স্পেনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হোয়ে কোলকাতার টাউন হলে ভোজ-সভা দিয়েছিলেন, ইতালীর বিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় শয্যাগ্রহণ করেছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের বিজয়ে আনন্দে আত্মহারা হোয়ে খোঁড়া পা নিয়েও ফরাসী জাহাজে ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন করতে ছুটেছিলেন— তিনিই বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে বলেছিলেন : "ইংরেজ জাতির অভিজাতশ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করলে তার ফল ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হবে"[৩২]— তিনিই এদেশে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বসবাস ও পুঁজি-বিনিয়োগের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন— তিনিই নীলকরদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় কৃষকদের গৌরবময় বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনার স্তরেই একে "সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন" আখ্যা দিয়ে বৃটিশ প্রভুদের

প্রতি গভীর প্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ওপরে পরিবেশিত তথ্যগুলি থেকে রাজা রামমোহন রায়ের কী রকম ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে? তিনি কি সামন্তবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন? না, কোনোক্রমেই না। তাহোলে তিনি বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সৃষ্ট চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি কোরতে পারতেন না, বাঙালী কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড নির্যাতন ও শোষণের সমর্থন কোরতে পারতেন না, লক্ষ লক্ষ লবন কারিগরদের পথে বসানোর একচেটিয়া ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়াতে পারতেন না। তাই তিনি কোনোক্রমেই সামন্তবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হোতে পারেন না— তাকে বরং গণ্য কোরতে হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সযত্নপালিত সামন্তবাদী শোষনব্যবস্থার সক্রিয় অংশীদার ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে, ব্যাপক ভারতীয় কৃষকজনতার শোষক ও শ্রেণী শত্রু হিসেবে।

তিনি কি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন? না, কোনোক্রমেই না। তাহোলে তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পক্ষে দাঁড়াতে পারতেন না, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষকদের বৈপ্লবিক বিদ্রোহের অঙ্কুরাবস্থাতেই তার কুৎসায় মুখর হোতে পারতেন না। তাই তিনি কোনোক্রমেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্বোধক হিসেবে গণ্য হোতে পারেন না— তাকে বরং গণ্য কোরতে হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ভারতীয় মুৎসুদ্দিদের বিশ্বস্ত প্রতিভূ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শত্রু হিসেবে।

স্বাধীনতার প্রতি তাঁর তথাকথিত অনুরাগ ছিলো মূলগতভাবে আরোপিত বাহ্যিক এবং অন্তঃসারশূন্য। সেজন্যই তিনি চরমতম দাসত্বের মনোভাব দেখিয়ে বলতে পেরেছিলেন ঃ "বিজয়ী লোকেরা যখন বিজিতদের চেয়ে বেশি সভ্য, তখন দখল করাটা (এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ) খুব কদাচিৎই খারাপ ব্যাপার— ভারতের এখনও অনেক বছর ধরে বৃটিশ আধিপত্য দরকার।" আর সেজন্যই হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র যখন সুস্পষ্ট ভাবে ভারতে বৃটিশ কলোনাইজেশনের (অর্থাৎ এদেশে অভিজাত ইংরেজদের জমি ক্রয়, বসবাস, ব্যবসা করার অধিকার দেবার নীতির) যুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ বিরোধিতা করেছিলেন, তখন রামমোহন তাদের বিরোধিতা করেছিলেন, এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরদের মতো সমগোত্রীয় জমিদার-মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে নিয়ে 'ভারতের মুক্তির জন্য' ইংরেজদের এদেশে আরও প্রত্যক্ষ শোষণের জাল বিস্তৃত করার আন্দোলন করেছিলেন। বৃটিশ সরকার স্বভাবতঃই তাঁর এই দাবী কার্যকরী করেছিলো, এবং এরই ফলে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের নিধন করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নির্মম অত্যাচারী ইংরেজরা এদেশে এসে নীল চাষের ব্যবস্থা করে এবং ব্যাপক কৃষক জনতার ওপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার করার সুযোগ পায়।[৫৪] সেই জন্যই তিনি এমন আশা পোষণ করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষিত ও অভিজাত ইংরেজদের সংশ্রবে এলে ইংরেজ সভ্যতার স্রোতে ভারতীয় জাতীয়তা মিলিয়ে যাবে। ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি এবম্বিদ বিরূপ মনোভাবের জন্য

রামমোহন-অনুরাগী বিমানবিহারী মজুমদার পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হোয়েছেন যে, 'আধুনিক ভারতের জনক' হিসেবে রামমোহনের দাবী অনেকটাই দুর্বল হোয়ে পড়ে।[৫৫] এবং এ সব থেকে একটি সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, "আজকে আমরা দেশাত্মবোধ বলতে যা বুঝি, তিনি যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বা তার প্রচার করেছেন— এমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।"[৫৬]

অথচ মজার কথা, যে সময় রামমোহন বলছেন— ভারতীয়রা স্বাধীনতা লাভের যোগ্য নয় বা তাদের স্বাধীনতার চেতনার বিকাশ ঘটেনি, ঠিক সে সময়েই ভারতের ব্যাপক কৃষক জনতা সামন্ত শোষণ তথা ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবার মহান আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালছেন, ঠিক সে সময়েই রামমোহনের আবাসস্থল কোলকাতার মাত্র ত্রিশ মাইল দূরবর্তী বারাসত ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সশস্ত্র কৃষকেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজ অঞ্চলে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার উচ্ছিষ্ট থেকে বঞ্চিত কৃষকেরা সেদিন যতোটুকু স্বাধীনতাবোধ ও বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় নিজেদের রক্তের ভাষায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন, এদেশের 'নবজাগরণ'-এর পথিকৃৎ রামমোহন তার সামান্যতম পরিচয়ও রেখে যেতে পারেন নি— অথচ আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত তত্ত্ববাগীশদের মতে রামমোহনই নাকি আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রথম প্রাণপুরুষ!

এ প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুশোভন সরকার, রবীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতরা তাঁদের উপরে উল্লেখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহে যে আজগুবি তত্ত্ব হাজির করেছেন, তারও কিছু আলোচনা করা দরকার। তাঁদের মতে, সে যুগে ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে শিল্পীয় ধনতন্ত্রের যে দ্বন্দ্ব চলছিলো, এবং যে দ্বন্দ্বে শিল্পীয় ধনতন্ত্রেরই ছিলো প্রগতিশীল ভূমিকা, তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে রামমোহন নাকি সে যুগেই বিরাট এক প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন! নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে সামান্যতম উদ্যোগও না দেখিয়ে শাসক-প্রভুদের দেশের বিতর্কে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন করাটাই যদি প্রগতিশীলতার লক্ষণ হয়, তবে আজকের যুগে ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনতারও নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ কোরে দিয়ে নিক্সন আর ম্যাক্‌গভার্ণের মধ্যে কে বেশি প্রগতিশীল— সেই বিতর্কে মত্ত হওয়া উচিত? আমরা কিন্তু মনে করি, যে কোনো পরাধীন দেশের যে কোনো প্রগতিশীল লোকের একমাত্র মূল কর্তব্য হওয়া উচিত দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করা। রামমোহন তা তো করেনই নি, উপরন্তু ব্যাপক কৃষক জনতার মুক্তি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত স্বার্থেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠি এবং দেশীয় তাঁবেদারদের পক্ষে কাজ করেছেন। কাজেই তাঁর মধ্যে প্রগতিশীলতার প্রাথমিক লক্ষণেরও প্রমাণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, সে যুগের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক কিছু আন্দোলন তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ধার-করা তথাকথিত

গণতান্ত্রিক চেতনার দৌড় ছিলো ওই পর্যন্তই, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী মূল লড়াইয়ের পক্ষে সেগুলো তো কাজ করেই নি, উপরন্তু সেই লড়াইয়ের বিরোধিতাই করেছিলো, এবং ফলতঃ কিছু বাহ্যিক সংস্কার হিসেবে সেগুলো সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই সিদ্ধ করেছিলো। এবং সাম্প্রতিককালে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, সে যুগের এ সব সংস্কারবাদী আন্দোলনে রামমোহনের যে 'অবিস্মরণীয়' ভূমিকার কথা প্রচার করা হয়, বাস্তবত তার অনেকটাই প্রচার বা মোহ মাত্র— ইংরেজী শিক্ষার বিকাশ, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, সংবাদপত্র প্রকাশ, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা থাকলেও তিনি সে ব্যাপারে 'পথিকৃৎ'-এর সম্মান দাবী করতে পারেন না।[৩] আর যে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি এতো সোচ্চার ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে পর্যন্ত তিনি তার অনেকখানিই বহন করে চলেছিলেন।

তাই, সব মিলিয়ে, রামমোহনকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বাক্‌সর্বস্ব, অন্তঃসারশূন্য ও শূন্যগর্ভ এক সুযোগ্য প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সবশেষে আবার প্রথম প্রশ্নেই ফিরে আসছি ঃ ভারতীয় শাসকশ্রেণী হঠাৎ আজ নোতুন কোরে রামমোহনকে নিয়ে এতো নাচানাচি শুরু কোরে দিলো কেন, কেনই বা তাঁর মূল্যায়নের ব্যাপারে সামান্যতম বিরোধিতা সম্পর্কেই তারা এতো স্পর্শকাতরতার পরিচয় দিলো? কারণটা বোধহয় আজকের ভারতবর্ষের বাস্তবতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকলে আবদ্ধ ভারতীয় শাসকশ্রেণী আজ উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যা বইয়ে দিয়ে ভারতীয় ট্রেডমার্কযুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সাইনবোর্ডের আড়ালে শোষণ ও নির্যাতনের ফ্যাসিবাদী কায়দাটা ভালোভাবেই রপ্ত কোরে নিয়েছে। এর স্থিতিশীলতার স্বার্থেই তাদের আজ দরকার ধর্ম-নিরপেক্ষ অখণ্ড এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মানসিকতা। অথচ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বস্তুটাই আমাদের দেশে একটা আমদানি-করা ব্যাপার, 'নেশন'-এর ধারণাটা আমাদের পূর্বতন বৃটিশ প্রভুরাই আমাদের ওপরে নিজেদের স্বার্থেই চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ দু'শো বছর ধরে মাজা-ঘষার পরেও সেই জাতীয়বাদের মানসিকতাটা যে খুব ভালোভাবে আমাদের রপ্ত হয় নি, কাশ্মীর-নাগা-মিজো প্রভৃতি জাতিসত্তার দীর্ঘদিনের ন্যায্য বিক্ষোভ থেকে শুরু কোরে সাম্প্রতিককালের তামিলনাদ-অন্ধ্র-আসাম প্রভৃতি রাজ্যের বিক্ষোভ তারই প্রমাণ বহন কোরে চলেছে। অথচ অখণ্ড জাতীয়তাবাদের মানসিকতাটা বড্ডো বেশি দরকার শাসকগোষ্ঠির, নিজেদের শোষণ ও শাসনের স্বার্থেই। তাই তারা রামমোহনের পরজীবি ও দাসত্বের মানসিকতাটাকে চেপে গিয়ে তাঁকেই এই উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জনক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এবং সার্থকভাবেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রামমোহনকে "ভারতের প্রথম বিপ্লবী" বলে অভিহিত করেছেন!

কিন্তু যে যা-ই বলুন, ফেলে-আসা অতীতকে সদা-সর্বদাই সুবর্ণমণ্ডিত বলে হাজির করার যতো চেষ্টাই কোরে চলুক প্রতিক্রিয়ার ধারক ও বাহকেরা, একথা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, শোষকশ্রেণীর স্বার্থে আমাদের দেশের গত দু'শ বছরের ইতিহাস এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকাকে বিকৃত কোরে বিভিন্ন বিষাক্ত ধারণা আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হোয়েছে, এবং হোচ্ছে, আর সে সম্পর্কে তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নের দাবী আজ একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হোয়েছে। যাঁরা ইতিহাসের সেই ভাববাদী ব্যাখ্যাকেই আঁকড়ে ধরে বাস্তব সত্যের বিকৃতি সাধনের নিত্য নোতুন ইতিহাস তৈরী কোরে চলেছেন, হাজার চেষ্টা কোরেও তাঁরা সেই শক্তির অগ্রগতি রুখতে পারবেন না। গত দশ হাজার বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাস এই শিক্ষাই দিচ্ছে।

নির্দেশিকা

১। 'On Rammohan Roy'—Ramesh Chandra Majumdar (The Asiatic Society. 1972)
২। 'রামমোহন দাহ'— হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ('দেশ' পত্রিকা ঃ ৬.১.৭৩)
৩। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা থেকে 'A History of Indian Journalism' (By Mohit Maitra) গ্রন্থে উদ্ধৃত।
৪। 'Notes on the Bengali Rennaissance'—Amit Sen (ওরফে সুশোভন সরকার)
৫। 'রামমোহন রায় : কয়েকটি প্রসঙ্গ'— রবীন্দ্র গুপ্ত ('নন্দন' : বৈশাখ, ১৩৭৯ : পৃষ্ঠা ২৪)
৬। 'ভারতে বৃটিশ শাসন'— কার্ল মার্কস্ ('ঔপনিবেশিকতা প্রসংগে', মস্কো, পৃ: ৪৩)
৭। ঐ—পৃ: ৩৭
৮। 'বাংলার রেনেশাঁ : পটভূমি ও চরিত্র'— আবুল ফজল মির্জা ('অনীক', আগষ্ট, ১৯৭২)
৯। 'The East India Company and the Economy of Bengal'—Sukumar Bhattacharya (P. 17)
১০। আবুল ফজল মির্জা—ঐ
১১। ঐ
১২। 'Rise and fall of the East India Company'—Ramkrishna Mukherjee (P. 238)
১৩। ভাইসরয়কে লেখা ভারত-সচিবের চিঠি : ৯ই জুলাই, ১৮৬২
১৪। 'A critique of Bengal Rennaissance—Benoy Ghosh ('Frontier' : Autumn Number, 1971)
১৫। আবুল ফজল মির্জা—ঐ
১৬। 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'— সুপ্রকাশ রায় (পৃ: ১৮৪)
১৭। Census Report— Govt. of India (Vol. vi. Part 1.A, P. 437)
১৮। Benoy Ghose—ঐ
১৯। Calcutta Review (vol. IV, no. VIII : P. 364)
২০। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ— ড: সুশীল কুমার গুপ্ত (পৃ: ৪৯)
২১। 'Ramesh Chandra Majumdar—ঐ (পৃ: ৪২)
২২। Rammohan's Works (P. 413)

২৩। 'Revenue System of India' : Rammohan Roy : Works : (P. 289)
২৪। Parliamentary Papers (Vol. 45, P. 27)
২৫। 'Midnapore Salt Papers'—N. K. Sinha (P, 146)
২৬। 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন'— সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃ: ১৪)
২৭। 'History of Political Thought'—Biman Behari Majumdar (1934 Edn, P. 47)
২৮। Rammohan's Works (P. 442)
২৯। ঐ (P. 457)
৩০। Biman Behari Majumdar—ঐ (P. 65)
৩১। Rammohan's Works (P. 300)
৩২। Rammohan's Memorandum to Parlimentary Select Committee.
৩৩। Rennaissance in Bengal— Arabinda Podder (P. 61-62).
৩৪। Development of Capitalist Enterprise in India— Buchanan (P. 36-37)
৩৫। Biman Behari Majumdar—ঐ (1967 Edn, P. 46).
৩৬। Ramesh Chandra Majumdar—ঐ (P. 48)
৩৭। ঐ (P. 39-49)

অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

আমার পায়ের তলায় রক্ত

অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

দোহাই তোমাদের
আমাকে আর ভয়ের গান শুনিও না
আমার পায়ের তলায় রক্ত— আমার বন্ধুর, আমার সাথীর।
কবিতা লিখতে বসে
আমি ভাবছি সেই মুখচোরা ভীরু ছেলেটার কথা
যাকে এক সময় ভয় পাইয়ে আনন্দ
বোকা বানিয়ে ছিল সুখ।
অথচ আজ
ভয় পাওয়া সেই ছেলেটাই
প্রকৃত ভয়ের সময় ঝরাপাতার মত ভয়কে উড়িয়ে
রাইফেলের সামনে আশ্চর্য ধীর-স্থির।
দোহাই তোমাদের
আমাকে বোলোনা চোখ বুজে থাকতে
দোহাই তোমাদের
আমাকে বোলোনা সুন্দর ফুলের নাম
আমি কী কোরে ভুলবো সেই সব নৃশংস ঘটনা?
এই সেদিনও জেলে
এদেশের মহান গণতান্ত্রিক জেলে
আমার সাথীকে খুন করেছে ওরা
খুন করেছে চোরের মতো
যখন থম্‌থমে অন্ধকারে সারা পৃথিবী ঢাকা।
তখন তোমরা কোন্ সুরে কথা বলতে বলো?
ওরা আমার সাথীকে মাটিতে শুইয়ে শান্তির কথা বলে
ওরা আমার বোনের গায়ে পাশবিক হাত তোলে
আমার ভাইয়ের বুকে দগ্‌দগে বুলেটের ক্ষত
আমার পায়ের তলায় রক্ত— আমার বন্ধুর, আমার সাথীর।

ওরা আমার গলা থেকে স্বর কেড়ে নিতে চায়
পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে
আমার সুন্দর স্বপ্নকে
আমার অদম্য আশাকে
পৃথিবীর বুকে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা আমার ভালোবাসাকে
ওরা স্তব্ধ করতে চায়।

মানুষের বুক তবু ফুলে ওঠে
পৃথিবী গরাদ ভেঙে
গলিত লাভার মতো ছুটে যায়
স্বর্গে আগুন লাগে
জ্বলে ওঠে ইন্দ্রের প্রাসাদ।

হে মহান বর্তমান দুনিয়া-নায়ক,
মৃত্যুর আগে সাধের পৃথিবীটাকে শেষবার দেখে নাও
শেষবার দেখে নাও নিজেদের বিকলাঙ্গ রূপ,
আমি দেখতে পাচ্ছি
তোমাদের বিশ্বকর্মার হাত থেকে
ছেনি হাতুড়ি কেড়ে
শোষিত মানুষ আঁকছে
এক নোতুন পৃথিবীর নাক, চোখ মুখ।।

অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

চোখ দুটো জ্বল জ্বল কোরে জ্বালিয়ে রাখ

সমীর রায়

সূর্যকে ছুঁতে গিয়ে হাত পুড়ে গেছে বলে কাঁদিস না মন
তোর আগে অনেক বাঁশের কেল্লা পুড়ে গেছে
তুই তোর ছেলের মতো বুকটাকে আগলে রাখ্

অশোক স্তম্ভের সিংহগুলো শুধু পাথরের
চোখের কোটরে ওর থাবা পৌছোবে না
হেতাল গরান শাল আম জাম পিয়ালের বনে তোর
চোখ দুটো অক্ষত রাখ্।

কালের পায়ের কাছে ধান দুর্বা দিয়ে
রাধা নামে কোনো প্রেমিকাই বুঝি
চোখ ভিক্ষা চেয়েছিলো :
"সব অঙ্গ খেও রে কাল, আঁখি বাকি রেখো গো,
কৃষ্ণ দরশন লাগি আঁখি বাকি রেখো গো।"

পঞ্চাশ কোটির জন্য
ভিক্ষা নয়
চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্বলিয়ে রাখ্।।

অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

আজ থেকে দু'বছর আগে এই মার্চ মাসেই বিপ্লবী নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমরা প্রকাশ করছি। এই রচনায় বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন, আমাদের মতে, আজ এই মুহূর্তে সেই আহ্বানকে কার্যকর করাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার প্রকৃত পথ। —সম্পাদক

বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীর দায়িত্ব

সুশীতল রায়চৌধুরী

বিশ্বজগত নিত্যপরিবর্তনশীল। বিশ্বজগতের অংশ ও অন্তর্গত মানুষের সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল। মহান কার্ল মার্কস বলেছিলেন— "মানুষ প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে, প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে, এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজ প্রকৃতিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে।"

এইভাবে মানুষ নিজেই ইতিহাসের স্রষ্টা। কিন্তু ইতিহাস-স্রষ্টা মানুষ কোনো একক ব্যক্তি-মানুষ নয়। এক সময় এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল যে, ইতিহাসের চালিকাশক্তি কোনো মহামানব কিংবা মহাপুরুষ, যুগে যুগে এই বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তিনি নিজ অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে ব্যাপক মানুষের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করেন। আবার এরকম তত্ত্বও চালু ছিল যে, ইতিহাস হচ্ছে রাজা-রাজড়াদের সৃষ্টি।

ইতিহাস সম্পর্কে এই সমস্ত ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের শ্রেণী-স্বার্থ-প্রণোদিত উৎস উদ্‌ঘাটিত কোরে দিয়ে কার্ল মার্কসই ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা সাধারণ গণমানবকে নতুন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দেন যে, মানুষ তার চাহিদা খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যই আদান প্রদানের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কের ভিত্তিতে এক সময় মানুষের সমাজ পরিণত হয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে। সেই থেকে ইতিহাস হয়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস— শোষিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-মানুষ এবং শোষক মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবানদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। এই শ্রেণী-সংগ্রামের ধারায় শোষিত গণমানুষদের ঘটে বিপ্লবী অভ্যুত্থান।

কিন্তু সার্থক গণবিপ্লবের জন্য দরকার বিপ্লবী গণ মানস। বিপ্লবী ভাবাদর্শের আলোয় আলোকিত হলেই এ বিপ্লবী গণমানস গড়ে ওঠা সম্ভব। তাই জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে বিপ্লবী ভাবাদর্শের দীপ প্রজ্জ্বলিত করার জন্য বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কাজকর্ম

একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। শিল্পকলাদির সুনিপুণ আবেদন মানুষের হৃদয়ে এমন একটি রস জাগিয়ে তোলে— যার ফলে যা আদতে আছে বাইরে, অতি সহজে তাকে কোরে তোলে মনের জিনিষ।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মের শিল্পকলায় এই গুণ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকার জন্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণী গড়ে তোলে নিজেদের বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মী। গণমানসে নানা ধরণের ভুল ধারণার সঞ্চার কোরে, নানা ধরণের পিছিয়ে পড়া ধ্যান-ধারণা বাঁচিয়ে রেখে জনগণের বৈপ্লবিক সৃজনশক্তিকে পঙ্গু কোরে রাখাই এই সব সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মেই সৃষ্টি হয় প্রগতিশীল গণ-সাংস্কৃতিক কর্মীদের। গণ-বিপ্লবী বন্যার— যে বন্যারই কেবল ক্ষমতা থাকে পুরোনো সব জঞ্জাল নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার— সেই বন্যার আগমনের পথ প্রশস্ত করার পক্ষে ভাবাদর্শগতভাবে গণমানস ক্ষেত্র তৈরী করতে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা অসীম। বিপ্লবের সময়ে সাধারণ বিপ্লবী ফ্রন্টের মধ্যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের জন্য সংগ্রাম হয়ে ওঠে অত্যাবশ্যক।

আজ আমাদের দেশে হিমালয়ের উপত্যকায় বীর কৃষক নরনারীর সংগ্রাম ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রদূত। এই অগ্রদূতের আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত সমস্ত ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও তাদের সাংস্কৃতিক কর্মীর দল এই কৃষক সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্যকে ঢেকে রাখতে নানা কুৎসা, নানা বিভ্রান্তি নানা সংশয় ছড়াতে মত্ত হয়ে উঠেছে। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কাজকর্মের কষ্টিপাথর। ইতিহাসের নিয়মেই প্রকৃত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে নতুন কর্মতৎপরতা। দল চিনে নিতে তাঁরা ভুল করছেন না। কিন্তু বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে দুর্বার করার জন্য হিমালয়ের কোল থেকে সারা দেশে কৃষক সংগ্রামের বিপ্লবী প্লাবনের পথ মুক্ত করার জন্য দরকার আরও সমবেত আরও সমষ্টিগত প্রয়াস। সেজন্যই বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহান নেতা ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মী-শ্রেষ্ঠ মাও সেতুং এর বাণীকে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মূল মন্ত্র কোরে তুলতে হবে : রাজনীতিকে নিজের উপর সার্বভৌম কর্ত্তৃত্ব দাও, কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা নির্ভুল— তার মধ্যে তারতম্য কর এবং এই কাজে সাফল্যের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যাও, তাদের সংগ্রামে একাত্ম হয়ে যাও।

জনগণের সকল ক্ষেত্রের কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও নিজ নিজ কর্মসাধনাকে অপরের সাথে সম্মিলিত কোরে দুর্বার গণবিপ্লবী সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তুলবার দিকে এগিয়ে যাবার কথা ভাবতে হবে। ইতিহাসের এই দায়িত্ব বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের অতি অবশ্য নিজ হস্তে গ্রহণ করতে হবে।

'হিন্দোল' সাহিত্য-সংকলন (কার্তিক : ১৩৭৬) থেকে গৃহীত

অনীক, মার্চ, ১৯৭৩

পৃথিবীর বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক' দেশ ভারতবর্ষে, বিশেষ কোরে পশ্চিমবংগে, জেলের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর যে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চলছে, সেকথা সর্বজনবিদিত। আমরা সম্প্রতি জেলের ভেতর থেকে জনৈক বিপ্লবী কর্মীর একটি চিঠি পেয়েছি। জেলের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ছবি এতে পাওয়া যাবে। চিঠিটি আমরা প্রকাশ করছি।

জেলের চিঠি

প্রিয় সম্পাদক,

বর্তমান জনগণ-বিরোধী সরকারের দমন-পীড়ন নীতির শিকার হয়ে জেলের মধ্যে বন্দীদশায় জীবনযাপন করছি আমরা কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী। অধিকাংশই বিচারাধীন, বিনা বিচারে কিংবা বিচারের প্রহসনের দণ্ডে দণ্ডিত। কী প্রচণ্ড মানসিক ও দুঃসহ শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, সেটা জেলের বাইরে থেকে কল্পনাও করা যায় না। প্রতিটি সাধারণ মানুষই বন্দীদের সম্পর্কে জানতে চান, তাই আমাদের বন্দীজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি।

আমরা যারা জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী আছি, তারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আছে কেবল চিঠিপত্র। আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কেউই বন্দীদের সংগে দেখা করতে পারবে না— এটাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও দেখা করার অধিকার পাবেন না। বাইরের চিঠিপত্র ঠিকভাবে এসে পৌছোয় না, আর এখান থেকেও চিঠি যায় না ঠিকমতো। কারণ, যদি কেউ "আমি ভালো আছি" ছাড়া চিঠিতে অন্য কিছু লেখে, তবে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সে চিঠি গন্তব্যস্থলে কোনোদিন পৌছুতে পারবে না।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বিতীয় মাধ্যম খবরের কাগজ বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকা। কিন্তু বামপন্থী গন্ধ বা সরকারের বিরোধিতার সামান্যতম চিহ্ন পেলেই সে ধরণের কাগজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা পড়ার অধিকারই আমাদের নেই। আর খাবার দাবার? এতো অখাদ্য খাবার যে মানুষকে খেতে দেওয়া যায়, তা আমাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু কোনোরকমে জীবনধারনের জন্য সেসব পশুর খাবারই আমাদের খেতে হয়, তাও আধপেটা। এর ফলে অধিকাংশ বন্দীই

ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং তিলে তিলে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু অসুখ হলেও চিকিৎসার সুযোগ নেই। জেলের অলিখিত জংলী আইন অনুসারে, "নকশালদের কোনোরকম চিকিৎসা করা চলবে না।" ডাক্তার আছে, কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব সত্ত্বা নেই, জেলারের হুকুম ছাড়া এক পা-ও তারা চলতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরে এব্যাপারে অনেক অনুরোধ-উপরোধ বা চীৎকার-চেঁচামেচি করেও কোনো লাভ হয়নি, এই মানুষখেকো সরকার ভ্রূক্ষেপমাত্র করেনি।

শুনেছি, যুদ্ধে বন্দী শত্রুসৈন্যদের ক্ষেত্রেও জেনেভা চুক্তি অনুসারে ন্যূনতম একটা রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের মতো রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে এই বর্বর সরকার সামান্যতম রীতিনীতিরও কোনো ধার ধারে না। অথচ এরাই আবার নিজেদেরকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে জাহির করে! নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত!

একবার কল্পনা করতে পারেন, এই দমদম জেলেই প্রায় চারশোর মতো (C.P.I.-ML) কর্মী আছেন, যাদেরকে চব্বিশ ঘন্টা ছোট্টো সেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়, এমনকি সামনের বারান্দায় পায়চারি করার অনুমতি পর্যন্ত তাদের নেই। আমাদের বাঁচবার অধিকারটাও এই রক্তচোষা সরকার স্বীকার করে না। কোনো কোনো সেলে বিপ্লবী গান গাইতে পর্যন্ত দেয় না। এমনকি রাজনৈতিক আলোচনার অধিকারও নেই। এসবের জন্য সরকারী ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী হাতের ডাণ্ডা ও রক্তচক্ষু আমাদের ওপর প্রায়ই বর্ষিত হয়। এসব উপেক্ষা করেই আমরা আমাদের বিপ্লবী মতামত প্রচার করছি, এবং করবো। হাজার অত্যাচারেও আমাদের মনোবল ওরা ভাঙতে পারবে না। কোটি কোটি মেহনতী জনতা আর আপনারাই আমাদের সহায় সম্বল— সব কিছু।

জেলের মধ্যে খাতাপত্র আনতে দেওয়া হয়, কিন্তু তাতেও পরিষ্কার লেখা থাকে : "No political matter is to be written." তার ওপর আবার আছে সার্চ! এই সার্চের নামে এদের ভাড়াটে বাহিনী যখন-তখন এসে ঘরে ঢোকে, ঘরে সমস্ত জিনিষ লণ্ডভণ্ড করে। কোনো রাজনৈতিক কাগজপত্র পেলেই নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। এটাই বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্রের নমুনা! প্রতিবাদ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। আর প্রতিবাদ করবোই বা কার কাছে? এদের চোখে আমরা তো সমাজ-বিরোধী! অর্থাৎ আমরা নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থে জনগণের ওপর অত্যাচার করেছি!

এতো সব সত্ত্বেও আমাদের বিপ্লবী দৃঢ়তা তারা নষ্ট করতে পারে নি, কোনোদিন পারবেও না। এই দৃপ্ত ঘোষণাই আমরা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে বাইরের জনতাকে, এদেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতাকে, জানিয়ে দিতে চাই। দমনপীড়ন বা অত্যাচার করেও এই খুনী সরকার আমাদেরকে বিপ্লবের পথ থেকে, আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, আমাদের বিপ্লবী চেতনাকে ধ্বংস করতে পারবে না। যতোদিন আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততোদিন এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আমরা চালিয়ে যাবোই। আপনাদের কাছে এবং আপনাদের মাধ্যমে এদেশের সংগ্রামী জনতার

কাছে আমরা এই বিপ্লবী লড়াইয়ে সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমরা জানি, সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ এই সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবেন, এই মানুষখেকো ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দিয়ে সুখী সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা, মেহনতী মানুষের বাঁচার সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলবেনই। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই আমাদের জোগাবে প্রচণ্ড উৎসাহ। এবং আমরাও দৃঢ়-পদক্ষেপে এগিয়ে যাবো আমাদের বিপ্লবী লক্ষ্যের দিকে।

সবশেষে একটা কথা না বললে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হলো এই যে, আমাদের set back-এর সুযোগ নিয়ে এই হিংস্র ও বর্বর সরকার মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়ে আমাদের কর্মীদের মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেবার চক্রান্ত করছে। মাত্র কিছুদিন আগে কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তি দেবার অধিকার কোন্ লজ্জায় তারা দাবী করে? এই খুনিরাই তো ফ্যাসিষ্ট কায়দায় গণহত্যা চালিয়েছে বরানগরে, কাশীপুরে, বারাসতে, হাওড়ায় এবং আরো অসংখ্য জায়গায়। কোটি কোটি মেহনতী জনতার নির্মম আঘাতে এই মানুষখেকো রাষ্ট্রব্যবস্থাটা চুরমার হয়ে যাবেই, এই সুনিশ্চিত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই বর্তমান দুঃসহ যন্ত্রণার মোকাবিলা আমরা করে যাচ্ছি।

অভিনন্দনসহ—

দমদম জেলের জনৈক রাজনৈতিক বন্দী

অনীক, মার্চ ১৯৭৩

পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর ক্রমাগত নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতায় রাজনৈতিক বন্দীদের মা, বোন, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়ারা পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। আমরা এই স্মারকপত্রটি নীচে প্রকাশ করছি, এবং এই উদ্যোগের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছি।

জেলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

আমরা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে আটক রাজবন্দীদের মা, বোন, স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা আমাদের এক গভীর বেদনার কথা জানানো ও তার প্রতিবিধানের জন্য আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আশা করি রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে আপনি আমাদের আবেদন শুনবেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

আমাদের সন্তান, ভাই বা স্বামীরা দীর্ঘদিন ধরে কারারুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। অন্য অনেককে বিনা বিচারে (MISA ইত্যাদিতে) আটকে রাখা হয়েছে এবং বাকী অপর অংশকে দীর্ঘমেয়াদী ও কঠোর সাজা দেওয়া হচ্ছে।

সকলেই জানেন এবং আমাদের বিশ্বাস আপনি নিজেও তা স্বীকার করবেন যে, আমাদের নিকটতম আত্মীয় এইসব বন্দীদের কোন কার্যকলাপই কোন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই যে ভয়াবহ দুঃখকষ্টের মধ্যে আছেন বলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা সবসময়েই উল্লেখ করে থাকেন, সেই দুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্যেই তাঁরা, তাঁদের মতো চেষ্টা করেছিলেন। এই আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে যে যে পথ নিয়েছিলেন, সেসবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলার জন্যে আমরা আসিনি। সে বিচার দেশের মানুষ করবেন। কিন্তু কোন সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি কেউ আইনের সীমা লঙ্ঘনও করে, তবে গ্রেপ্তারের পরে তার রাজবন্দী হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাবার যে অধিকার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আছে এবং সে অধিকার বৃটিশ শাসকরাও তাদের সময় মেনে নিয়েছিল, আমাদের প্রিয়জনেরা সেই অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হবেন, সেই প্রশ্নই বিনীতভাবে আপনার কাছে করতে চাই।

রাজবন্দী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরের কথা, নিরস্ত্র ও অসহায় এইসব বন্দীদের

উপর যে অত্যাচার পুলিশ হাজত থেকে শুরু করে জেলে পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলেছে তা কোন নিকৃষ্ট সাধারণ অপরাধীর সাথেও করা সম্পূর্ণ অমানবিক। আমাদের পরম স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র এইসব বন্দীদের সাথে জেলে দেখা করার সময় তাদের সমস্ত শরীরে এঁকে দেওয়া এইসব অত্যাচারের চিহ্নগুলি আমাদের উন্মাদ করে তোলে। প্রতিদিন এক শ্বাসরোধী আশংকা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করি যে কখন মেদিনীপুর, বহরমপুর, আলীপুর ইত্যাদি জেলগুলির বন্দীহত্যার মত আরেকটি গণহত্যার শিকার হবেন আমাদের প্রাণের প্রিয় এই সব মানুষেরা।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় নাগরিক হিসেবেই আমাদের বিনীত প্রশ্ন : নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের উপর এইরকম নিপীড়ন কি ভারতীয় আইন অনুযায়ীই সম্পূর্ণ বেআইনী নয়? তবে কেন দোষী ব্যক্তিদের মহমান্য সরকার আদালতে অভিযুক্ত করছেন না?

এমনকি এসব বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বন্দীদের মা-বোনদের পর্যন্ত অকথ্য অপমান সইতে হয়েছে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন : সন্তান বা ভাইয়ের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার অধিকার কি এদেশের মা-বোনেদের নেই?

অকথ্য অত্যাচার, প্রতিমুহূর্তে পাশবিকভাবে প্রহৃত হবার আশংকা এবং সর্বোপরি ভয়াবহরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এই সব মিলে আমাদের প্রিয়জনদের অনেকেই পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। আস্তে আস্তে এদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। এই অবস্থা বেশীদিন চললে এদের এক বিরাট অংশ যে চিরকালের মত সমস্ত কর্মক্ষমতা হারাবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এই অবস্থায় পশ্চিমবাংলার সমস্ত রাজবন্দীদের মা, বোন, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়াদের তরফ থেকে আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা যে : সরকার (১) রাজনৈতিক কারণে আটক সমস্ত বন্দীদেরকে রাজবন্দী হিসেবে ঘোষণা করুন। (২) রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ও দণ্ড প্রত্যাহার করে নিয়ে বিনা সর্তে সবাইকে মুক্তি দিন। (৩) রাজবন্দীদের দৈহিক নির্যাতন বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করুন।

আমরা আশা করি, আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনাগুলি পূরণ করে আপনি এবং আপনার সরকার হাজার হাজার রাজবন্দীর আত্মীয়-বন্ধুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন ও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

ইতি—

পশ্চিমবাংলার রাজবন্দীদের
মা, বোন, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়ারা
কলিকাতা : ১২.২.৭৩

অনীক, মার্চ, ১৯৭৩

ইন্দিরাজীর মহা বাণী : "বিপ্লবী ছিলাম, বিপ্লবী আছি"

অশোক রায়

আমাদের জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক মুক্তিসূর্য ইন্দিরাজীর প্রখর বিপ্লবী কিরণসম্পাতে গত ৭ই মার্চ দিল্লীর মহিলা কলেজ মিরাণ্ডা হাউস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মিরাণ্ডা হাউস এদেশের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও চালিয়াতির সবচেয়ে প্রখ্যাত ঘাঁটিগুলির অন্যতম, এবং এখানে ইন্দিরাজীর উপস্থিতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল বলতে হবে। কারণ দুষ্ট লোকেরা বলে, ঠিক এই জাতীয় শিক্ষায়তন ও সংস্কৃতি ভবনেই নাকি ইন্দিরাজী শিক্ষা লাভ এবং জীবন সম্পর্কীয় ভাবধারা আহরণ করেন। যাই হোক, ঐ কলেজের অতি আধুনিক অর্থাৎ পাশ্চাত্যভাবাবপন্ন ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের অন্তরে পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তিনি যে বিদ্যুৎবাণীটি ব্যক্ত করেন, তার মূল কথাটি ছিল : "আমি বিপ্লবী ছিলাম, এবং এখনও আমি বিপ্লবী আছি।"

ইন্দিরাজী যখন বলছেন, তিনি একজন জ্বলন্ত এবং জীবন্ত বিপ্লবী, তখন তা নিশ্চয়ই ঠিক— কারণ তিনি মুক্তিসূর্য, এবং এই জাতীয় মুক্তিসূর্যরা কখনোই বাজে কথা বলতে পারেন না। এখন আমাদের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবেদের শুধু খুঁজে বার করা প্রয়োজন, ঠিক কোন্ কোন্ মহৎ ক্ষেত্রে এবং কী কী বিচিত্র কায়দায় ইন্দিরাজীর এই নিজের সার্টিফিকেট-দেওয়া বিপ্লবী চরিত্র তার অম্লান মহিমা ব্যক্ত করেছে।

আশৈশব খাস বিলাতে লেখাপড়া শেখা বিলাতী সংস্কৃতি ও ভাবধারায় চির নিমজ্জিত মহান জাতীয় নেতা জওহরলাল নেহরু সাহেব প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার বাবদ তিনটি কচি রামপাখী ও এক বোতল উচ্চ শ্রেণীর বিলাতী মদ গ্রহণ না করলে সুস্থ থাকতে পারতেন না। আমাদের মুক্তিসূর্য ইন্দিরাজীও ঐ একই ধরণের ভেলভেট-মোড়া জীবনযাত্রার শরিক। দেশের অগণ্য মানুষের দারিদ্র্য ও সর্বাঙ্গীন গ্লানিময় জীবনের মধ্যে যিনি চরম বিলাসিতার অম্লান ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে নির্বিকার চিত্তে দিন যাপন করতে পারেন, তাঁকে তো বিপ্লবী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই হবে।

যিনি দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখে বিগলিত হয়ে গরীবী হঠাবার মহান দায়িত্বে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন, এবং তাদের ওপর প্রতিদিন দারিদ্র্যের কঠিনতর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের সারাক্ষণই উপদেশ দেন আরো বেশী ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে, এবং নিজে

নিরবচ্ছিন্ন বিলাসিতার জীবন যাপন করেন তিনি যে একজন যথার্থ বিপ্লবী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে কি? ইন্দিরাজী সেদিন মিরাণ্ডা হাউসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতারও জয়গান করেন। কথাটির তাৎপর্য বড় চমৎকার। কারণ এই ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে চালিত শাসনব্যবস্থাতেই এই দেশের শত শত বাপ-মায়ের শত শত তরুণ সন্তানকে ইন্দিরাজীর জাতীয় পুলিশ আদালতে হাজির করার কোনো চেষ্টা না কোরে পথে ঘাটে গুলি কোরে হত্যা করে। এই ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী ইন্দিরাজীর রাজত্বেই হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বিনাবিচারে বছরের পর বছর বন্দী কোরে রাখা হয়েছে। এই ধরণের পর্বতপ্রমাণ মহত্ব ও কৃতিত্ব যাঁর স্বভাবসিদ্ধ, তিনি যে একজন যথার্থ বিপ্লবী, সে বিষয়ে সন্দেহ কী? যাঁর রাজত্বে প্রতিদিন ধনীর ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ঘটছে, এবং যাঁর গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের স্নেহে পক্ষপুটে রক্তচোষা বাদুড়েরা ৩০০০ কোটি কালো টাকা নিয়ে খেলা কোরে বেড়াচ্ছে, তিনি যে একজন মারাত্মক বিপ্লবী, তাতে সন্দেহ কী?

যিনি দেশকে আন্তর্জাতিক শোষকচক্রের হাতে বিকিয়ে রেখে সারাক্ষণই আত্মনির্ভরতার কথা বলেন, যিনি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে দেশের ৯০০০ কোটি টাকা ঋণ থাকা সত্বেও তাদের কাছে সারাক্ষণই ভিক্ষা কোরে বেড়াচ্ছেন এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কথা বলছেন, তাঁর মত মহান নেত্রী যদি বিপ্লবী না হন তো বিপ্লবী কে?

যিনি নিজে প্রতিবেশীর ওপর সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আক্রমণের দায়িত্ব প্রতিবেশীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেন, যিনি প্রতিবেশীকে পরিত্রাণের ছল কোরে তার আকণ্ঠ রক্ত শোষণে লিপ্ত তাঁর মত বিপ্লবী আর কোথায় পাওয়া যাবে?

নিজের দেশে যিনি বিনা বিচারে আটক ও বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার আইন অবাধে চালু রেখেছেন এবং দেশের কারাগারগুলির অভ্যন্তরে যিনি এই দেশেরই হাজার হাজার তরুণ রাজনৈতিক বন্দীর ওপর এক অমানুষিক, পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার পাকা বন্দোবস্ত কোরে রেখেছেন, তিনি যে একজন মহান দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রবাদী ও সমাজবাদী বিপ্লবী, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কী?

সুতরাং ইন্দিরাজী যে বিপ্লবী আছেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি কি আগেও এই রকমই সাংঘাতিক বিপ্লবী ছিলেন? দেখা যাক্।

১৯৫৯ সালে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ অর্থবহ ঘটনা ঘটে। ঐ বছর ভারতের ইতিহাসে প্রথম কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হয় কেরালা রাজ্যে। কংগ্রেস পরিচালিত দক্ষিণপন্থী রক্তশোষকরা তা সহ্য করতে না পেরে ঐ রাজ্যে এক কুৎসিততম ব্যাপক গুণ্ডামী ও সন্ত্রাসের ঢেউ তুলে ঐ কমিউনিষ্ট সরকারকে অক্ষম প্রতিপন্ন কোরে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিতা জওহরলাল এবং কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন কন্যা ইন্দিরা, যাঁর নেতৃত্বে ঐ অপূর্ব মহাত্মপূর্ণ কাজটি

অতুলনীয় ধূর্ততার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে সেদিন থেকেই বিদেশী ও দেশী শোষকদের সবচেয়ে চতুর ও অগ্রবর্তী অংশ ইন্দিরাজীকে দেখে শুনে সযত্নে বেছে রেখেছিল, গভীরতর সংকটের দিনে এই দেশের শাসন ও শোষণের মহান কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্যে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইন্দিরাজী যে আজ বলে নয়, আগেও বিপ্লবী ছিলেন, একথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পরিশেষে ফিরিঙ্গিনী ভবনে উচ্চারিত মুক্তিসূর্যের আর একটি বাণীর কথা উল্লেখ কোরলে তাঁর বিপ্লবী সত্তার পরিচয়টি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যাবে। ইন্দিরাজী বলেন, গান্ধীজীও বিপ্লবী ছিলেন, তাঁকেও বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয়েছিল। বড় খাঁটি কথা। মোহনদাস গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর দায়িত্ব যে মূলতঃ একই প্রকৃতির, তা কি আর বলতে হবে? গান্ধীজীর দায়িত্ব ছিল তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন বৃটিশ-পদলেহী জমিদার ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের হাতে থাকে; কোনো মতেই যেন সে আন্দোলনের নেতৃত্ব শোষিত জনগণের হাতে গিয়ে না পড়ে, কোনমতেই যেন সে আন্দোলন চীনের আন্দোলনের মত একাধারে প্রকৃত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সর্বহারার মুক্তি-আন্দোলনে পরিণত না হয়। তাই ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সামান্য ঘটনাতে পর্যন্ত অহিংসামন্ত্রের পূজারী গান্ধীজী খেঁকি কুকুরের মত চীৎকার কোরে উঠেছিলেন। তাই তিনি এদেশের ভ্রান্ত মহান আত্মত্যাগী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের তীব্র নিন্দা করেন— পাছে কোনোভাবে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে উঠে বৃটিশ প্রভুদের প্রভুত্বকে খর্ব করে।

গান্ধীজীর সুযোগ্য শিষ্য জওহরলালজীও ঐ একই দায়িত্ব পালন করেছেন গভীরভাবে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতার বনিয়াদ, তিনিই সযত্নে রচনা করেন। কমিউনিষ্ট চীনের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে তিনিই ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে দেশকে মার্কিন ডলার ও রাজনীতির কাছে বিকিয়ে দেন।

ইন্দিরাজী বলছেন, তিনি গান্ধীজী ও নেহরুজীর মতই বিপ্লবী। আমরা সর্বান্তঃকরণে এ বক্তব্য সমর্থন করি। বিপ্লবের লাইন একদম ঠিক আছে, কোথাও কোনো ছেদ নেই। এই বিপ্লবের মূলনীতি হচ্ছে— একের পর এক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দাসবৃত্তি কোরে দেশের সম্পদ ও দেশের মানুষের শ্রমশক্তিকে লুট কোরে ক্রমশঃই বেশী বড়লোক হওয়া। তবে আমাদের মনে হয়, বিপ্লবী হিসেবে হিটলার যেমন কাইজারের চেয়ে এবং নিক্সন যেমন জন্‌সনের চেয়ে আরো বড়, ইন্দিরাজীও তেমনি তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়েও উচ্চতর বিপ্লবী চেতনায় পৌঁছেছেন। তাঁর দুটি মহান অবদান : (১) লুটের বাজারে "সমাজবাদী" শ্লোগান চালু করা, এবং (২) সমাজতন্ত্রের ভেকধারী রাশিয়ার শাসকচক্রের চতুর নয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপটিকে চিনে নিয়ে তার হাতে দেশের ভাগ্যকে নতুন কোরে সঁপে দেওয়ার চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া প্রখর দিনের আলোয় এত অজস্র অসত্য কথা এত জোর গলায় একটানা বলে যাওয়া— এও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

কাজেই ইন্দিরাজী যে একটি উচ্চশ্রেণীর বিপ্লবী মুক্তিসূর্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসুবিধে শুধু একটাই। চিয়াং কাইশেক, থিউ লন্ নল, ইন্দিরা প্রভৃতি যে সব ফরমাইসী মুক্তিসূর্য দেশীয় টিনের চাকতির ওপর বিলিতী পালিশ লাগিয়ে তেরী হয়, তাদের জৌলুস মোটেই বেশীদিন টেকেনা। বেশী রকম ঝড়বৃষ্টি হলেই পালিশ উঠে গিয়ে ভেতরের মরচে ও ছ্যাঁদা বেরিয়ে পড়ে। তাইতো একদা দীপ্তিমান চিয়াং কাইশেক আজ দাঁত ছরকুটে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন। তাই তো সেদিনের স্প্রিং-লাগানো থিউ সাহেব আজ পেট টিপে ধরে ক্রমাগত চাপা আর্তনাদ কোরে যাচ্ছেন। আজকাল আবার ঝড়বৃষ্টি বড় বেশী হচ্ছে, কখন কোথায় প্রলয় কাণ্ড সুরু হয় তার ঠিক নেই। এই দুর্যোগ থেকে অবশিষ্ট মুক্তিসূর্যদের রক্ষা করবে কে? অবশ্য মস্কো-ওয়াশিংটন-টোকিওয় নিশ্চয়ই নতুন নতুন আবহওয়া-নিরোধক-পালিশ তৈরীর কাজ পুরোদমে চলছে। কিন্তু পালিশ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কতো আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তিসূর্যদের দীপ্তিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? মুক্তিসূর্যদের চরম অগ্নি-পরীক্ষার দিন কি খুব শিগগিরই এগিয়ে আসছে না?

অনীক, এপ্রিল, ১৯৭৩

এবার তুমি যুবক হও

সমীর রায়

চণ্ড্‌মণ্ডে কিশোরবেলা শেষ হয়ে গেছে
বাহাত্তরের কোলকাতা এবার তুমি যুবক হও

ফোর্টের সেপাইদের দশাসই বুটগুলো
বন্ধুদের সাথীদের রক্তে জব্‌ জব্‌
বেলেঘাটা লেকের পাশে কমরেডের শব
কথা বলে :
চণ্ড্‌মণ্ডে কিশোরবেলা শেষ হয়ে গেছে
বাহাত্তরের কোলকাতা এবার তুমি যুবক হও

তিনরঙা নিশানের মাঝখানে শোষণের রথের চাকার চিহ্ন
জ্বালাও শ্লোগানে, রাইফেলে, আগুনে

কিন্তু, হুঁশিয়ার কমরেড, হুঁশিয়ার পার্টি,
মন্দোদরীর মত কোনো এক কন্যার কাছে দিওনা মৃত্যুবাণ
বয়লার খাটা শ্রমিকের চোখের মণিতে
কৃষকের মুষ্টিবদ্ধ হাতে
রেখো গচ্ছিত।

হুঁশিয়ার কমরেড, হুঁশিয়ার পার্টি
শ্লোগান দিতে দিতে
রাইফেল চালাতে চালাতে
আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে
মাটির সন্তান তুমি অ্যান্টিয়ুস* ছেড়োনাকো মাটি—
শ্রমিক কৃষক
ফোর্টের সেপাইদের দশাসই বুটগুলো
বন্ধুদের সাথীদের রক্তে জব্‌ জব্‌
বেলেঘাটা লেকের পাশে কমরেডের শব
কথা বলে :
চণ্ড্‌মণ্ডে কিশোরবেলা শেষ হয়ে গেছে
বাহাত্তরের কোলকাতা এবার তুমি যুবক হও।

* গ্রীক উপকথার নায়ক অ্যান্টিয়ুস ছিলেন মাটির সন্তান। যতক্ষণ তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেন বা মাটি ছুঁয়ে থাকতেন, ততক্ষণ কেউ তাঁকে পরাভূত করতে পারতো না। জননী মাটি তাঁকে শক্তি জোগাতো।

অনীক, মে-জুন ১৯৭৩

ভালোবেসে

মুরারি মোহন মুখার্জী

ভালোবেসে চাঁদ হয়ো নাকো
পারো যদি সূর্য হয়ে এসো,
আমি সে উত্তাপ নিয়ে... নিয়ে... নিয়ে
আঁধার অরণ্য যতো জ্বেলে দিতে চাই।

ভালোবেসে নদী হয়ো নাকো
পারো যদি বন্যা হয়ে এসো
আমি সে আবেগ নিয়ে... নিয়ে... নিয়ে
হতাশার বাঁধ যতো ভেঙে দিতে চাই।

ভালোবেসে ফুল হয়ো নাকো
পারো যদি বজ্র হয়ে যাও,
আমি সে শব্দ নিয়ে... নিয়ে... নিয়ে
এদেশের প্রতি কোণে লড়াইয়ের বার্তা দিতে চাই।

ভালোবেসে পাখি হয়ো নাকো
পারো যদি ঝড় হয়ে এসো
আমি সে শক্তি নিয়ে... নিয়ে... নিয়ে
পাপের প্রাসাদ যতো ভেঙে দিতে চাই।

চাঁদ-নদী-ফুল-তারা-পাখি
দেখা যাবে কিছুকাল পরে—
কেননা এ অন্ধকারে শেষ যুদ্ধ বাকী
তাইতো আলোক চাই আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

অনীক, জুলাই ১৯৭৩

কী পাইনি তার.....!

বিমল বসু

কী দেখেছো, কী দেখেছো?
বলছি তবে শোনো :
হাজার ভূতের নাচ দেখেছি
মস্তো টাকার গাছ দেখেছি
স্বপ্ন হাজার রোজ দেখেছি
আর দেখেছি সোনায় গড়া দেশ,
লম্বা চুল আর জুলপি দাড়ি—
আহা, কী চমৎকারী বেশ!

কী শুনেছো, কী শুনেছো?
শোনো বলছি তবে :
মস্তো মস্তো বাত্ শুনেছি
ভোট-দেবতার ঢাক শুনেছি
'দিন, চাঁদা দিন'— হাঁক শুনেছি
আর শুনেছি নানা ভাষায় নানা ধোঁকাবাজী—
নিজের বিচার নিজেই করে কাজী!

কী পেয়েছো, কী পেয়েছো?
শোনোই তবে বলি :
(স্বপ্নে) গরুর দুধ পেয়েছি
চাল পেয়েছি, মাছ পেয়েছি
ভেজালবিহীন তেল পেয়েছি
টেস্টো খেলার টিকিট পেলাম আর—
সব পেয়েছি, সব পেয়েছি—
পাইনি শুধু বাঁচার অধিকার!

অনীক, জুলাই ১৯৭৩

তেলেঙ্গানা ঃ

সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতা

প্রকাশ কর

তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের ইতিহাস যেমন একদিকে ছিলো ব্যাপক জনতার মহান সংগ্রামের ইতিহাস, ঠিক একই সঙ্গে তা আবার ছিলো ভারতীয় বিপ্লব তথা ভারতীয় জনগণের প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। অবশ্য এই অপ্রিয় সত্য কথাটি শুনতে সংশোধনবাদীদের মোটেই ভালো লাগার কথা না। সিপিআই-(এম)-এর বর্তমান সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়ারও লাগে নি। তাই তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'Telengana People's Struggele and its Lessons' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তেলেঙ্গানার সংগ্রামের ব্যর্থতার ব্যাপারে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচনাকে 'কুৎসা প্রচার' বলে অভিহিত করেছেন। এ নিয়ে মিথ্যে বাগ-বিতণ্ডা কোরে লাভ নেই, তার চেয়ে আসুন, সুন্দরাইয়ার উপরোক্ত গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যের আলোকে বিচার কোরে দেখা যাক, নেতৃত্বের ভূমিকা সত্যি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ছিলো কিনা।

প্রথম প্রশ্ন ঃ চল্লিশের দশকে তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের বিকাশের পর্যায়ে পার্টি নেতৃত্ব কি এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলো?

সুন্দরাইয়া নিজেই স্বীকার করেছেন, "দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমাদের পার্টি যে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের গভীরতা অনুধাবন করতে পারে নি, ১৯৪৫-৪৬ সালের ঘটনাবলী থেকে তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন তার (পার্টির) সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের ফলে তার পক্ষে এই বিকাশসমূহ আগের থেকে ধরতে পারা এবং নিজেকে ও গণ-সংস্থাগুলিকে সেগুলোর জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব ছিলো না। ....এমনকি ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পার্টি যখন জঙ্গী গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলতে লাগলো এবং অন্ধ্র এলাকায় অকর্ষিত জমি ও জমিদারী ও সামন্তপ্রভুদের বে-আইনীভাবে অধিকৃত জমি সংগঠিতভাবে দখল করতে লাগলো, তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার নিপীড়নের সামনে সেই সব আন্দোলন প্রত্যাহার কোরে নেওয়া হয়েছিলো।" (পৃ: ৫৩) শুধু তাই নয়, পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী চেয়েছিলেন, হায়দ্রাবাদ আর তেলেঙ্গানাকে নিজামের অধীনে কংগ্রেস শাসনের তাঁবেদার কোরে রাখতে। মূলতঃ দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী লাইনের ফলশ্রুতিতেই তেলেঙ্গানার সংগ্রাম প্রথম দিকে বিপ্লবের স্তরে পৌঁছোতে পারে নি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তখন তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের কমিউনিষ্টদের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিলো, এবং তার ফলশ্রুতিতে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের যে মতাদর্শগত ভিত্তি 'অন্ধ্র পার্টির চিঠি' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো, সেই সঠিক বক্তব্যের প্রতি নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিলো?

এই চিঠিতে অন্ধ্র কমিটি সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছিলো যে, "মাও সেতুঙের 'নয়া-গণতন্ত্র'ই ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দেশ করছে।" চীন বিপ্লবে অনুসৃত মাওসেতুঙের বিপ্লবী লাইনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয়েছিলো, "কৃষি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধ, এবং তারই পরিণতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট..... নির্মমভাবে আমাদের ধ্বংস করতে উদ্যত নেহরু সরকারের সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে (চীনের কায়দায়) গেরিলা যুদ্ধ চালাবার কথা ভাববার সময় এসে গেছে।" (উদ্ধৃত : পৃ: ৩৯৩)

কিন্তু ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত "দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত পলিটব্যুরো অন্ধ্র কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সমগ্র তত্ত্বকে স্থূল সংস্কারবাদ বলে আখ্যা দিলো, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত বলে চীনের পথের ধারণাকে চিহ্নিত করলো, এবং তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো।" (পৃ: ৩৯৪)

সুন্দরাইয়া উপরোক্ত স্বীকৃতির মধ্যে যে তথ্যগুলি সুবিধেজনকভাবে চেপে গিয়েছেন, তা হোচ্ছে : (১) এই পরমবিপ্লবী পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে ছিলেন রণদিভে, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। (২) রণদিভে থিসিসের মূল বক্তব্য ছিলো এই যে, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূলতঃ অবসান ঘটে যেছে, কাজেই ভারতের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক, এবং রাশিয়ার পথ অনুসরণ কোরেই ভারতের বিপ্লব পরিচালিত হওয়া উচিত। (৩) রণদিভে এখানেই না থেমে অত্যন্ত কুৎসিৎ ভাষায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে মাওসেতুংকে ধারাবাহিকভাবে গালাগালি কোরে গেছিলেন— যেমন, মাওসেতুং "অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের মার্কসবাদী", "তথাকথিত নয়া গণতন্ত্রের যে তত্ত্ব মাওসেতুঙের আবিষ্কার বলে এবং তাকে মার্কসবাদের নতুন বিকাশ বলে প্রচার করা হোচ্ছে, সেই তত্ত্ব কোনো কমিউনিষ্ট পার্টি আজ পর্যন্ত স্বীকার করে নি, মাওসেতুঙের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব "ভয়ংকর ও প্রতিক্রিয়াশীল", "মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের মূল নীতির বিরোধী" ইত্যাদি ইত্যাদি। (৪) এই প্রতিবিপ্লবী অবস্থান থেকে রণদিভে অনুসরণ করেছিলেন এক 'বামপন্থী' হঠকারী লাইন, এবং তেলেঙ্গানার বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে শুরু কোরে দিয়েছিলেন তার 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লব— রাতারাতি শহরে শহরে ধর্মঘট ডেকে, ট্রামবাস পুড়িয়ে আর বোমা-পটকা ফাটিয়ে।

কিন্তু সুন্দরাইয়া এই তথ্যগুলি চেপে গেলেন কেন? প্রথমতঃ, অন্ধ্র কমিটির মধ্যে সুন্দরাইয়াই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ভারতীয় বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্তবাদ-বিরোধী চরিত্রের বিরোধিতা কোরে এক ধাক্কাতেই ভারতের গণতান্ত্রিক ও

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর দুটি শেষ করার টিটোপন্থী বক্তব্যের পক্ষে রণদিভের মতোই ওকালতি করেছিলেন। স্বভাবতঃই তারা দুজনেই যেহেতু এখন সিপিআই (এম)-এর নেতা, এবং সিপিআই (এম)-ও যেহেতু জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগানই আজ দিয়ে থাকে— সেহেতু তাদের পার্টির সদস্যদের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি কলংকিত না হতে দেবার জন্য নিজেদের অতীত ভূমিকাকে চেপে যাওয়াটাই তার পক্ষে সুবিধেজনক। দ্বিতীয়তঃ, রণদিভের প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব আন্তর্জাতিকভাবেও যে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলো, এবং তার পরিণতিতে ভারতে রণদিভে লাইন যে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছিলো, সে তথ্যটাও ফাঁস হয়ে গেলে মুস্কিল আছে।

রণদিভে লাইনের বিরোধিতা কোরে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মুখপত্র ফর লাষ্টিং পিস অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসির ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখের সম্পাদকীয়তে বলা হোয়েছিলো : "বিভিন্ন উপনিবেশিক ও নয়া-উপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনতাকে অনুসরণ করতে হবে চীনা জনগণের অনুসৃত পথকেই।" এবং আন্তর্জাতিকভাবে রণদিভের লাইনকে টিটোপন্থী বিচ্যুতি বলে চিহ্নিত করার পরই ভারতে অন্ধ্র কমিটির বক্তব্যের পক্ষে এবং রণদিভে লাইনের বিপক্ষে যে মতাদর্শগত সংগ্রামের জোয়ার উঠেছিলো, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রণদিভেকে স্বীকার করতে হয়েছিলো যে, "আমি বামপন্থী সংকীর্ণবাদে স্বভাবসিদ্ধ", "গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের বিপ্লবী রূপ সম্পর্কে আমি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিলাম।" "টিটোপন্থী মতাদর্শের প্রভাবে আমার মন আচ্ছন্ন ছিলো," "মাও-এর বিরুদ্ধে আমার উদ্ধত ও দাম্ভিক আক্রমণ ছিলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্জনেরই অঙ্গমাত্র", "আমি মার্কসবাদ জানতাম না এবং বস্তুতঃ তার নামে বেশ্যাবৃত্তি করেছি," ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ রণদিভের প্রতিবিপ্লবী লাইন পর্যুদস্ত হবার পর নোতুন নেতৃত্ব কি তেলেঙ্গানার বিপ্লবের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলো?

রণদিভে লাইন পর্যুদস্ত হবার পর রাজেশ্বর রাওকে সাধারণ সম্পাদক কোরে যে নোতুন পলিটব্যুরো নেতৃত্বে এলো, তারা (১) রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে গৃহীত 'বামপন্থী' হঠাকারী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করলো, (২) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দুই স্তরকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেবার টিটোপন্থী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করলো; এবং (৩) চীনের পথ অনুসরণ কোরে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ঘটাবার লাইনকে সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই লাইন কার্যকরী হলো না। ডাঙ্গে, অজয় ঘোষ, রবিশংকর রেড্ডি, ঘাটে প্রমুখ সংশোধনবাদীরা প্রকাশ্যেই এই লাইনের বিরোধিতা করলো, এবং ফলতঃ পার্টি বাস্তবে কতকগুলি গ্রুপ ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় পার্টির পক্ষ থেকে রাজেশ্বর রাও, বাসবপুন্নাইয়া, ডাঙ্গে ও অজয় ঘোষ মস্কোয় স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। আলোচনা থেকে দু'টি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এলো ঃ (১) ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্র মূলতঃ পূর্বতন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই

বিস্তৃতি মাত্র, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মতি নিয়েই এবং তার স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে; (২) সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই কেবল জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (পৃষ্ঠা ৩৯৭-৪০৩)। এবং সুন্দরায়ারই স্বীকৃতি অনুযায়ী (পৃ: ৪১১-১৩), আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হলো, কোনো বিশেষ অঞ্চলে পরিস্থিতি উপযোগী হোলে, (অন্যত্র উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও) সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে এবং অবস্থা উপযোগী হলে সীমিত অর্থনৈতিক দাবী নিয়েও, (এমনকি সুসংবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশিষ্ট অঞ্চলেও) সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

অথচ ১৯৫১ সালে এই আলোচনার ভিত্তিতে যে নোতুন লাইন রচিত হলো, তাতে উপরোক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি এমন বক্তব্য হাজির করা হলো, যা তার একেবারে বিপরীত। যেমন, ভারতবর্ষের আধা-উপনিবেশিক রাষ্ট্রচরিত্র স্বীকার কোরে নিয়েও এবং সশস্ত্র বিপ্লবকেই মুক্তির পথ হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও, জনগণের অসচেতনতার দোহাই দিয়ে পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো।

আর তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক লাইন গৃহীত হলো তেলেঙ্গানা বিপ্লবের সম্পর্কে। অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া থেকে শুরু হয়ে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পর্যায়ে এই আন্দোলনের বিকাশকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সমর্থন জানানো সত্ত্বেও, নিজামশাহীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিপ্লবকে (১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে) সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস নেহরু সরকারের বিরুদ্ধেও মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে পরিচালনা করার লাইনকে "সংকীর্ণবাদী ও ভুল" বলে অভিহিত করা হলো (পৃ: ৩১৫)। ডাঙ্গে প্রমুখ প্রকাশ্য দক্ষিণপন্থীরা প্রকাশ্যেই এই লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যাবার বিরোধিতা করলেন, আর রাজেশ্বর রাও-সুন্দরাইয়া প্রমুখ তথাকথিত বামপন্থীরা লড়াইয়ের অর্জিত ফলগুলিকে রক্ষা করার সর্তে এই লড়াই বন্ধ কোরে দেবার সুপারিশ করলো। এবং নেহরু সরকার যখন এই সব সর্ত মানতে খোলাখুলি অস্বীকার করলো, তখন নোতুন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের নেতৃত্বে নোতুন পলিটব্যুরো বিনা সর্তে নেহরু সরকারের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে লড়াই থামিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তেলেঙ্গানার নেতৃত্ব প্রথম দিকে এর সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন। এবং বিনাসর্তে লড়াই প্রত্যাহৃত হবার পর পার্টি আঁটঘাঁট বেঁধে ১৯৫২-র নির্বাচনী 'লড়াই'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মূলতঃ সুন্দরাইয়ারই গ্রন্থে পরিবেশিত উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে তাহলে ধরা পড়ছেঃ (১) পার্টি নেতৃত্ব প্রথমে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অবস্থান থেকে তেলেঙ্গানার বিপ্লবী লড়াইয়ের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয় নি; (২) পরবর্তীকালে রণদিভে প্রমুখের 'বামপন্থী' লাইনে এই লড়াইয়ের মূল লাইনের এবং কার্যতঃ এর সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা করেছে; (৩) শেষে অজয় ঘোষের নেতৃত্বাধীন পলিটব্যুরো বিনা শর্তে চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এই লড়াই থামিয়ে দিয়েছে। "এক কথায় ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যোশী-ডাঙ্গে প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতারা তেলেঙ্গানার লড়াইকে ডানদিক থেকে ছুরি

মেরেছিলেন, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রণদিভে-সুন্দরাইয়া প্রমুখরা একে 'বাঁ' দিক থেকে ছুরি মেরেছিলেন, এবং ১৯৫১-র শেষ দিকে অজয় ঘোষ একে ছুরি মেরেছিলেন বুকের ঠিক মাঝখানে।'' অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ইতিহাস হোচ্ছে সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

সবশেষে একটি বক্তব্য। আজকে সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর সংশোধনবাদী নেতৃত্ব তেলেঙ্গানার গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের নিজের পার্টির পশার বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু একে অভিহিত করছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লড়াই হিসেবে। আমাদের একটিই প্রশ্ন : সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-জোতদার গোষ্ঠির হাত থেকে অস্ত্রের জোরে জমি কেড়ে নেওয়া, জনগণের ফৌজ গড়ে তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আড়াই হাজার গ্রাম দখল কোরে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা, আর ব্যাপক কৃষক ও মেহনতী জনতার ভোটে নির্বাচিত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করাটা যদি অর্থনৈতিক লড়াই হয়, তবে বিপ্লবী সংগ্রাম কাকে বলে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বুলি কপচে নির্বাচনের মাধ্যমে গদি দখল করার কুকুর-কামড়াকামড়িকেই কি তবে 'বিপ্লবী সংগ্রাম' বলে অভিহিত করতে হবে?

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৩

ঝড়ের পাখীর গান

বিষ্ণু বাগচী

অনেক বাধা, অনেক দ্বিধা, অনেক ব্যবধান—
শুনতে চাও?— শুনতে পাই ঝড়ের পাখীর গান,
নিস্তরঙ্গ ইচ্ছামতী তরঙ্গিত প্রাণ,
মলিনতার মধ্যিখানে জীবন্ত অম্লান।
ইছামতী ফুঁসিয়ে ওঠে, ফুঁসিয়ে ওঠে মেচির ঢেউ
লালা ঝরে শৃগাল ঘোরে ফসল তোলে ফেউ।

মেচি ফোঁসায়, মাত্‌লা ফোঁসায়, গর্জে ইছামতী
দ্বন্দ্বে-দ্বিধায় উত্তরণ সাগরমুখী গতি।
গেরিলা সব ইছামতী, মেচির হাতে ধনুর্বাণ,
গঙ্গা মেকং ঐকতানে ঝড়ের পাখীর গান।

ধনুক নিলে কে তুমি হে, ফসল খাও পঙ্গপাল,
ছিনিয়ে খাওয়া বাজের সাথে ঠায় দাঁড়িয়ে দিচ্ছো তাল।
দালাল তুমি, ভণ্ড তুমি, বীরের ঢঙে ফেরুর পাল,
পিছিয়ে দাও সামনে থেকে সূর্যমুখী সাতসকাল।
অনেক দ্বিধা অনেক বাধা অনেক ব্যবধান
মাতলা-মেচি গর্জে শুনি— ঝড়ের পাখীর গান।।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৩

জেলখানার দেয়াল ভাঙছে

ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়

লেনিন, কবরেও তোমার শান্তি নেই
তোমার চারপাশে লেনিন, লেনিনের পাশে লেনিন,
তারপরে আবারও
ধানক্ষেতে রক্তে আর কাদায় গেঁথে ফেলা
রোলিং-মিলে থ্যাঁৎলানো
কয়েকটা শরীর
তোমারই মতো ঘৃণায় কাঁপছে
তোমার রক্তের দোসর।

শান্তি নেই কমরেডের পচা শবের পাশে
গারদের আস্তাকুঁড়ে দুমড়ানো শরীরটাকে
জাগিয়ে রাখা বন্দীদের
ভাঙা কব্জির মুঠো খুললেই লাফিয়ে উঠবে ঝড়
ফাঁড়া পাঁজর জোড়া লাগলেই আবার বিদ্যুৎ খেলবে বুকে
অস্থির সময় খাঁচার বাঘের মত রক্তে আঁচড় কাটে
তিন দিনের পচা কমরেডের লাসের পাশে বন্দীরা জেগে
জেলখানার গহ্বরে,
লেনিন, তোমারই মত ওদের শান্তি নেই।

ঘুলঘুলিতে জলের ফোঁটার মত আলো
ঠিক এই সময় ওদের দূর গাঁয়ে লাউয়ের মাচানে
সূর্য নেমে আসছে,
নিঃসঙ্গ পানার থেকে আহত জল ঝরছে দীঘিতে
দুরন্ত শিশুর মত গোলপাতার ছাউনিতে চোর-পুলিশ খেলছে হাওয়া
যারা ভাবছো ওদের মেয়ে-বউয়েরা ঘাটে-অন্ধকারে
বুক চেপে কাঁদছে—
তারা ভুল করছো

দ্যাখো, ওদের কঞ্চির-বেড়া তীক্ষ্ণ হয়ে রাগে
আকাশ খুঁড়ছে,
মেয়েরা তুলসী মঞ্চ থেকে প্রদীপ হিঁচড়ে এনে
মজুত গোলার নীচে উল্টে দিচ্ছে—
দাউ দাউ কোরে জ্বলছে
ভূগোলের ভুল মানচিত্র।

কবরেও লেনিনের শান্তি নেই
চারপাশে পিষ্ট হাভাতে মানুষের শব
তাঁরই মত ঘৃণায় কাঁপছে
কেঁপে উঠছে ভারতের অসহ্য মাটি
ভূমিকম্পে
জেলখানার দেয়াল ভাঙছে।।

অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৩

পদাতিক

আশা মিত্র

মৃণাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি 'পদাতিক'-কে কেন্দ্র কোরে সম্প্রতি বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই প্রসঙ্গে জনৈকা পাঠিকাবন্ধুর একটি সমালোচনা আমরা পেয়েছি। আমরা সেটি প্রকাশ করছি— এবং এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিভিত্তিক মতামত আহ্বান করছি। —সম্পাদক

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেন রাজনীতি-সচেতন সিনেমা-দর্শকদের সামনে একটি প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছেন। আর এই প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছে তাঁর 'ইন্টারভিউ' ও বিশেষ কোরে 'কলকাতা '৭১' ছবি দুটিকে কেন্দ্র কোরে। স্বভাবতই তাঁর ট্রিয়লজির শেষ অংশ 'পদাতিক' সম্পর্কে অনেকেরই তাই ছিলো অনেক প্রত্যাশা, অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। এখন প্রশ্ন : তিনি কি সেই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পেরেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী দু'টি ছবির সঙ্গে ধারাবাহিকতার মধ্যেই 'পদাতিক'-কে দেখতে হবে। 'ইন্টারভিউ' ছবিতে একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে এদেশের পরোক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য না হোলেও, একজন ইউরোপীয়ানের মূর্তিকে গায়ের জোরে চূর্ণবিচূর্ণ করার ইমেজের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক হিংসার মধ্যে দিয়ে এই শোষণ ব্যবস্থাকে উপরে ফেলার ইংগিতটা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিলো। পরবর্তী ছবি 'কলকাতা '৭১-এ গত কয়েক দশকের শোষণ ও নিপীড়নের নগ্ন বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছিলো এবং তার পটভূমিকায় একাত্তরের বিদ্রোহী যুব সত্তার বিস্ফোরণেরই সমর্থন মিলেছিলো— যদিও শ্রেণী সংগ্রামের সুস্পষ্ট ছবি সেখানে ধরা পড়ে নি। সর্বশেষ ছবি 'পদাতিক'-কে এই পটভূমিকায় বিচার করলে ধরা পড়বে, এই ছবি একাত্তরের বিদ্রোহী যুবসত্তারই আত্ম-সমীক্ষা, 'অন্তরে ও বাইরে সংগ্রাম' চালাবার চিত্র-রূপায়ণ। পদাতিকের নায়ক গত পাঁচ বছরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে অনুভব করছে— সে নিঃসঙ্গ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন— এবং এখানেই সে খুঁজে পেয়েছে এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বর্তমান পিছু-হটার মূল চাবিকাঠিটাকে। এই নির্মম সত্যটাকে উপলব্ধি করার পর সে কিন্তু আর বসে থাকতে চায়নি, 'এক থেকে একশো হবার' উদ্দীপনা পেয়েছে যে জনগণ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলো, সেই জনগণেরই প্রতীক তার বাবার সঙ্গে আবার সে একাত্ম হতে পেরেছে, এবং বাবার মুখ দিয়ে সেই জনগণই তাকে শুনিয়েছে আশার বাণী— 'Be brave'

(সাহসী হও)। নেপথ্যে তখন বেজে উঠেছে অগ্রগতির রণধ্বনি এবং তার পটভূমিকায় জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নোতুন বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ার তুলবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে পা বাড়িয়েছে। এভাবে ধারাবাহিকতার মধ্যে 'পদাতিক'কে বিচার করলে অবশ্যই একে আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে, বলতে হবে মৃণাল সেন আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

'পদাতিক'-এ অনুসৃত শিল্পরীতিও মৃণালসেনের পূর্ববর্তী ছবি দু'টির তুলনায় অনেক বেশি সহজ, টেকনিকের চাকচিক্য এতে অনেক কম, এক কথায় বলা যায়— কম কথায় সোজা ভাষায় গভীর এক বক্তব্য তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু পেরেছেন কি? এটাই এক জ্বলন্ত প্রশ্ন।

কারণ প্রথমতঃ, সেই শিল্পসৃষ্টিই সবচেয়ে সার্থক, যার বক্তব্য জনগণের সামনে মূল প্রশ্নটিকে সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে জনগণকে এগিয়ে চলবার প্রেরণা দেয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'কলকাতা ৭১' অনেক বেশি সার্থক, তার বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কারণ সেখানে খণ্ড খণ্ড কতকগুলি সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে শোষণের রূপটি যেরকম গভীরভাবে দর্শকদের মনে নাড়া দেয়, তাতে দর্শক বিদ্রোহের যৌক্তিকতাই খুঁজে পান, তাদের হাত মুঠো হয়ে আসে। কিন্তু 'পদাতিক' জীবনের সেই গভীরতায় পৌঁছোতে পারেনি। একটা বিরাট আন্দোলনকে বাইরে থেকে দেখা ও ভেতর থেকে তার শরিক হয়ে দেখার মধ্যে যে ব্যবধান, তারই শিকার হয়েছেন মৃণাল সেন। শেষ দৃশ্যে সংগ্রামের বাণী যেখানে উচ্চারিত হয়েছে বাবার মুখে, সেখানে দর্শক ছবির সঙ্গে অবশ্যই একাত্ম হয়ে ওঠেন, এ দৃশ্যটিই হয়ে ওঠে ছবির সবচেয়ে নাড়া-দেওয়া দৃশ্য, কিন্তু তার প্রস্তুতি তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং সেজন্যই সব মিলিয়ে 'পদাতিক' দর্শকমনে গভীরভাবে নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের শিল্পী যিনি, নেতিবাচক ও ইতিবাচক দু'টি ধারাকেই তিনি তাঁর সৃষ্টিতে তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু তাঁকে অবশ্যই জোর দিতে হবে ইতিবাচক দিকটার ওপর, তাকেই উজ্জ্বল কোরে রূপায়িত করতে হবে— যাতে দর্শক সে দিকটিকেই বড়ো করে দেখেন, এবং সে দিকেই পা বাড়ান। এ ছবিতে জেল থেকে পলাতক বিপ্লবী নায়কের পার্টির যে জীবন ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি প্রধানতঃ নেতিবাচক। এ রকম আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব বা 'বাম' সংকীর্ণতাবাদী কার্যকলাপ অবশ্যই বাস্তবে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি অনেক বেশি উজ্জ্বলভাবে মহানভাবে গত পাঁচ-ছ' বছরে বিপ্লবী কর্মীরা জনগণের সঙ্গে একাত্ম হবার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সমগ্র বিপ্লবী লড়াইকে এগিয়ে নেবার জন্য মহান আত্মত্যাগ করেছেন— এবং সেই ইতিবাচক দিকটি এই ছবিতে শুধুমাত্র ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে, সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কখনও। এখানেই মৃণাল সেনের ব্যর্থতা— তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক দিকটাকে স্পষ্ট কোরে তুলে ধরেছেন অথচ ইতিবাচক দিকটিকে স্পষ্ট কোরে তুলতে পারেন নি। সামগ্রিকভাবে এ ছবিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পক্ষেই, তাকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাই বলা হয়েছে— এটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে গেলে ইতিবাচক

ধারাটিকে ক্রমাগতভাবে উজ্জ্বল কোরে তুলে ধরার যে দায়িত্ব একজন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পীর ওপর এসে পড়ে, মৃণাল সেন সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। অবশ্য সেন্সার বোর্ডের কাঁচির যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার উত্তরে একটা কথাই বলার থেকে যায় : তাহলে মৃণালবাবুর এই বিষয়বস্তু বেছে নেওয়াই ঠিক হয় নি।

তৃতীয়তঃ, এ ছবিতে পরিচালক সামাজিক শোষণ ও আমলাতান্ত্রিক পার্টি-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নায়কের বিদ্রোহের সঙ্গে তার আশ্রয়দাত্রী উচ্চবিত্তা মহিলাটির নারী স্বাধীনতার দাবীকে যেভাবে একই সূত্রে মেলাতে চেয়েছেন, তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি— এমনকি তার প্রয়োজন আদৌ ছিলো কিনা এ প্রশ্নও উঠতে পারে। বরং তাতে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় চরিত্র ও ঘটনা এসে ভিড় করেছে, এবং ছবির মূল বক্তব্য তা থেকে মোটেই সাহায্য পায় নি। একেও সার্থক শিল্প-সৃষ্টির শর্ত পূরণে অক্ষমতাই বলতে হবে।

কাজেই, মৃণাল সেন অগণিত দর্শকের প্রত্যাশা মেটাতে পেরেছেন কিনা, তার উত্তরে বলতে হয়— তিনি প্রত্যাশা মিটিয়েছেন আংশিকভাবে— সামগ্রিকভাবে দর্শকদের প্রত্যাশা তিনি মেটাতে পারেন নি।

সবশেষে, মৃণালবাবুকে অনুরোধ করবো, এরপর থেকে ছবি করতে গিয়ে বিষয়বস্তু ও কাহিনী নির্বাচনে তিনি যেন অনেক বেশি সতর্কতা গ্রহণ করেন— যে জীবনের গভীরে তিনি ঢোকেন নি, তাকে নিয়ে ছবি করার বদলে, যে জীবনকে তিনি চেনেন, জানেন, তাকে নিয়েই তিনি ছবি করুন, এবং সেই জীবনের গভীরতা থেকেই দর্শকদের সামনে মূল প্রশ্নটিকে তুলে আনুন, মূল বক্তব্যটি তুলে ধরুন। একমাত্র এভাবেই তিনি ব্যাপক দর্শক সাধারণের অনেক কাছাকাছি যেতে পারবেন, অনেক সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারবেন। একজন সমাজ সচেতন শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশি সার্থকভাবে পালন করতে পারবেন।

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭৩

হিঃ হিঃ কোরে আহ্লাদে আটখানা হ

সমীর রায়

হিঃ হিঃ কোরে আহ্লাদে আটখানা হ
নরমুণ্ডু চিবিয়ে খা
ডাকিনী-যোগিনীরা মিলে নরক গুলজার কর্
ইন্দ্রের নষ্টসভায় খেম্‌টা নাচ নেচে বেহুলারা স্বামী, ধনরত্ন, রাজ্যপাট ফিরে পায়,
নবরত্নকবিকুল, রাজার গলার মালা নিয়ে শিষ দিতে দিতে ঘরে ফেরে

এই আমি বত্রিশ সিংহাসন মাড়াতে মাড়াতে
গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেম হারাতে হারাতে।

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী আসবেন না

রঞ্জিত গুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী আসবেন না.....
কলকাতার আকাশ যদিও পরিষ্কার
ঝড় বা বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টিপাত কোনো কিছুরই সম্ভাবনা নেই
তবু না—
কেননা একটা কুকুর.....
একটা কুকুর.....

চুরি কিংবা খুনের কেসে আসামী ধরতে আমরা কুকুর লাগাই,
শিক্ষিত-কুকুর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র
গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক বার করে— প্রকৃত আসামী কে?
আমরা একই নিয়মে 'চাল গম তেল রুটি' রহস্যের কিনারা করতে
কুকুর লাগালে কিরকম হয় দেখতে গেছিলাম,
এবং সেখানেই হয়েছে যতো বিপদ—
কুকুরটা এখন অনেককেই কামড়াচ্ছে।

মজুতদার-কালোবাজার-বিরোধী সপ্তাহের প্রথম দিন হিসাবে
সেদিন খাদ্যমন্ত্রী থেকে শুরু কোরে সরকার পক্ষের
সব তরফের সব ধরনের কর্মকর্তারাই ছিলেন।
খাদ্যমন্ত্রী কুকুরটার বাঁধন নিজের হাতে
খুলে দিয়ে অভিযানের উদ্বোধনও করলেন,
কিন্তু আশ্চর্য, কুকুরটা প্রথম যাকে কামড়ালো— তিনি খাদ্যমন্ত্রী,
তার জুতোর চামড়া ভেদ কোরে
দেড় ইঞ্চি ঢুকে গেলো কুকুরটার দাঁত।
পাশে ছিলেন পুলিসের একজন পদস্থ কর্মচারী
তিনি কিছু বুঝবার আগেই তিনি হলেন
কুকুরটার আক্রমণের দ্বিতীয় শিকার,
তার পাশে ছিলেন তার চেয়েও বড়ো পুলিশের আর একজন কর্তাব্যক্তি
কুকুরটা তাকেও দৌড় করিয়ে ছাড়লো।

প্রধানমন্ত্রী। কুকুরটা এখন লালবাজারের সামনে ঘেউ ঘেউ করছে।
লালবাজারের পর কুকুরটা চললো বড়বাজারের দিকে
সেখানে প্রতিটি গদির সামনে, প্রতিটি ফাইল, টেলিফোন
ঘেঁটে শুঁকে প্রতিবারই সে গর্জে উঠলো ভীষণভাবে,
যে যতো বড় ব্যবসায়ী তার বেলায়
ততো গম্ভীর ততো বেশী ছিলো ডাক।

বড়বাজার ছেড়ে এবার সে
সোজা চললো মহাকরণের দিকে,
আগে থাকতে পুলিস মোতায়েন হয়ে যাওয়ায়
সে ঢুকতে পারলো না,
কিন্তু যাওয়ার আগে নিচের থেকেই
মন্ত্রী-সচিব-উপদেষ্টাদের ঘরের জানলাগুলি
লক্ষ্য কোরে ছুড়লো তার চিৎকার—
কী সে চীৎকার!

এরপর সে সোজা সরে আসতে লাগলো দক্ষিণ দিকে,
কার্জন পার্কের কাছে আমরা আশা করেছিলাম
সে একটু জিরোবে,
কিন্তু না, সে একটুও না থেমে
ফুটপাত বদল কোরে ঠিক উল্টো দিকে যেখানে রাজভবন
তার দেওয়ালের গায়ে সামনের পা দুটো রেখে
চেঁচিয়ে উঠলো আরেকবার এবং শেষবার
এত জোরে যে চিৎকারে
ধারে কাছে আকাশবাণীর প্রচারকার্য অবধি
বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

প্রধানমন্ত্রী আসবেন না—
কলকাতার আকাশ যদিও পরিষ্কার
ঝড় বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত কোনো কিছুরই সম্ভাবনা নেই
তবু না—
কেননা কুকুরটা, বলা যায় না, আপনাকেও কামড়ে দিতে পারে!

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৪

আমার দুঃখেরা এখন

সঞ্জীব চৌধুরী

আমার দুঃখেরা এককালে
লণ্ড্রীভাঙা সার্টপ্যান্টে ইতরের মতো অফিস করতো,
কুত্তার মতন অফিস-বসের সামনে মাথা চুল্‌কিয়ে
কলিগ্‌দের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে
নির্লজ্জের মত একগাদা মিথ্যার বেসাতির মধ্যে
সকল সুখের রাজত্ব খুঁজে পেতো।

অথচ যখনই দেখেছি, শস্যক্ষেত্রে বারুদের স্তূপ—
উজ্জ্বল প্রতিহিংসা-বুকে নিয়ে
আমার সুখ আর দুঃখের মধ্যে
একটা মনোরম সেতু তৈরীর উদ্দেশ্যে
অভিমন্যুরা লড়াই কোরে চলেছে।
আজকের নায়ক ব্যূহবন্দী অভিমন্যু
কৌরবের ঘৃণ্য চাল্‌কে
প্রতিরোধ করছে, ছড়াচ্ছে আগুন—
প্রত্যয়ে উজ্জ্বল সাঁজোয়া ট্যাঙ্কের মতো।

আমার দুঃখেরা তাই
হামাগুড়ি দিতে দিতে
হাত মিলিয়েছে এখন অভিমন্যুদের সাথে,
সুতীব্র শ্রেণী-বিদ্বেষে আমার দুঃখেরা আজ
বারাসত বরানগরের অভিমন্যুদের পাশে দাঁড়িয়ে
বুকের গোপন অগ্নিবীণায়
মুক্তির লাল আগুণে পুড়ে
শোষিতের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে
প্রত্যয়ে দৃঢ় এক সূর্য হয়ে গেছে,
আমার দুঃখেরা এখন
আসল সুখের সীমানায় প্রবেশ করছে—
প্রবেশ করছে মুক্তির সীমানায়।।

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৩

সুন্দরাইয়া—
রুশ নয়া জারদের নয়া উকীল?

তরুণ রায়

এক

সাম্প্রতিক কালে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রুশ নয়া জাররা ক্রমাগতভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে নয়া উপনিবেশবাদী বন্ধনে বেঁধে ফেললেও, এদেশের তাবৎ সংশোধনবাদীরাই এতোদিন তার পক্ষে তারস্বরে ওকালতি কোরে এসেছে। কিন্তু রুশ শাসকচক্রের প্রধান পাণ্ডা ব্রেজনেভের সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে উচ্চারিত নির্লজ্জ ইন্দিরা-প্রশস্তিতে বিরক্ত হয়ে নিজেদের 'বামপন্থী' ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য সিপিআই(এম)-এর সংশোধনবাদী নেতৃত্ব পর্যন্ত এই প্রশস্তির বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের এই প্রতিবাদকেই আবার এদেশে রুশ নয়া-জারদের প্রত্যক্ষ এজেন্ট সিপিআই সংশোধনবাদীরা 'রুশ-বিরোধিতা' বলে বর্ণনা করায়, সিপিআই(এম) নেতৃত্ব নিজেদের 'রুশ-প্রেম' প্রমাণ করার জন্য আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই তাদের ইংরেজী মুখপত্র 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি'তে সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নায়া প্রভৃতিরা গণ্ডাখানেক প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ কোরে ছেড়েছেন যে, তাঁরা যথার্থ রুশ নয়া-জারদের পক্ষে। এই পটভূমিকাতেই গত ২৩শে ডিসেম্বরের 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি'তে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়ার একটি প্রবন্ধ— যার শিরোনাম হচ্ছে "Does Soviet Aid Enslave India" ("সোভিয়েত সাহায্য কি ভারতকে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলছে?")— বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় অর্থনীতিকে নিজেদের কব্জার মধ্যে পুরোপুরি নিয়ে আসার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত যখন দিন দিন ভারতীয় জনগণের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, সিপিআই-এর হাজার ব্যাখ্যাতেও যখন এই চক্রান্তকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, তখন রুশ নয়া জারদের পক্ষে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদকের এই ওকালতি কি নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার? এই জ্বলন্ত প্রশ্নটিই আমরা আজ তুলে ধরতে চাই সিপিআই(এম)-এর মধ্যেকার প্রতিটি সৎ ও জঙ্গী সাধারণ-কর্মীর কাছে। আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার ব্যাপারে সুন্দরাইয়ার উপরোক্ত প্রবন্ধটিই আমাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে।

দুই

সোভিয়েত 'সাহায্য' ভারতকে প্রকৃতই দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলছে কিনা— এই প্রশ্নের আলোচনার শুরুতেই যে প্রাথমিক প্রশ্নটি এসে পড়ে, সেটি হচ্ছে : বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন কি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ? সুন্দরাইয়া বলছেন, "আমাদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শক্তি, এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি নয়।" কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, স্তালিনোত্তর রাশিয়ার আধুনিক সংশোধনবাদী শাসকচক্র ক্রমাগতভাবে "সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঙন ধরাচ্ছে এবং শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি অনুসরণ" করছে, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভাঙন ধরাচ্ছে", "সমস্ত দেশের জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করছে", "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভাঙন ধরাচ্ছে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা মিলবে বলে পরাধীন দেশগুলির মধ্যে মোহ সৃষ্টি করছে", বিভিন্ন সদ্য-স্বাধীন দেশের "মেহনতী জনগণের সংগ্রামে সাহায্য করার বদলে সে সব দেশের পুঁজিবাদী বিকাশেই সহায়তা করছে", "সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রেণী-সহযোগিতা ও আপোষের পথকেই কার্যকরী করছে", "শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে প্রচণ্ড ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে", "বিশ্ব-শান্তিরক্ষার অজুহাতে সহযোগিতা ও আপোষের ভিত্তিতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শান্তি স্থাপন করতে চাইছে"— তবে সুন্দরাইয়া কী বলবেন? কেউ যদি আরো বলেন যে, সোভিয়েত শাসকচক্র "সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করছে, তার দুষ্কর্মগুলিকে ঢাকা দিচ্ছে এবং মন জুগিয়ে চলছে," "মার্কসবাদ-বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক" এবং "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি বিপজ্জনক ফলশ্রুতিসম্পন্ন" 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' ও 'সমগ্র জনগণের পার্টি'-র তত্ত্বকে কার্যকরী করেছে, এবং শুধু তাই নয়, "বৈষয়িক উৎসাহ ও মুনাফার লোভ দেখিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আক্রমণ চালিয়েছে" এবং এভাবে "চূড়ান্ত বিচারে, নোতুন ধরণের এক পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত কোরে দিয়েছে"—তবেই বা সুন্দরাইয়া কী বলবেন? না, তার কিছুই বলার উপায় থাকবে না— কেননা, উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যেকার এইসব বক্তব্যগুলি সুন্দরাইয়ারই পার্টির বক্তব্য। এর প্রত্যেকটি অভিযোগ সুন্দরাইয়ারা নিজেরাই উপস্থিত করেছেন তাদের পার্টির পলিটব্যুরো কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত "Ideological Debate Summed Up" শীর্ষক পুস্তকে, ১৯৬৮ সালের জুন মাসে।

কিন্তু এতো সব অভিযোগের পরেও কোন্ মুখে সুন্দরাইয়া বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন? বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের যে পরিচয় উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি কি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে সংগতিপূর্ণ? এর উত্তরে সুন্দরাইয়ারা কী বলবেন জানি— বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্র থেকে মূলতঃ বিচ্যুত বলে ঘোষণা করতে হলে আগে প্রমাণ করতে হবে যে সোভিয়েত অর্থনীতিতেও সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তর

ঘটেছে। সুন্দরাইয়ারা নিজেরাও স্বীকার করেছেন যে (ওপরের বড়ো হরফের বক্তব্য দ্রষ্টব্য), সোভিয়েত শাসকচক্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আক্রমণ চালিয়েছে, এবং বৈষয়িক উৎসাহ ও মুনাফার লোভ দেখিয়ে "নোতুন ধরণের এক পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত কোরে দিয়েছে।" খুব ভালো কথা! কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে গত একুশ বছর ধরেই এই "আক্রমণ" ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করার প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে, এবং তার বিপরীত প্রক্রিয়া যদি অধিকতর জোরদার না হয়ে ওঠে (যে দাবী সুন্দরাইয়ারা পর্যন্ত করতে পারেন নি), তবে আমাদের একটাই প্রশ্ন থেকে যায় : সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্র (সুন্দরাইয়াদেরই স্বীকৃতি অনুসারে)— শ্রেণীচরিত্র-গত বিচারে যারা অতি অবশ্যই বুর্জোয়া (লেনিনের 'মার্কস্‌বাদ ও সংশোধনবাদ' প্রবন্ধের শিক্ষা অনুসারে)—যদি গত একুশ বছর ধরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কোরে থাকে এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত কোরেই চলতে থাকে— তবে তারা কি এতোদিন ধরে শুধু ঘোড়ার ঘাসই কেটে গেছে, এতোদিনেও কি তারা পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজটি মূলতঃ সম্পূর্ণ কোরে উঠতে পারেন নি? এ প্রশ্নের জবাব সুন্দরাইয়া অবশ্যই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু সিপিআই(এম)-এর মধ্যে বিপ্লব করতে প্রকৃতই আগ্রহী যে সব জংগী কর্মী আজও রয়ে গেছেন, তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, সুন্দরাইয়াকে প্রশ্ন করুন— ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কি একথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে নি যে, সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতিতে মূলতঃ মুনাফাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত মালিকানাতেই হোক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাতেই হোক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুনাফাই যদি অগ্রাধিকার পায়, উৎপাদনের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে মুনাফার নিয়মই যদি কার্যকর হয়ে যায়, তবে কি আর সেটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থাকে? সেটা কি তখন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় না? ঠিক যে যুক্তিতে ভারতের পাবলিক সেক্টর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হলেও সমাজতান্ত্রিক নয় বরং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ, ঠিক সেই একই যুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান অর্থনীতিকেও কি আমরা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ বলতে পারি না? এবং তারপরেও কি আমরা বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করতে পারি?

না, অবশ্যই পারি না। আর সে কারণেই বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন আর সমাজতান্ত্রিক নয়, সে দেশ শুধু মুখেই আজ সমাজতান্ত্রিক কিন্তু কাজে সাম্রাজ্যবাদী— লেনিন যার নাম দিয়েছেন 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী'। ব্রেজনেভ-কোসিগিন এবং সুন্দরাইয়াদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকেই এ সত্য আজ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে রূপের দিক থেকে। এদেরও অর্থনৈতিক ভিত্তি একচেটিয়া পুঁজিবাদ— তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন একচেটিয়া পুঁজিবাদ নয়, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম অনুসরণ কোরে এরাও চালাচ্ছে দুনিয়াকে ভাগাভাগি কোরে নেবার উন্মত্ত প্রচেষ্টা,

নির্ভর করছে তাদের বর্ধিত সামরিক শক্তির ওপর, প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে কাঁচামালের উৎস ও বাজারের জন্য, লড়াই চালাচ্ছে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চল বিস্তারের জন্য, এসব অঞ্চলের সস্তা শ্রমকে শোষণ করার অধিকার লাভের জন্য। এ কারণেই তারা মুখে 'উত্তেজনা-প্রশমন'-এর বুলি আউড়ে মরিয়া হয়ে বাড়িয়ে চলেছে অস্ত্রোৎপাদন ও অস্ত্রের-দুনিয়া-জোড়া ব্যবসা, বিনা দ্বিধায় অন্য দেশ আক্রমণ করছে, অন্য দেশের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ কোরে ভীতি প্রদর্শন করছে, অন্য দেশের শাসকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিয়ে সে দেশকে কব্জার মধ্যে আনবার চক্রান্ত চালাচ্ছে। এবং এসব থেকে এই সিদ্ধান্তটিই বেরিয়ে আসছে যে, সুন্দরাইয়া রুশ নয়া-জারদের পক্ষে যতোই ওকালতি চালান না কেন, বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটেই একটি সমাজতান্ত্রিক শক্তি নয়, বরং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতোই সে আজ একটি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি।

তিন

এবার তাহলে দেখা যাক, সুন্দরাইয়ার মতে ভারতে সোভিয়েত 'সাহায্য'-এর প্রকৃত চরিত্রটা কি রকম।

(এক) সুন্দরাইয়া দাবী করেছেন, ভারতের মতো দেশসমূহে সোভিয়েত অর্থনৈতিক 'সাহায্য' ''সাম্রাজ্যবাদের ওপর (এসব দেশের) নির্ভরশীলতা কমাতে'' সাহায্য করছে।

প্রথমতঃ, আগেই আমরা দেখেছি যে, বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ। কাজেই, একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করছে, এ যুক্তি হাস্যকর। দ্বিতীয়তঃ, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, তবে আমরা নিশ্চয়ই এটা আশা করতে পারি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শিল্প-বিকাশে 'সাহায্য' করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবে না, বা একচেটিয়া পুঁজির বিকাশে সাহায্য করবে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তব তথ্য কী প্রমাণ দিচ্ছে? সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে যৌথভাবে ভারত অ্যালুমিনিয়ামে, পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে ভারত হেভি ইলেকট্রিকস্-এ ও নিভেরি লিগনাইট কর্পোরেশনে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে, বৃটেনের সঙ্গে যৌথভাবে মাইনিং এণ্ড মেসিনারী কর্পোরেশনে, মার্কিণ ও ইতালির সঙ্গে যৌথভাবে অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ও ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে, এবং জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমন্টেস ও হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে পুঁজি বিনিয়োগ করছে। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন একচেটিয়া পুঁজির ক্ষেত্রেও একই রকম উদাহরণ মিলবে। বিড়লার হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়ামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে, এবং তাছাড়া টাটার অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং ও নিউ স্বদেশী মিলে, শ্রীরাম গ্রুপের উষা ফ্লাওয়ার এণ্ড জেনারেল মিলসে, ওয়ালচাঁদ গ্রুপের ওয়ালচাঁদ নগর ইণ্ডাস্ট্রিজে, বিড়লার ইলেকট্রিক্যাল

কনষ্ট্রাকশন ও ইকুইপমেন্ট কোং ও বিড়লা জুট মিলস্-এ, বাজাজ গ্রুপের মুকুন্দ ইণ্ডাষ্ট্রিজে এবং বিজু পট্টনায়েকের কলিঙ্গ ইণ্ডাষ্ট্রিজেও আজ সোভিয়েত 'সমাজতান্ত্রিক সাহায্য' আসছে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ সব থেকে কি এটাই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে না যে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যৌথভাবে, এবং বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠিরও স্বার্থে সোভিয়েত 'সাহায্য' কাজ করছে? এসব কি "সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা" কমানোর প্রমাণ দিচ্ছে? সুন্দরাইয়া সাহেব, ক্ষমতা থাকে তো এসব তথ্যের ভুল প্রমাণ করুন।

(দুই) সুন্দরাইয়া দাবী করেছেন, সোভিয়েত 'সাহায্যে' নির্মিত পাবলিক সেক্টরের শিল্পগুলিতে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো মালিকানা নেই", "ভারত সরকারই রয়েছে এগুলির মালিকানায়, নিয়ন্ত্রণে ও সম্পূর্ণ পরিচালনায়।"

বাস্তবে যদি তা-ই ঘটতো, তবে আমাদের কোনো আপত্তিই থাকতো না। কিন্তু আবার একটু তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। সাধারণভাবে, রাশিয়া ভারতের পাবলিক সেক্টরে যে 'সাহায্য' দেয়, তা দেয় 'প্রকল্প-বদ্ধ সাহায্য' (Projecet-tied Aid) হিসেবে— অর্থাৎ রাশিয়া কর্তৃক অনুমোদিত কোনো শিল্পসংস্থা বা প্রকল্পে 'সাহায্য' হিসেবে। আর এই প্রকল্পগুলির অধিকাশই হচ্ছে 'টার্ণ-কি' (turn-key) প্রকল্প— অর্থাৎ এগুলির গোড়াপত্তন থেকে শুরু কোরে যন্ত্রপাতি, উৎপাদন, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বিনিয়োগ, শিল্পের স্থান নির্বাচন, বন্টন ও পরিচালনা ব্যবস্থা পর্যন্ত সমস্তই থাকে রাশিয়ার হাতে। তাহলে কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, এইসব শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও সম্পূর্ণ পরিচালনা রয়েছে ভারত সরকারের হাতে? সুন্দরাইয়া সাহেবের তো এসব তথ্য অজানা থাকার কথা নয়! ভারতের পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বুর্জোয়া পত্র পত্রিকা বা সরকারী পরিসংখ্যান থেকে আমরা এখবরও জানতে পেরেছি যে, ভিলাই ইস্পাত কারখানার নির্মাণ বহুদিন শেষ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৬০ জন রুশ 'বিশেষজ্ঞ' রয়ে গেছে, পর্দার আড়াল থেকে তারাই সেখানকার উৎপাদন-সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়, প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট ভারতীয়রা তাদের নির্দেশেই সব কিছু করতে বাধ্য হয়; বোকারো ইস্পাত কারখানায় কিছু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগানোর সরকারী প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান কোরে এখনও পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৫০০ জন রুশ 'বিশেষজ্ঞ' রেখে দেওয়া হয়েছে, তারাই সেখানের সবকিছু চালাচ্ছে, এমন কি ব্যয় কমানোর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পর্যন্ত তারা প্রত্যাখ্যান করেছে; বোকারো, ভিলাই, মিগ কারখানা প্রভৃতি সমস্ত প্রকল্পগুলিতেই নাট-বল্টু-স্ক্রু থেকে শুরু কোরে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও 'স্পেয়ার পার্টস্'-ই আনতে হয় রাশিয়া থেকে, এবং তার ফলেই কারখানার নির্মাণ শেষ হয়ে গেলেও শুধু এসব স্পেয়ার পার্টস্-এর জন্যই ভারতকে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়; বোকারোতে রুশদের নির্দেশ অনুসারে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কোনো ইস্পাত তৈরী করা চলবে না, শুধু লৌহপিণ্ড (pig-iron) তৈরী হবে, আবার তার সবটাই রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে; ইত্যাদি

ইত্যাদি। এসব থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে যাচ্ছি না যে, ভারতের সোভিয়েত-সাহায্যে নির্মিত প্রকল্পগুলির মালিকানা কাগজে-কলমে ভারত সরকারের হাতে থাকলেও, এগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মূলতঃ রুশ শাসকচক্রের নির্দেশেই চলছে? সুন্দরাইয়া সাহেব, ক্ষমতা থাকে তো এসব তথ্যের ভুল প্রমাণ করুন।

(তিন) সুন্দরাইয়া দাবী করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু ভারত থেকে শুধু কাঁচা মালই কেনে না, উপরন্তু উৎপাদিত দ্রব্যও কেনে, অতএব ভারতে সোভিয়েতের সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিন্তু সুন্দরাইয়া সাহেব, আপনি কি আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নয়া কলাকৌশলগুলির পরিচয় পান নি? এককালে, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশের অর্থনীতিকে ব্যবহার করতো প্রধানতঃ কাঁচামালের যোগানদার, সস্তায় শ্রমের সংগঠক ও উন্নত শিল্প পণ্যের বাজার হিসেবে। কিন্তু আধুনিক যুগের জটিল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে আজকের দিনের নয়া উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশগুলিতে আগেকার শোষণের কায়দার সঙ্গে যোগ করেছে আরো নোতুন নোতুন কায়দা— তারা সেখানে আজকাল বিশেষ ধরণের কারখানা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে, মূলধনী যন্ত্র বিক্রি কোরে মুনাফা লোটে, সস্তা শ্রমকে শোষণ করে তৃতীয় কোনো অনুন্নত দেশের বাজারকে দখল করার জন্য সেই অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে, নিজের ওপর সেই দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সেই দেশের আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কোরে সেই দেশটিকে একটি প্রকৃত স্বাধীনতাবিহীন, সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ও গাঁটছড়া-বাঁধা নয়া উপনিবেশে পরিণত করে। সুন্দরাইয়া সাহেবেরই পার্টির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে নয়া-উপনিবেশবাদের এই নয়া-কৌশলের আলোচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু তিনি তো আর সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রযুক্ত হচ্ছে কি না, সে বিশ্লেষণ করবেন না, কাজেই সি.পি.আই(এম)-এর জঙ্গী কর্মীদের কাছে আবেদন, তারাই বিচার কোরে দেখুন, এক্ষেত্রেও কেমন চমৎকারভাবে এই নয়া-উপনিবেশবাদী কৌশল প্রযুক্ত হয়ে যাছে।

আজ পর্যন্ত রাশিয়া ভারতকে ১০০০ কোটি টাকারও বেশি সাহায্য হিসেবে দিয়েছে। মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতো ভারতকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পদানত করবার জন্য, প্রথমতঃ এই 'সাহায্য' বা ধারের জন্য রাশিয়া সুদ নিয়ে থাকে এবং সুদ ও আসল মেটাবার জন্য আবার ধার দিয়ে থাকে (রাশিয়া বর্তমানে ভারতকে প্রতিবছর 'সাহায্য' হিসেবে যদি ১০০ টাকা দিয়ে থাকে, তবে অন্ততঃ ১২৫ টাকা সে নিয়ে যায় সুদাসলে ধার শোধ-বাবদ— ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা : ১৯.৪.৬৮)। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়ার দেওয়া 'সাহায্য' টাকার অংকে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় রাশিয়ার পণ্যের মাধ্যমে (তা-ও আবার বেশি দামে)— এবং এভাবে ভারতকে রাশিয়ার পণ্যের

বাধ্যতামূলক ক্রেতায় পরিণত করা হয়। তৃতীয়তঃ, ধার শোধ করতে গিয়ে ভারতও রাশিয়াকে টাকায় সেটা শোধ করে না, শোধ করে ভারতীয় পণ্যের মাধ্যমে (তা-ও আবার কম দামে)। চতুর্থতঃ, ভারত-রুশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানি-মূল্য উদ্বৃত হলে, ভারত বাধ্য হয় সেই উদ্বৃত-মূল্য দিয়ে রাশিয়ার পণ্য কিনতে। এবং এইসব বিভিন্ন উপায়ে রাশিয়ার কাছে ভারত বাঁধা পড়ে গেছে, ও আরও বেশি যাচ্ছে, এক চিরস্থায়ী দাসত্বের বন্ধনে।

সি পিআই(এম)-এর কর্মীদের কাছে আবেদন, খোলা মন নিয়ে তারা উপরোক্ত প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত বাস্তব সিদ্ধান্তগুলিকে এবার বিচার কোরে দেখুন : (ক) ধার শোধ বাবদ ভারত রাশিয়াকে যে সব জিনিষ পাঠাতে বাধ্য হয়, তার অর্ধেকই কাঁচামাল (সুন্দরাইয়াও এ তথ্য স্বীকার করেছেন)। অর্থাৎ, ভারত রাশিয়ার কাঁচামালের বাধ্যতামূলক যোগানদারে পরিণত হয়েছে। (খ) ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে ধার-বাবদ রাশিয়ার পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে— অর্থাৎ ভারত রাশিয়ার বাধ্যতামূলক বাজারে পরিণত হচ্ছে। (গ) রূপান্তরীকরণ চুক্তি অনুযায়ী ভারত রুশ 'সাহায্যে' নির্মিত প্রকল্পগুলিতে রাশিয়ার দরকার মতো (কখনও বা রাশিয়ার কাঁচা মাল এনেই) দ্রব্য উৎপাদন করতে, এবং রাশিয়ায় সেগুলি রপ্তানি করতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন, রাশিয়া থেকে তুলো, পশম ও ইস্পাত এনে তুলোজাত, পশমজাত দ্রব্য ও স্ক্রু তৈরী কোরে রাশিয়ায় পাঠানো হচ্ছে— অর্থাৎ উৎপাদনের 'বিশেষীকরণ' নাম দিয়ে রাশিয়ার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের সস্তা শ্রমকে শোষণ করছে। (ঘ) রাশিয়া ভারতের পাবলিক সেক্টরে পুঁজি লগ্নী কোরে উৎপাদিত পণ্য ধার শোধ-বাবদ নিয়ে গিয়ে সেগুলিকেই আবার অন্য দেশে বিক্রি কোরে (কখনও বা ভারতে তৈরী সেই জিনিষগুলোর লেবেল পাল্টে 'রাশিয়ায় প্রস্তুত' লেবেল বসিয়ে— 'জার্ণাল অফ ইনডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড' : সেপ্টেম্বর '৬৮ : পৃষ্ঠা ১১০৭) মুনাফা লুটছে। (ঙ) রাশিয়া ভারতে 'টার্ণ-কি' প্রকল্প অনুযায়ী কারখানা স্থাপন কোরে তার পুঁজির ও যন্ত্রপাতির যোগান থেকে শুরু কোরে বন্টন ও পরিকল্পনা পর্যন্ত নিজেদের কব্জায় রেখে দিয়ে মুনাফা লুটছে ও সস্তা শ্রমকে লুট করছে। (চ) রাশিয়া তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে তার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিরই স্বার্থে (অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতির স্বার্থে নয়) ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করছে এবং এভাবে ভারতীয় পরিকল্পনাকে রুশ পরিকল্পনার লেজুড়ে পরিণত করছে। (ছ) রাশিয়া প্রধানতঃ ভারতের ভারী ও মূল শিল্পে পুঁজি খাটিয়ে (তা-ও আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে সহজে গণেশ উল্টাবার ভয় নেই) ভারতের অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলিকেই কব্জা কোরে নিচ্ছে এবং এভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে মূলতঃ তাদের ওপর চিরকালের জন্য নির্ভরশীল কোরে রাখছে। (জ) রাশিয়া ভারতে তাদের নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহের টেকনিক্যাল জ্ঞান পর্যন্ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়ে এসব শিল্পকে চিরকালের জন্য তাদের ওপর নির্ভরশীল কোরে রাখছে এবং শুধু তাই নয়, টেকনিক্যাল ফি বাবদ প্রচুর টাকা (এই বাবদ ভারত থেকে বিদেশে প্রেরিত টাকার ৪০ শতাংশ) দেশে নিয়ে যাচ্ছে।

.....এসব সত্ত্বেও যদি রাশিয়ার সাহায্যকে 'সমাজতান্ত্রিক সাহায্য' বলতে হয়, তবে একই যুক্তিতে মার্কিনী সাহায্যকেও কি 'সমাজতান্ত্রিক সাহায্য' বলে অভিহিত করতে হয় না? সুন্দরাইয়া সাহেব কি বলেন?

(চার) সুন্দরাইয়া দাবী করেছেন, ভারতের যেসব কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মেলে না, রাশিয়া নাকি ভারত থেকে সেই সব জিনিষই কিনে নিয়ে যায়। এই বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য কি সুন্দরাইয়া সাহেব দিতে পারেন? আমাদের মতো অজ্ঞজনেরা তাহলে উপকৃত হতেন। বাস্তব তথ্য কিন্তু অন্যরকম প্রমাণই দিচ্ছে। যেমন, বোকারোয় উৎপাদন শুরু হবার আগেই রাশিয়া উৎপাদিত সমস্ত লৌহপিণ্ড কিনে নেবার চুক্তি কোরে নিয়েছে; কিংবা রুশ সাহায্যে নির্মিত কারখানায় ৫০ লক্ষ টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিকল্পনা করার সময়েই রাশিয়া উৎপাদিত সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম কিনে নেবার চুক্তি কোরে নিয়েছে; কিংবা রূপান্তরীকরণ চুক্তি অনুসারে, ৫০০০ টন ইস্পাত ভারতে পাঠিয়ে তা দিয়ে এদেশে ৫০,০০০ টন স্ক্রু ও বল্টু তৈরী করিয়ে তার সবটাই কিনে নেবার বন্দোবস্ত কোরে নিয়েছে (ষ্টেটসম্যানস : ৭.৫.৭২); কিংবা রাশিয়া থেকে তুলো, উল, ইস্পাত ও জার্মান সিলভার পাঠিয়ে এদেশে তা দিয়ে জিনিষ তৈরী করিয়ে তার সবটাই কিনে নেবার চুক্তি কোরে নিয়েছে (ইকনমিক টাইম : ২-৮-৭২)। এসব থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে রুশ সাহায্যে নির্মিত প্রকল্পে উৎপাদন শুরু হবার আগেই রাশিয়া সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলো কিনে নেবার চুক্তি করিয়ে নিয়েছে। যে জিনিষ উৎপাদিতই হলো না, তা বিক্রির জন্য বাজারেই এলো না, তার বাজার নেই— এমন সিদ্ধান্ত কোথা থেকে পাওয়া গেলো? রাশিয়ার এসব লোকদেখানো ভালোমানুষী যুক্তিতে আস্থা স্থাপন সুন্দরাইয়ার মতো উকিলেরা করতে পারেন, কিন্তু দুঃখিত, আমরা তা পারছি না। সুন্দরাইয়া সাহেব কি ভাবেন, তথ্যবিহীন এসব যুক্তি দিয়েই তিনি সবাইকে তার মতো রুশ নয়া জারদের স্তাবক কোরে ফেলতে পারবেন?

(পাঁচ) সুন্দরাইয়া সাহেব দাবী করেছেন, রাশিয়া নাকি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বেশী দামে ভারত থেকে জিনিষ কেনে এবং কম দামে জিনিষ বিক্রি করে।

কিন্তু সুন্দরাইয়া সাহেব এ ব্যাপারেও কোনো তথ্য দেন নি! বাস্তবতঃ গোপন চুক্তিসমূহের যে সামান্য ছিটেফোঁটা বাইরে বেরিয়ে পড়ে, তাতে কিন্তু বক্তব্যের এই উল্‌টোটাই প্রমাণিত হয়ে যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অন্ততঃ ২০-৩০ শতাংশ বেশী দামে ভারতকে জিনিষ বিক্রি করে এবং ২৫-৩০ শতাংশ কম দামে ভারত থেকে জিনিষ কেনে। যেমন, ১৯৬৫ সালে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের পর রাশিয়া তার সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং ভারতীয় জিনিষের দাম কমিয়ে দেয়; এবং যেহেতু ভারত-রুশ বানিজ্য প্রধানতঃ টাকার অংকেই হয়, বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নই সেখানে ওঠে না, অতএব এই দাম পরিবর্তন অন্যায়— ভারত সরকারের এই বক্তব্যেও সে কান দেয় নি; আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে টন-পিছু ১০০ টাকা বেশি দামে রাশিয়া ভারতকে আগে নিউজপ্রিন্ট বিক্রি করতো, বর্তমানে

আন্তর্জাতিক নিউজপ্রিন্ট সংকটের সুযোগে সে টন-পিছু দাম প্রায় ১০০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে; আন্তর্জাতিক বাজারে রাশিয়ার মিগ-২১ বিমানের দাম ৬২ লক্ষ টাকা হলেও, ভারতে রুশ সাহায্যে নির্মিত এই বিমানের দাম পড়ে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং তার মধ্যে রাশিয়া থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতির দামই পড়ে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা; যে নিকেল রাশিয়া ইউরোপে বিক্রি করে প্রতি টন ১৫০০০ টাকায়, তাই সে ভারতকে বিক্রি করে ৩০০০০ টাকা দরে; ট্রাক্টরের স্পেয়ার পার্টস্ রাশিয়া ভারতকে বিক্রি করে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রায় তিনগুণ বেশি দামে; পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানি শুল্কের ৩০ শতাংশ এবং ইস্পাত রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ দাম রাশিয়া কম দেয়; ভারত যেখানে মার্কিণকে চিনি বিক্রি করে ৬০ পয়সায়, সেখানে রাশিয়া কেনে ৪২ পয়সায়; ৪০ হাজার টাকা উৎপাদন ব্যয় যে ভারতীয় ওয়াগনের, তাই রাশিয়া কেনে ২০ হাজার টাকায় (এবং এই ঘাটতি পুষিয়ে দেবার জন্য ওয়াগন প্রস্তুতকারী ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদেরকে ভারতীয় জনগণের টাকা থেকে ভর্তুকি দেয় ভারত সরকার)। প্রকাশিত এসব তথ্যই সুন্দরাইয়ার দাবীকে সম্পূর্ণতঃ নস্যাৎ কোরে দেয়— এবং রুশ-ভারত অসম বাণিজ্যের চেহারাটাকেই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট কোরে তোলে।

(ছয়) সুন্দরাইয়া দাবী করেছেন, "প্রত্যেক ভারতীয়ই জানেন যে সোভিয়েত-নির্মিত প্রকল্পগুলি বিশেষ সন্তোষজনক ফল দেখাচ্ছে।"

আমরা কিন্তু ঠিক এর উল্‌টোটাই জানি। যেমন, সোভিয়েত-নির্মিত মাইনিং এণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারী কর্পোরেশনে ১৯৬৯-৭২ সালে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৬.৩৫ কোটি টাকা; ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস-এ এই সময়ে এই পরিমাণ ৩.৭৯ কোটি টাকা। (বিনিয়োজিত পুঁজি যেখানে ৩.৪৯ কোটি টাকা); ভারত হেভি প্লেটস অ্যাণ্ড ভেসেলস-এ এই পরিমাণ ৩.১৫ কোটি টাকা (পুঁজি ৮.১৮ কোটি টাকা); ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে ১৯৭১-৭২ সালে ক্ষতির পরিমাণ ৬.৫৩ কোটি টাকা; রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিঙে মোট পুঁজি ১০০ কোটি টাকা, অথচ ১৯৬৩-৭০ সালে এর মোট উৎপাদন মূল্য যদিও মাত্র ১ কোটি টাকা, এই সময়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৫ কোটি টাকা, ১৯৭২-৭৩ সালেই ১৪.৫৪ কোটি টাকা; বোকারোর ১৯৭২-৭৩-এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৫ কোটি টাকা; নিভেল্লি লিগনাইট কর্পোরেশনে ক্ষতির পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের ২.০৭ কোটি থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৭২-৭৩-এ এসে দাঁড়িয়েছে ২.৬৪ কোটি টাকা। একেই কি বলে 'সন্তোষজনক ফল'।

আর যে সব যন্ত্রপাতি বা পার্টস্ রাশিয়া থেকে আসছে, তার মানও অত্যন্ত নীচু বা অনুপযোগী। যেমন, ভিলাইয়ে 'রিফ্রাক্টর' উপকরণ প্রতি টন উৎপাদনে যত পরিমাণ লাগে রাশিয়ায় এই একই উৎপাদনে ব্যবহৃত পরিমাণের তুলনায় তা প্রায় চারগুণ বেশি; রুশ ডিজেল ইঞ্জিন এতোই বাজে যে তা চালানোর খরচ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইঞ্জিনের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে এসব থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে সুন্দরাইয়ার দাবী বাস্তব তথ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য এই নির্মম সত্যটা

প্রকাশ কোরে দেবার অপরাধে সুন্দরাইয়া যদি আমাদের 'ভারতীয়ত্ব' সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ কোরে বসেন, তবে আমাদের বলবার কিছুই নেই।

(সাত) সুন্দরাইয়া সঠিকভাবেই বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক সাহায্য, ঋণ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক কোনো দুর্বলতর বা অনুন্নত দেশের কাঁচামাল, বাজার বা ইকুইটি পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু তার নিজেরই দেওয়া এই মাপকাঠিতে ভারতে সোভিয়েত 'সাহায্য'কে বিচার করতে গিয়ে আমরা কি ঠিক এর উল্টো ছবিটাই পাচ্ছি না? একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে "সর্বোচ্চ মুনাফার সন্ধানে অর্থনৈতিক আধিপত্য" প্রতিষ্ঠার যে চক্রান্তের কথা তিনি বলেছেন, ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক সেই চক্রান্তটাই কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যেখানে ভারতের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাইভেট সেক্টরে এই অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাবলিক সেক্টরে ঠিক সেই একই চক্রান্তই কি চালিয়ে যাচ্ছে না? সিপিআই(এম)-এর সৎ কর্মীগণ, বিচার করুন, সোভিয়েত 'সাহায্যে' পরিপুষ্ট ভারতের যে পাবলিক সেক্টর— যা সমগ্র ভারতীয় শিল্প-উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ— তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কোরে কী ধূর্ততার সাথে রুশ নয়া জাররা ভারতীয় অর্থনীতিকে নিজেদের কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছে, ভারতীয় রাজনীতি তথা সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারছে!

কিন্তু মজার কথা, সুন্দরাইয়া যাদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে মিথ্যেকে সত্য ও কালোকে সাদা বলে তুলে ধরতে চাইছেন, তারা নিজেরাই বলছে : সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে ধার বা সাহায্য দেয় নিজের "বাণিজ্যিক স্বার্থেই" (A. M. Smirnov : U.S.S.R. International Currency and Credit Relations. P. No. 275 —মস্কো থেকে প্রকাশিত); এসব ধার বা সাহায্য "এসব দেশে সোভিয়েত রপ্তানি বাড়াবার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করে.... আমাদের উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে এসব দেশের কাঁচামালের ক্রমাগত বিনিময়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে....এই সব দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ রপ্তানির ওপরেও তা বিশেষ প্রভাব ফেলে" (এ. কোদাচেংকো— মস্কোর মেঝ্দুনারোদ্নায়া ঝিঝ্ন পত্রিকা : ২য় সংখ্যা : ১৯৬২ : পৃ: ৫৫); এইসব 'সাহায্য' ও ধারের ফলে "সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে" (সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের ২৩তম কংগ্রেসে কোসিগিনের রিপোর্ট), "সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন আরো বেশি কোরে মেটাবার সম্ভাবনা সৃষ্ট হবে" (এস. স্ক্যাচকভঃ সোভিয়েত বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান)। এইসব উক্তির সংগে মিলিয়ে নিন লেনিনের শিক্ষাকে : "লগ্নী পুঁজি ঔপনিবেশিক নীতির অসংখ্য পুরাণো ফন্দির সংগে যোগ করেছে— কাঁচামালের উৎস সন্ধান, পুঁজি রপ্তানি, প্রভাবাধীন 'অঞ্চল' প্রভৃতির জন্য লড়াই.....সাধারণভাবে

বলতে গেলে, "অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের জন্য লড়াই" ('সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়')। ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণী প্রভৃতি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াই কি লেনিনের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যেরই জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হিসেব কাজ করছে না? এরপরেও কি রুশ নয়া জারদের পক্ষে সুন্দরাইয়ার ওকালতিকে 'নির্লজ্জ দালালী' আখ্যা দিলে ভুল হবে?

(আট) সুন্দরাইয়া চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, চীন নাকি ভারতে রুশ নয়া জারদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ভুল বক্তব্য রাখছে এবং ভারতের স্বতন্ত্র, জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতি দলের সাথে একই সুরে গলা মেলাচ্ছে! না সুন্দরাইয়া সাহেব, একটু ভুল হয়ে গেছে! আপনারা যেমন রুশ নয়া জারদের আড়াল কোরে শুধুমাত্র মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কেই তর্জন-গর্জন কোরে বাজার গরম করেন, ওই সব দলগুলিও ঠিক তেমনি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল কোরে শুধুমাত্র সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধেই চেঁচামেচি করে। চীন কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বা সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ— ভারতে এদের দুজনেরই শয়তানি চক্রান্তের বিরোধিতা করে— এবং সঠিকভাবেই। কাজেই, আপনার স্বভাবসিদ্ধ চীন-বিরোধী উদগারের মধ্যে যতো দুর্গন্ধই থাক, অন্ততঃ যুক্তির সারবত্তা যে নেই, একথা অতি বড়ো মুর্খের চোখেও ধরা পড়ে যাবে।

চার

যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে একটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে : সোভিয়েত 'সাহায্য' ভারতকে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলছে। সিপিআই সংশোধনবাদীরা পারছে না, সুন্দরাইয়া সাহেবও হাজার চেষ্টাতেও এই নির্মম সত্যটাকে আড়াল করতে পারবেন না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সুন্দরাইয়া সাহেবের কাছে একটি বিনীত প্রশ্ন তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে : মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল কোরে রুশ নয়া জারদের বিরোধিতা করার জন্য স্বতন্ত্র জনসংঘ-সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতিদেরকে যদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া হয় (এবং সঠিকভাবেই), তবে সেই একই যুক্তিতে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল কোরে শুধুমাত্র মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার জন্য সুন্দরাইয়া এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কেন 'দক্ষিণপন্থী' আখ্যা দেওয়া যাবে না? সিপিআই(এম)-এর মধ্যেকার বিপ্লব করতে আগ্রহী বন্ধুগণ, এ প্রশ্নটি কি একটু ভেবে দেখবেন?

অনীক, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

তুমি হাত ছুঁড়লেই গ্রেনেড

অজিত মুখোপাধ্যায়

তুমি হাত ছুঁড়লেই
গ্রেনেড
পা ছুঁড়লেই
ছিটকে পড়ে আকাশের তারা
প্রাণভরে তাকালেই
জল হয়ে যায় সব রহস্য
কে বলে তুমি মাত্র সাড়ে তিন হাত
সাড়ে তিন কোটি মানুষের শক্তি তোমার শিরায় শিরায়

তুমি যখন কাৎ হও
পৃথিবীটা হেলে পড়ে নৌকোর মতো
তুমি যখন গা-ঝাড়া দাও
ঝরে পড়ে দেহ থেকে নিজের কলঙ্ক,
বৃষ্টি থেমে যাবার পর
যেমন সামান্য বাতাসে ঝরে পড়ে
ঝাঁকড়া গাছগুলো থেকে অজস্র জলের ফোঁটা
তুমি যখন বসে পড়ো
রসাতলে ডুবে যায় সব
আর যখন এগিয়ে যাও
পেছিয়ে পড়ে ঝড়ের দাপট
যখন তুমি উঠে দাঁড়াও
ভেঙে পড়ে চুরমার হয়
শত্রুতার বিশাল পাহাড়
তুমি হাত ছুঁড়লেই
গ্রেনেড
পা ছুঁড়লেই
ছিটকে পড়ে আকাশের তারা
প্রাণভরে তাকালেই
জল হয়ে যায় সব রহস্য
তুমি কথা কইলেই
পোকামাকড় পর্যন্ত কান পাতে

তুমি গান গাইলেই
সমস্ত ঝর্ণা ও নদী পাখী ও সমুদ্র
নিজেদের গান-বাজনা থামিয়ে
চুপচাপ শোনে তোমার গান
আর যখন তোমাকে আঘাত করে শত্রু
খেপে ওঠে পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক
তুমি যখন জ্বলে ওঠো
সরে দাঁড়ায় সূর্য
দ্যাখে বড়ো বড়ো চোখ মেলে
তোমার আগুনে কী অসহ্য তাপ
দ্যাখে কেমন নিখুঁতভাবে
জ্বালিয়ে দাও নিজেদের সমস্ত বিপদ
তুমি যখন ধাক্কা মারো
ভেঙে যায় সবচেয়ে কঠিন দরোজা
ঘুণে ধরা তক্তার মতো
সবেগে চালাও যদি পা
খানা-খন্দ গর্ত-খাদ
এবং অসম্ভবেরও বুক ভেদ কোরে
জেগে ওঠে সহজ সড়ক
তুমি হাত ছুঁড়লেই গ্রেনেড
পা ছুঁড়লেই ছিটকে পড়ে আকাশের তারা
প্রাণভরে তাকালেই জল হয়ে যায় সব রহস্য

কোনো প্রকারের দুঃখ সুখ হয়ে ওঠে
তোমার হাতের কৌশলে
মৃত্যুকে কোরে তোলো সম্পূর্ণ নীরব
তোমার কাজের কৌশলে
আর যুদ্ধের কৌশলে
হুবহু তোমার স্বপ্নের ধাঁচে
যে কোনো মুহূর্তে বদলে দাও দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে
যা দ্যাখা যায় তাকে
এবং যা দ্যাখা যায় না তাকেও
তুমি হাত ছুঁড়লেই গ্রেনেড
তুমি পা ছুঁড়লেই ছিটকে পড়ে আকাশের তারা
প্রাণভরে তাকালেই জল হয়ে যায় সব রহস্য।।

অনীক ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

লক্ষ কাস্তে চাই

সূর্য চট্টোপাধ্যায়

সারা দেশ জুড়ে রক্তচোষার ঘাঁটি
লক্‌লকে জিভে রক্ত করছে পান
রক্তচোষার রক্তে ভেজাতে মাটি
চাষীভাই আজ কাস্তেতে দাও শান।

তোমার আমার রক্তজলের অর্থে
রক্তচোষারা চেয়ে দেখো আজ লাল
অথচ আমরা নরকের কালো গর্তে
ডুবে থেকে শুনি আশ্বাসে ভরা চাল!

আমাদের শিশু এখানে পারে না বাঁচতে
অধিকার তার বাঁচার এ দেশে নেই
চোখ মেললেই মৃত্যু নাচতে নাচতে
ছুটে আসে তাই হিংস্র পশুর ছন্দেই।

সয়ে সয়ে আজ ধৈর্যের বাঁধ লুপ্ত
মাথা নত কোরে আর তো রবো না ভাই
এ দেশ মোদের—এ দেশ করতে মুক্ত
একসাথে আজ লক্ষ কাস্তে চাই।।

হে-হে!

ধূর্জটি চক্রবর্তী

আমি এক অর্ধপ্রতিষ্ঠ কবি,
পূর্ণ প্রতিষ্ঠার আশায় ভাসি ডুবি।
সৃষ্টিময়ী মুক্ত লেখনী বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ-রহিত
কালজয়ী—শিল্পের জন্যই শিল্প—রচনায় ব্যাপৃত।

কানাগলির নির্মল প্রেমকাহিনী ছাড়াও
বাজারী-অর্ধবাজারী পত্রিকা সর্বত্র
প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কিছু কিছু কখনও কখনও
দারিদ্র্য, তার নির্বোধ অসহায়তা ইত্যাদিতে
চোখের জল না ফেললে লোকে চেনে না,
বাজারী খ্যাতি প্রতিষ্ঠা হয় না।
সর্বোপরি মালই কাটে না।

ফলতঃ
যেখানে দোষী কেবল গুটিকতক ছোটোখাটো ব্যক্তি,
সেখানে কখনও-সখনও দারুণ প্রগতিশীল কিছু করি,
না— সরকার বাহাদুরকে ছোঁওয়া নেহাৎই ধৃষ্টতা।

নিজেকে জাহির করতে
পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেই হবে!
ক্ষুধাকে পুঁজি কোরে প্রথমাবস্থায় প্রগতিশীল-মানবতাবাদী হও,
দেখাও—ক্ষুধা আর তথাকথিত প্রেম উভয়ই অক্ষয়,
শুধু তাই নয়, শেষ বিচারে যৌনতারই হবে জয়!
কিন্তু সংগ্রামের কথা পাবে না কোথায়ও।

তারপর পসার গুছিয়ে
যে-কে-সে—
ভোল পাল্টে সোজা সরকারী শিবিরে!
হে-হে।।

অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

ক্রমাগতভাবে শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হতে হতে ভারতের ব্যাপক জনতা আজ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছেন, বারবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছেন। নিজেদের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, তখন প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ কোরে রাষ্ট্রশক্তির লাঠি ও বুলেটকে পর্যন্ত তাঁরা আজ তুচ্ছ করছেন, রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তিতে স্থিতাবস্থার অচলায়তন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছেন। দেশের প্রতিটি প্রান্তে, গ্রামে-শহরে, আজ জনতার এই দীপ্ত রোষই বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ফুঁসে উঠছে, গজরাচ্ছে, পথ খুঁজছে।

এই চরম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কিন্তু এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বিভিন্ন স্তরের যেসব 'গণ-সংগঠন'-এর মধ্যে আছেন, সেই সব তথাকথিত গণ-সংগঠনের প্রায় প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো পার্টির লেজুড় হিসেবে কাজ করছে, যান্ত্রিকভাবে পার্টিগুলির নেতৃত্ব ও লাইন সেখানে চাপিয়ে দেওয়া আছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্টি ও গণ-সংগঠনের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা উচিত, তা সেখানে নেই— এক কথায়, প্রকৃত গণ-চরিত্রই এদের নেই। তাই আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি— অসংখ্য পার্টির অসংখ্য 'গণ-সংগঠন', কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, এবং তার ফলে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'শতকরা ৯৫ জনকে' ঐক্যবদ্ধ করার যে মহান আহ্বান আমরা প্রায়ই কথায় কথায় দিয়ে থাকি, তা শুধু শ্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, কার্যকর আর হচ্ছে না।

একারণেই এদেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আজ, নিজেদের মধ্যে বহুবিধ রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও, বিভিন্ন আশু কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত মোর্চা গড়ে তুলবার কথা ভেবে দেখবার সময় এসে গেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী, ভারত-চীন মৈত্রীর দাবী, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, সামন্তবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী অপ-সংস্কৃতির বিরোধিতা, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা প্রভৃতি কর্মসূচীর ভিত্তিতে এরকম যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলাটা আজ মোটেই অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব ও জরুরী। এই আশু দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হলে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কাছে আমরা কি জবাবদিহি করবো, সেকথা কি আজকের সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবীরা ভেবে দেখবেন না?

অনীক, মার্চ ১৯৭৪

সুন্দরাইয়ার বিপ্লব-চর্চা!

তরুণ রায়

সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সুন্দরাইয়া আবার একখানা তত্ত্ব বাজারে ছেড়েছেন, এবং এবারে বিষয়বস্তু অনেক বেশি চমকপ্রদ। "ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ধারণা" ('Our Conception of the Indian Revolution'—People's Democracy পত্রিকা/১৭ই ফেব্রুয়ারী'৭৪)। তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রবন্ধ থেকে 'শিক্ষনীয়' অনেক কিছুই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং সেজন্য শ্রীযুক্ত সুন্দরাইয়া অবশ্যই আমাদের 'অভিনন্দন' দাবী করতে পারেন! কিন্তু তাঁর এই আলোচনা পড়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন আমাদের উঁকিঝুঁকি মারছে। সবিনয়ে প্রশ্নগুলি একে একে তুলে ধরছি :

(এক) সুন্দরাইয়া সাহেব বলেছেন, "ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা জমিদারী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছে", গণ-আন্দোলনে তারা যদি ক্ষমতাচ্যুত হবার মতো অবস্থায় পড়ে, তবুও তারা এই গাঁটছড়া ছিঁড়বে না, বরং "তাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে।" আর ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়ারাই বরং একদিকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদিকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের চাপে পড়ে জনগণের পক্ষে যোগ দেবে। খুবই সঠিক ব্যাখ্যা, কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করবে না।

কিন্তু সুন্দরাইয়া সাহেবের উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে যে, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সুস্পষ্টভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। অপ্রধান অংশ, অর্থাৎ ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়ারা, সুন্দরাইয়ারই ব্যাখ্যা অনুসারে, জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু প্রধান অংশ, অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়ারা তা নয়, বরং তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ ও তাদের ওপর নির্ভরশীল। তারা যদি জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্রবিশিষ্ট না-ই হয়, তবে তারা কি? সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল আধা-উপনিবেশিক ভারতের শাসকশ্রেণী এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা কি মুৎসুদ্দি চরিত্রবিশিষ্ট নয়? সুন্দরাইয়া সাহেব, আপনারই ব্যাখ্যা থেকে বেরিয়ে'আসা এই সিদ্ধান্ত কি আপনাদের পার্টির কর্মসূচীর (যাতে ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের 'মুৎসুদ্দি' বলতে অস্বীকার করা হয়েছে) বিরোধিতা করছে না? এ প্রশ্নটির জবাব পেলে আমরা খুশি হবো।

(দুই) সুন্দরাইয়া সাহেব বলেছেন, তাঁদের পার্টি শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের 'পার্টিজান' যুদ্ধ এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের অভ্যুত্থান— এই দুইয়ের সমন্বয়েই ভারতীয় বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারে।

কিন্তু প্রথম প্রশ্ন : কৃষকদের এই 'পার্টিজান' যুদ্ধ কোন্ ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হবে? চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলে কৃষি-বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাবার পথকে সুন্দরাইয়া যান্ত্রিকভাবে নস্যাৎ কোরে দিয়েছেন, কিন্তু 'পার্টিজান' যুদ্ধের ভিত্তি হিসেবে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প পথ বাৎলাতে পারেন নি। বিকল্প পথ তুলে না ধরে, চীনের শিক্ষাকে ভারতের কেন্দ্রীভূত ও উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থার অজুহাতে নাকচ কোরে দিলেই কি লোকে তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করবে? বরং যে তেলেঙ্গানার কথা তিনি উল্লেখ কোরেও ব্যাখ্যা করেন নি, সেই তেলেঙ্গানাই আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে প্রমাণ কোরে দিয়েছে যে, ভারতের বুকেও মুক্তাঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করা ও দীর্ঘদিন ধরে তাকে টিকিয়ে রাখা যায়। শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানার লড়াই যে ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ এই নয় যে, তেলেঙ্গানার পথ ভুল ছিলো, বরং এই যে, সুন্দরাইয়া সহ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দই পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে সেই লড়াইকে দুর্বল কোরে দিয়েছিলো। কাজেই সুন্দরাইয়া সাহেব ভারতীয় জনগণের লড়াইয়ের বিপ্লবী ঐতিহ্য ও শিক্ষাকে চেপে দিয়ে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলে কৃষি-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ও সম্প্রসারিত করার সঠিক পথকে নস্যাৎ করার যতো চেষ্টাই চালান না কেন, ধোঁয়াটে বক্তব্য দিয়ে তিনি চিরকাল বাজার গরম করতে পারবেন না।

(তিন) সুন্দরাইয়া সাহেব বলেছেন, কৃষকদের পার্টিজান যুদ্ধের দু'টি স্তর আছে : প্রথম স্তরে আংশিক দাবী আদায় করতে হবে, এবং দরকার হলে সশস্ত্র পদ্ধতিতে এইসব আদায়ীকৃত অধিকারকে রক্ষা করতে হবে; দ্বিতীয় স্তরে, শাসকশ্রেণীকে উৎখাত কোরে ক্ষমতা দখল করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

খুব ভালো কথা! কিন্তু সুন্দরাইয়া সাহেব, আপনার পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ীর কৃষকেরা তো আপনার বর্ণিত প্রথম স্তরের লড়াই-ই শুরু করেছিলেন, গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকেরা সেখানে ভূমি-সংস্কারের পথে এগিয়েছিলো এবং দরকার হয়েছিলো বলেই অস্ত্র হাতে লড়াই করতে পিছু-পা হন নি। তবে কেন আপনাদের যুক্তফ্রন্ট সরকারের 'বিপ্লবী' পুলিশ সেই সংগ্রামী কৃষকদের ওপর গুলি চালিয়েছিলো, কেনই বা আপনারা সেই সংগ্রামী কৃষকদের ও তাঁদের নেতাদের হঠকারী আখ্যা দিয়ে দল থেকে বের কোরে দিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে, আপনার 'বিপ্লব চর্চা'-কে আমরা যদি ভাঁওতাবাজী বলে আখ্যা দি, তবে কি অন্যায় করবো?

(চার) সুন্দরাইয়া সাহেব পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়েও বলেছেন, তাঁরা পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন, কেননা এর ফলে "জনগণের স্বার্থরক্ষার কিছু সুযোগ পাওয়া যাবে, কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের কাজে অংশ নেওয়া যায়, এবং শান্তি, গণতন্ত্র, ও সামাজিক অগ্রগতির লড়াইয়ের জন্য জনগণকে সংগঠিত কোরে তোলা যাবে।" সাধু প্রস্তাব। লেনিন কিন্তু আমাদের শিখিয়েছেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থার আওতার মধ্যে থেকে, বা কোয়ালিশন সরকার গঠন কোরে, জনগণের কোনো মৌলিক স্বার্থই রক্ষা করা যায় না— সেই সরকার সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হলেও, বা তার

মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ হলেও। তিনি বরং একথাই বলেছিলেন যে, কমিউনিষ্টরা বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তা জনগণের কোনোরকম স্বার্থরক্ষার ভাঁওতা দিয়ে পার্লামেন্টারী পথ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মোহ তৈরী করার জন্য নয়— বরং পার্লামেন্টের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটাকেই জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুন্দরাইয়া সাহেবরা মুখে পার্লামেন্টারী পথের বিরুদ্ধে যতোই তর্জন-গর্জনই করুন না কেন, আসলে তাঁরা লেনিন-বর্ণিত ভাঁওতাবাজীর পথেই পার্লামেন্টকে 'ব্যবহার' করছেন, এবং পার্লামেন্টের সম্পর্কে লোকের মনে মোহ তৈরী করছেন। একে কি আমরা কার্যতঃ পার্লামেন্টারী পথেরই অনুসরণ বলতে পারি না?

আবার অন্য দিক দিয়ে বিচার কোরে দেখুন! সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পার্লামেন্টারী পথের মৌখিক বিরোধিতা কোরে সুন্দরাইয়া কৃষকদের পার্টিজান যুদ্ধ ও শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের সমন্বয় ঘটাবার পথ বাৎলেছেন, কিন্তু পার্টিজান যুদ্ধের ভিত্তি কি হবে, সে সম্পর্কে কোনোরকম আলোকপাত করেন নি। শুধু তাই নয়, পার্টিজান যুদ্ধের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে শাসকশ্রেণীকে আশ্বস্ত কোরে দিয়ে বলেছেন : "একে আজ বাস্তবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না", এর অনেক দেরী আছে, সুদূর ভবিষ্যতে ওসব যুদ্ধ-টুদ্ধ হবে, এখনই আমরা ওসব করতে যাচ্ছি না! তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? সুন্দরাইয়া সাহেবরা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পার্লামেন্টারী পথের বিরোধিতা করেন— কিন্তু 'আপাতত'! পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ করেন, এবং এভাবে জনগণের কিছু স্বার্থরক্ষার 'প্রতিশ্রুতি' দেন! তাঁরা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সশস্ত্র পথকে তত্ত্বগতভাবে সঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু তার রণনীতি ও রণকৌশলকে ধোঁয়াটে বক্তব্যের আবরণে ঢেকে রাখেন, এবং 'এখনই' এই সশস্ত্র লড়াই শুরু না করার প্রতিশ্রুতি দেন! এই দুই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটা তাহলে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, তাঁরা মুখে যতোই সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা বলে বাজার গরম করুন না কেন, আপাততঃ তারা পার্লামেন্টারী লড়াই নিয়েই ব্যস্ত থাকছেন এবং থাকবেন! আর সশস্ত্র লড়াই? সে পরে যখন হবে, তখন দেখা যাবে। বাহবা, বাহবা, সুন্দরাইয়া সাহেব! সিপিআই-মার্কা পার্লামেন্টারী পথে এদেশের লোকেরা যখন আর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না, তখন আপনারা তাদেরই বিকল্প শক্তি হিসেবে অতীব ধূর্ততার সাথে গরম গরম বুলির আড়ালে সেই একই পার্লামেন্টারী লাইনকেই ফেরি কোরে বেড়াচ্ছেন।

(পাঁচ) সুন্দরাইয়া সাহেব নিদান দিয়েছেন, "পার্টিজান যুদ্ধকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না— যেমনটা করে নকশালপন্থীরা।"

এসম্পর্কে প্রথম বক্তব্য : বকলমে পার্লামেন্টারী পথের যাত্রী সুন্দরাইয়া সাহেবের মুখে এমন কথা সাজে না। কারণ, পার্টিজান যুদ্ধ কার সঙ্গে সমার্থক এবং কার সঙ্গে সমার্থক নয়, সে বিচার করার অধিকারী একমাত্র তাঁরাই, যারা মুখে পার্টিজান যুদ্ধের কথা বলে কাজে পার্লামেন্টারী পথকে অনুসরণ করেন না। যেহেতু সুন্দরাইয়ারা এর ঠিক উল্টোটাই করছেন, কাজেই পার্টিজান যুদ্ধ সম্পর্কে 'জ্ঞান' ভারতীয় জনগণ সুন্দরাইয়া সাহেবদের কাছে কোনোমতেই নেবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, নকশালপন্থীরা গত সাত বছরে অবশ্যই অনেক ভুল করেছেন, এবং সেই ভুলের দাম তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়েই দিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র তাঁরাই পার্লামেন্টারী পথের ভাঁওতাবাজীকে মুখে ও কাজে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের পথকে অনুসরণ করার অবিচল ও নিরলস প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কর্মনীতিতে যে 'বামপন্থী' বিচ্যুতি এসেছিলো, এভাবেই তা শুধরে নিয়ে গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হবার সংগ্রাম তাঁরা আজ চালিয়ে যাচ্ছেন, ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তাধারার তত্ত্বকে প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এসব খবর সুন্দরাইয়ারা জানেন না তা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নকশালপন্থীদের প্রতি কুৎসা বর্ষণ করার কাজে ক্ষান্ত হচ্ছেন না। অবশ্য তাতে একটু অসুবিধেও আছে, কেন না সিপিআই (এম)-এর মধ্যে যে অসংখ্য সৎ, জঙ্গী ও বিপ্লব-করতে আগ্রহী আছেন, তাঁরা যদি সশস্ত্র লড়াইয়ের জঙ্গী বুলির আড়ালে সুন্দরাইয়াদের পার্লামেন্টারী পথটাকে ধরে ফেলেন, তবে তাঁদেরকে আর আটকে রাখা যাবে না, তাঁরাও তাহলে তত্ত্বে ও প্রয়োগে ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক দিক্‌নির্দেশকে অনুসরণ করতে শুরু করবেন— এবং তাতে সুন্দরাইয়াদের সাধের তাসের ঘরটাই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সুন্দরাইয়ারা আজ 'বিপ্লব-চর্চা'র দিকে একটু বেশি বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন একটাই : ইতিহাসের সুস্পষ্ট গতিনির্দেশকে তাঁরা কি রুখতে পারবেন?

একটি বিবৃতি

সম্প্রতি আমাদের দেশের বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকায় এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো যে, সম্প্রতি দিল্লীর কাছেই কোনো এক জায়গায় নাকি সিপিআই (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে নাকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— এবার থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম ও পার্টির সংগঠনিক গোপনতার ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে না। এই খবরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে **সিপিআই (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সত্যনারায়ণ সিং** সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়েছেন। 'Frontier' পত্রিকার গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে সেটি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি—

সম্প্রতি দিল্লীর কয়েকটি সংবাদপত্রে সিপিআই (এম-এল)-এর সাধারণ সম্পাদকের নামে প্রকাশিত একটি বিবৃতির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে যে, সিপিআই (এম-এল) এবার থেকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখবে। এই বিবৃতির সঙ্গে সিপিআই (এম-এল)-এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং বস্তুতঃ এটা পার্টির সামগ্রিক লাইনেরই বিরোধী। বিবৃতিটির অবস্থানই হচ্ছে সংশোধনবাদী। মনে হচ্ছে এই বিবৃতিটি যিনি দিয়েছেন, সিপিআই (এম-এল)-এর সেই তথাকথিত সাধারণ সম্পাদকটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন পোষ্য ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নন, এবং তিনি তার প্রভুদের নির্দেশে পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করতে চাইছেন।

অনীক, মার্চ ১৯৭৪

শ্বাপদ-সংক্রান্ত

শৈবাল মিত্র

একলক্ষ শূয়োরের বাচ্চাকে
জন্ম দেওয়ার পর
একটি শূয়োরী লালকেল্লার দিকে সোজা চলে গেলো।

রাস্তায় সে নিশ্চয়ই জন্ম দিয়েছিলো
আরো কয়েক লক্ষ শাবক,
তা না হলে সমাজতন্ত্রের নামে
এতো হুংকার শুনি কেন চারিদিকে!
মৃত গলিত পচা শব আর বারুদের গন্ধ
কঙ্কালের বীভৎস নাচ
আর আকাশে ধূর্ত শকুনের তীক্ষ্ণ হাসি—
সমাজতন্ত্র আর বসন্ত এসে গেলো কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে।

রাস্তায় গুলিবিদ্ধ কোকিলের লাশ
শূয়োরী একলাফে লালকেল্লায় পৌঁছে গেছে!

অনীক, মার্চ, ১৯৭৪

লিন পিয়াও এবং আমরা

বিবেক গুপ্ত

আজকের দুনিয়ায় বিশ্ব-বিপ্লবের প্রধান দুর্গ সমাজতান্ত্রিক চীন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীলরা নানারকম কুৎসা রটাবে বা চীন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবে— এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মজা লাগে তখন, যখন দেখি, নিজেদের বিপ্লবী বলে দাবী কোরেও, বা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তথা মহান নেতা মাও সেতুঙের নামে জয়ধ্বনি দিয়েও, কেউ কেউ ঠিক একাজটাই করার চেষ্টা করে। অন্ততঃ বর্তমানে এ প্রচেষ্টাটাই আমাদের দেশে বেশ সুপরিকল্পিতভাবে চলছে।

গত বছর আগষ্ট মাসে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির দশম জাতীয় কংগ্রেসে লিন পিয়াওকে "বুর্জোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, চক্রান্তকারী, দু'মুখো ব্যক্তি, দলত্যাগী ও দেশদ্রোহী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, চীনে প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং চেয়ারম্যান মাওকে হত্যা করার জন্য তার কুৎসিৎ চক্রান্তের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে, তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, এবং বর্তমানে সমগ্র চীন জুড়ে লিন পিয়াও'র প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিরাট গণ-সমালোচনার জোয়ার বয়ে চলেছে। দশম কংগ্রেসে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, লিন পিয়াও চক্রকে বিধ্বস্ত করাটা "দেশের ও বিদেশের শত্রুদের প্রতি এক প্রচণ্ড আঘাত।" তাই আজ দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে শুরু কোরে দেশ-বিদেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই লিন পিয়াও'র ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে চীন-বিরোধী কুৎসার ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের কী করা উচিত? লেনিন ও স্তালিনের যুগে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতি সমর্থন না বিরোধিতাই যেমন অন্যান্য দেশের বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে ব্যবধানের অন্যতম মাপকাঠি ছিলো, ঠিক তেমনি আজকের যুগে মাওসেতুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতাই হচ্ছে এই ব্যবধানের অন্যতম মাপকাঠি। আজকের যুগে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা, যাঁরা চীনকে বিশ্ব-বিপ্লবের প্রধান দুর্গ মনে করেন, এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে মহান, গৌরবময় ও সঠিক বলে মনে করেন—তাঁদের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে : লিন পিয়াও সম্পর্কে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তকে

জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যা কোরে বোঝানো—ঠিক যে কাজটা করছে আলবানিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, রুমানিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটি মহান বিপ্লবী পার্টি বলে মেনে নিলে, চীনের পার্টি যাকে 'প্রতিবিপ্লবী' বলে চিহ্নিত করছে তাকে 'প্রতিবিপ্লবী' হিসেবেই দেখাটা একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার, একটা নীতিগত প্রশ্ন। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা ঠিক এটাই দাবী করে যে, একটি পার্টি অন্য কোনো ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না, হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অন্য কোনো পার্টির অনুসৃত কোনো নীতি সম্পর্কে বা গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে, সুস্পষ্ট ধারণার অভাব থাকতে পারে— এবং সে সব প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই করার চেষ্টা চালাতে হবে, কিন্তু তা হবে পারস্পরিক ভিত্তিতে, দুই পার্টির মধ্যে। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বস্ত কোনো পার্টি প্রকাশ্যতঃ অন্য একটি বিপ্লবী পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে না, করা উচিত নয়। এবং ঠিক একারণেই লিন পিয়াও সম্পর্কে চীনের পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করাটাই একটা অমার্জনীয় অপরাধ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু ভারতে আমরা কী দেখছি? এখন কিছু লোক, যারা নিজেদের 'বিপ্লবী' বলছেন এবং চীনের পার্টিকে বা চেয়ারম্যান মাওকে 'মহান' বলছেন, তারাই আবার চীনের পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কোরে লিন পিয়াওকে 'মহান' বলছেন, তার নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছেন, তার তত্ত্বকে 'নির্ভুল' আখ্যা দিচ্ছেন, এবং লিন পিয়াও'র প্রদর্শিত পথে ভারতীয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে, চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক লিন পিয়াও ভারতীয় বিপ্লবকে পথ দেখাবে? এর চেয়েও হাসির কথা আর কী হতে পারে। কিন্তু এটা শুধু হাসিরই ব্যাপার নয়, গভীরভাবে চিন্তা করারও ব্যাপার। দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, লিন পিয়াওরা "হাতে একখণ্ড 'উদ্ধৃতি' পুস্তক ছাড়া কখনও প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হতো না, 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলা ছাড়া আর কিছুর জন্য মুখ খুলতো না, এবং মুখে মিষ্টি কথা বলে পেছন থেকে ছোরা মারতো।" ভারতের লিন পিয়াও-ওয়ালাদের সম্পর্কেও কি ঠিক একই কথা আমরা বলতে পারি না? তারাও হাতে 'উদ্ধৃতি' পুস্তক নিয়ে "চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ" বা "মহান, গৌরবময় ও নির্ভুল চীনের পার্টি জিন্দাবাদ" ধ্বনি তুলছেন, এবং এসবের আড়ালে তাদের চীন-বিরোধিতা বা মাওসেতুং-বিরোধিতার চক্রান্তকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন। সামান্য সৎসাহস থাকলে, কাপুরুষ না হোলে, তারা লিন পিয়াওকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যেই চীনের পার্টি বা মাওসেতুঙের বিরোধিতা করতেন।

লিন পিয়াও'র ষড়যন্ত্র বিধ্বস্ত হওয়ায় দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা বড়ো দুঃখ পেয়েছে, আঘাত পেয়েছে। ভারতের এই সব তথাকথিত বিপ্লবীরা কি তাদেরই দলে ভিড়ে যাচ্ছেন না? সচেতনভাবে যাঁরা এদেশে প্রতিবিপ্লবী লিন পিয়াও'র হয়ে ওকালতি

করছেন, তাঁরা কি আজ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে চীনের পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন না? স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কোরে তাঁরা কি আজ চেয়ারম্যান মাও তথা চীনের পার্টির বিরোধিতাই করছেন না? মুখে চেয়ারম্যান মাও তথা চীনের পার্টির জয়ধ্বনি কোরে, কিন্তু কার্যতঃ চীন তথা সমাজতন্ত্র তথা বিশ্ব-বিপ্লবের শত্রু লিন পিয়াও'র পক্ষে ওকালতি কোরে, তাঁরা কি আজ 'ভারতের লিন পিয়াও' হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত কোরে দিচ্ছেন না? এভাবে তাঁরা কি আজ মেকী লাল পতাকা দিয়ে প্রকৃত লাল পতাকার বিরোধিতা করছেন না?

যাঁরা সচেতনভাবে এসব কাজ করছেন, এসব প্রশ্নের জবাব দেবার দায় তাঁদের অবশ্যই নেই। কিন্তু যাঁরা প্রকৃতই ভারতীয় বিপ্লবকে ক্রমাগত বিজয় অর্জনের পথে নিয়ে যেতে চাইছেন এবং সব কিছু ত্যাগ কোরেও বিপ্লবী পথে অবিচল থাকতে চাইছেন, কিন্তু অসচেতনভাবে না বুঝে 'ভারতের লিন পিয়াওদের' এই চীন-বিরোধী তথা মাও-বিরোধী চক্রান্তে সামিল হয়ে পড়েছেন, তাঁরা— তাঁরা কী গভীরভাবে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজবার চেষ্টা করবেন না? সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" শ্লোগানের প্রবক্তা (চীনের পার্টি নিজেই যে শ্লোগানের বিরোধিতা করেছে) 'ভারতের লিন পিয়াওরা' যে কার্যতঃ নিজেরাই 'চীনের চেয়ারম্যান' সেজে বসতে চাইছেন, চীনের পার্টি তথা চেয়ারম্যান মাও-এর ওপর খবরদারি ও অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করার কুৎসিৎ চক্রান্তে মেতেছেন— এটা কি তাঁরা উপলব্ধি করবেন না? রাশিয়ার ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভদের মতো চীনের লিউ শাওচি-লিনপিয়াওদের শেষ আশ্রয়স্থলও যে ইতিহাসের আবর্জনা স্তুপেই, এবং ভারতের লিনপিয়াও-রাও যে সেই একই লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে— একথাটা কি তাঁরা ভেবে দেখেবেন না? ইতিহাসের থেকে তাঁরা যদি শিক্ষা না নেন, তবে ইতিহাসও যে তাঁদের ক্ষমা করবে না— এই নির্মম সত্যকে তাঁরা কি ভুলে যাবেন?

অনীক, এপ্রিল ১৯৭৪

হাজার হাজার রক্তপতাকার মতো

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুধুই কি লবন উধাও? লবন চাইতে, এখন চোখের জল দিয়ে
দুর্ভিক্ষের ভাত
হাপুস-হুপুস ক'রে খেয়ে যাওয়া! শুধু তাই?

কোথায় চোখের জল? সব জল ক্ষুধার আগুনে
বাষ্প হয়ে, সব কান্না এখন বাতাসে মিশে
মেঘের গম্ভীর নির্জনতা!

কোথায় বা দুর্ভিক্ষের অন্ন?
আজ ভাত চাইতে শুধু খুন! দেখি পাড়ায় পাড়ায়
উলঙ্গ শিশুর হাত, হাজার হাজার রক্তপতাকার মতো
উর্ধে স্থির...।।

অনীক, এপ্রিল, ১৯৭৪

হারু ডোমের গপ্পো

অমল মজুমদার

জন্ম, মৃত্যু, আলো, অন্ধকার— সেই আদিমকালের মানুষকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলতো। বিশাল চেহারা হিংস্র জানোয়ারগুলোর সাথে লড়াই করতে করতেই মানুষ এগুলো ভেবেছে। আর কি ভয়ানক আশ্চর্য— সে যুগেই তারা আবিষ্কার করেছিলো, মানব-সমাজের ইতিহাসে সেই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার— মৃতের সৎকার। মানুষ তো মরেই যাবে, তার মরদেহ টেনে জঙ্গলে ফেলে দিলেই তো হয়? কিংবা জলে ভাসিয়ে? বরাহনগরের শত শত মৃতদেহ তো গঙ্গাতেই ভাসিয়ে দিলে শুকুনগুলো! মেকং দিয়ে আজও ভেসে যায় হাত-পা বাঁধা মানুষের দেহ। আধুনিক যুগে। তোমরা তো ইতিহাস পড়েছো পাঠক। জালিয়ানওয়ালাবাগের হাজার লাসগুলোর কী হয়েছিলো ভাই?

সেই আদিমকালে হয়তো জলে ভাসিয়েই কিংবা জঙ্গলে ফেলে দিয়েই শুরু হয়েছিলো ইতিহাস। জানিনা কী কোরে তারা চিনলো কবর কিংবা চিতা। তবে খুব সম্ভব "মানুষকে ভালোবাসো"— মানব-সমাজ ভিত্তির এই প্রথম স্বতঃসিদ্ধই তাদের চিনিয়েছে, চিতা, কবর। আজও হারু ডোমেরা সেই দায়িত্ব পালন কোরে চলেছে, শ্মশানের কোলে বসে; কিংবা কবুল মিঞা, কবর-খানার দোরে দাঁড়িয়ে।

খুব সম্ভব হারু ডোমকে তোমরা চেনোনা। না চেনারই কথা। তোমরা আজও মরো নি— তাই চিনবে কেমন কোরে? তোমাদের অতীতের ওই হাজার হাজার পূর্বপুরুষ— যারা এখন স্বর্গের মাঝখানে বসে সময়হীন দিন যাপন করছে, তারা সবাই কিন্তু হারুর কথা গিয়ে বলেছে— ভগবানের কাছে— পারাপারের মাঝি হারুর কথা। অন্ততঃ হারু এমনটিই ভাবে।

হারুর চেহারা ভারী দেখার মতন। কালো কুচ্‌কুচে লম্বা প্রায় ছ' ফুট। ঝাঁক্‌ড়া চুলের গোছা— তবে অতি যত্নে তৈরী করা, যেমনটি তোমরা কলকাতার পথে ঘাটে দ্যাখো তেমন নয়। কৃত্রিমতার সাথে এদের পরিচয় বড়ো কম। চোখ দুটো বড়ো বড়ো— বড়ো সরল। সকাল-সন্ধ্যে তাড়ি খায়। বিশাল কাঠের বোঝা নিয়ে তাই গুদোম থেকে চিতায় যেতে তার একটুও পরিশ্রম হয় না। শব আসার কোনও বিশেষ সময় তো নেই— তাই সব সময়েই হারুকে পাওয়া যায়। কখন ঘুমায়, কিংবা খায়, কে জানে?

হারু ডোমের ছেলের নাম নবীন। জন্মের দিন কয়েক বাদেই মা মরে যায়। মা-মরা নবীন শ্মশানের মড়াগুলোর মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। মৃত্যুর সাথে ছোটোবেলা থেকেই বড়ো আলাপ

জমেছে ওর। শব-সাধনা। বাপের সাথে থাকতে থাকতে লাস চিনেছে। শুকনো নাকি চর্বি। লাসের দাহ্যতা সম্পর্কে ওদের ভাবনা খুব স্পষ্ট। মড়া পোড়ানো পোড়া কাঠ আর ফেলে যাওয়া কাঁচের চুড়ি, ফুলের মালা নবীনের খেলনা। পাগলা দাশু-সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, লালসালু, মাথায় চুলের জটা, পায়ে, ছেঁড়া জুতো যে বাঁশি বাজায়, সেই ওর খেলায় নিত্য সাথী। লুকোচুরি খেলার ফাঁকে ছুটে পালাতে গিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছিলো একদিন শ্মশান-পুরোহিত নরহরিকে। থাব্ড়া খেয়ে সেদিন প্রথম শিখেছিলো— সে ডোমের ছেলে। সকাল-সন্ধ্যে তাড়ি খেয়েও হারু কিন্তু নবীনকে শিখিয়েছে বামুনের মড়া প্রণাম করতে, না ছুঁয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে।

হারু তার ছেলেকে ভীষণ ভালবাসে। ওর চেহারার সাথে ভালবাসা খাপ খায় না, তবুও। ওর বড়ো সাধ, ছেলেকে লেখাপড়া শেখায়। উপার্জন তার খুবই কম। কলকাতার মতো শহরে সে বাস করে— গঙ্গার তীরে। এবং এই শ্মশান করপোরেশনের দায়িত্ব হলেও বোধ নেই। কার্যত এদের নির্ভর করতে হয় মড়া যারা পোড়াতে আসে, তাদের দানের উপর। মড়া তো সবাই পোড়াতে জানে না। কিভাবে চিতা সাজিয়ে নিতে হয়, কিংবা কতোটা পোড়া হলে কুঁকড়ে-যাওয়া মড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেয়...... বেগুন পোড়ানোর মত!

এই চলে আসছে.....এই তাড়ির আস্বাদে হাজার হাজার মৃত নিয়মিত সৎকার হয়ে চলেছে...... এদের প্রধান খাদ্য তাড়ি.....তাড়ির ফুড্ ভ্যালু কতো ভাই?.....কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চলে আসছে.....

হারু তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। তাই ডোমের ছেলে নবীন যায় স্কুলে। লেখাপড়া শিখতে।

নবীন স্কুল ফাইন্যাল পাস করলে, হারুর ইচ্ছে ছিলো, সে চাকরী করে। সে ইচ্ছে নবীনেরও ছিলো। বহু চেষ্টা কোরেও কিন্তু চাকরী পায় না নবীন। চাকরীর বাজার বড়ো মন্দা। বেশ কিছু জায়গায় যাতায়াত, দরখাস্ত এবং কয়েকটা জায়গায় ইন্টারভিউ দেবার পর ক্লান্ত হয়ে আবার শ্মশানেই সে ফিরে আসে।

এই চাকরী না পাওয়াটা অবশ্য হারুকে খুব বিচলিত করে নি। তার ছেলে মেট্রিক পাশ করেছে— এটাই মস্তো কথা। জাত-ব্যবসা মড়া পোড়ানো, সে তার ছেলে করবে, এর মধ্যে হাঁ হবার তো কিছু নেই। তবুও তার ছেলে পাশ, লেখাপড়া জানে! সকাল বিকেল তাড়ি খেলেও হারু কথাটা কিছুতেও ভোলে না। নবীন আবার শ্মশানে ফিরে আসে, লাস পোড়ায়।

আসলে ছোটোবেলা থেকে লাস পোড়া ধোঁয়ায় বাতাস টেনে টেনে নবীন বড়ো হয়েছে। ওর ফুসফুসের কোণায় কোণায় জমা হয়ে আছে অনেক লাসের গন্ধ। ধব্ধবে কলকাতার পরিষ্কার বাতাস ওর ঠিক সহ্য হয় না। যেন অল্পেতেই সর্দি হয়। তাই বুড়ো বাপকে একটু রেহাই দেয় এবার। তা হলে হবে কি? দুটো পেট তো সমানেই তাড়ি গেলে.....তবে?

দিন কয়েক আগে একদল শবযাত্রীর সাথে গোণা ডোমের খুব ঝগড়া বেধেছিলো।

পাইকপাড়ার দিক থেকে এই শুকনো মড়াটা এসেছিলো। মড়ার সাথে আরও কিছু মড়া এসেছিলো— শালা। এসেই ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। আরে বাবা—শ্মশানে এসেছো— বড় কঠিন জায়গা। চিতা সাজানো পর্যন্ত গোণার দায়। তারপর তোমরা করো। আধপোড়া মড়া— এখন গোণার কাছে এসে বলে— মড়া পুড়ছে না। পুড়বে কি— সারা লাসে জল। এমনিতে সব লাসেই জল থাকে— এ শালা মরার আগে জল খেয়ে নিয়েছিলো নাকি? চিতা নিভে গেছে— আনাড়ী সব। এখন গোণা যাবে লাস জ্বালাতে। তার জন্য কিছুই দেবে না? বলে— তোমরা শ্মশানে আছো কেন?

তাইতো গোণা। শ্মশানে তোমরা আছো কেন?

জাত-ব্যবসা যে!

দোকানদার বিশু তখন ছোট ছোট ভাঁড়ে চা বেচায় ব্যস্ত ছিলো। গোলমালে মাথাটা বাড়িয়ে দেখে। আর একটা লাস সধবা মধ্যবয়সীর লাস এসে পৌঁছে গেলো। একদল গঙ্গায় স্নান সেরে গামছা ঘাড়ে, কাঁপতে কাঁপতে খোস মেজাজে গপ্পো করতে করতে, একটুখানি গোলমালের দিকে চেয়ে গেলো। ঝগড়া কিন্তু চলছেই। গোণা খেপে লাল। একটা প্রশ্নের জবাব ওর কিছুতেই জুটছে না। ওরা শ্মশানে আছে কেন?

মড়ার মধ্যে জীবনধারণ করা বড়ো কঠিন ব্যাপার। এইভাবে পয়সা রোজগারেই ওদের চলে। এই আধপোড়া মড়াগুলো কি অদ্ভুত কৌশলে গোণারা দুমড়ে মুচড়ে দেয়। নিভে যাওয়া চিতায় আবার আগুন জ্বালায়, সব জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের ফুল্‌কি, মড়া পোড়ার গন্ধ, বীভৎস ধোঁয়া— সবই ওদের স্বাভাবিক। কিন্তু না খেয়ে থাকাটা তো স্বাভাবিক নয়। কেন না গোণারা জীবন্ত মানুষ।

শেষ অবধি হাঙ্গামা মিটে গেলো। মিটে গেলো, কেন না একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে কাঁদছিলো। তার বাপের মড়া। কিন্তু কাঁদছিলো বলে নয়। প্রাণপণে নিভে যাওয়া চিতায় সে আবার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছিলো।

এইভাবেই চলে আসছে। হারু ডোম, গোণা ডোম, হারুর ছেলে নবীন ডোম— সবাই আছে। মড়া পুড়ে চলেছে।

নবীনের চালচলন সম্প্রতি হারুর চোখে কেমন যেন ঠেকে। সকাল-সন্ধ্যে তাড়ির মধ্যেই হারু নজর করে। নবীন তার সহকর্মীদের সাথে অনেক কথা বলে। কথা বলার ঢংটা একটু বিচিত্র ধরণের। কথা বলার সাথে সাথে তার হাত নড়ে। যেন কিছু বোঝাতে চাইছে। হারু তার ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসে। সাধারণতঃ বাপ ছেলেকে ভালোই বাসে। তবে এই ভালোবাসাকে কেন্দ্র কোরে অনেক আশা এবং আশানুরূপ গড়ে তোলার যে আকাংখা থাকে, হারুর তা নেই। সে বরং অত্যন্ত সাধাসিধেভাবে আর পাঁচটি ডোমের মতোই নবীনকে দেখতে চায়। যেন এটাই স্বাভাবিক। তাই নবীনের চালচলন সে গভীরভাবে লক্ষ্য করে। এবং অচিরেই আবিষ্কার করে, নবীন একটা ব্যাপারে খুবই উত্তেজিত। তা হলো— তারা কর্পোরেশনের কাজে যুক্ত থাকলেও, তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কর্পোরেশন নেয় নি। বস্তুতঃ জাত-কর্তব্য বলেই যেন ওরা এদ্দিন মড়া পুড়িয়েছে।

হারু ভাবে— এটা খুবই ন্যায্য। কিন্তু এতে করার কিছুই নেই। শুধু হাঙ্গামা। করপোরেশন তাদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় মাইনে দিয়ে একজন দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারীর সুযোগ-সুবিধা কোরে দেবে— এ অলীক কল্পনা। হারু জানে— এতে কিছুই করার নেই— শুধুই হাঙ্গামা। আরও স্পষ্ট কোরে বললে বলা যায়— হারু ভাবে— এতে আর কারোর কিছু করার থাকলেও, নবীনের কিছুই করার নেই। হারু তার ছেলেকে কিছুতেই হাঙ্গামায় জড়াতে দেবে না।

আর তাই ছেলেকে ডেকে ধমকের সুরে সে বিকেলবেলা বললো— এসব কিছু করার দরকার নেই। বলেই তাড়ি খেতে চললো। তবুও নবীন বলে— "এ চলতে পারে না"

তার সাথে সুর মেলায় গোণা— "এ চলতে পারে না!" এইভাবে সবাই মিলে জড়ো হয়। এ কিছুতেই চলতে পারে না। তাড়ি খেতে খেতে এক কালের ডোম-সর্দার ছয় ফুট হারু লম্বা হয়ে দাঁড়ায়। তার কানে পৌঁছায় এ আওয়াজ। সামান্য যন্ত্রণা হয় যেন। মনে মনে বিড় বিড় করে, "না, এ কিছুতেই চলতে পারে না!"

সন্ধ্যেবেলায় নবীনকে সে রীতিমত ধমকে বলে, "না, এ কিছুতেই চলতে পারে না। ওসব হাঙ্গামা ছাড়্। এ কিছুতেই না!"

হারু বুঝতে পারে ওরা আন্দোলনের কথা ভাবছে। একটা আন্দোলন হারুও চায়। কিন্তু নবীন না। ও থাক। তার চোখের সামনেই থাক। পাশ করেছে তাঁর ছেলে। এর চেয়ে বড়ো আর কী? ডোমের ছেলে ডোম হবে— এতে আর কী? আন্দোলনের কথায় তাই হারু ঘেমে ওঠে।

ডোমেরা কিন্তু জোট বাঁধছে। নবীন মধ্যিখানে। হারু ডোমের পাশ করা ছেলে হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। শবযাত্রীদের কাছে ভিক্ষে কোরে তারা জীবনধারণ করবে না। ওরা চায়— ওদের আর্থিক দায়িত্ব করপোরেশন নেবে। এ ওদের দাবি। এ গোণার দাবি, নবীনের দাবি— সবার দাবি। এ মহাশ্মশানের দাবি!

ধীরে ধীরেই চলতে থাকে আন্দোলনের প্রস্তুতি। কিন্তু হারু ভাবে— এ কেমন হলো? আন্দোলন হবে? কার বিরুদ্ধে? নবীন বলে— "কর্তৃপক্ষ!" হারু বলে— "কর্তৃপক্ষ তো ভগবান! পাঠিয়েছে আমাদের এই দায়িত্ব দিয়ে। তোমরা ভগবানের কাছে নালিশ করবে.....এ আবার কী কথা?" নবীন বলে— "আমরা যাবো করপোরেশনে আমাদের কথা বলতে।"

শনিবার তারা মিছিল কোরে চলে করপোরেশনে। দাবি জানাতে। শ্মশান থেকে মিছিল চলে শহরের বুকে। হাজার মানুষ চমকে চায়— তাই তো! মড়াগুলোকে ফেলে দিয়ে আসতাম শ্মশানে। শ্মশানেই এসে মৃত্যুমিছিল শেষ হতো। সেখান থেকে জীবন্ত মানুষের মিছিল তো আসতে দেখি নি!

হারু এসে বারবার কোরে নবীনকে বলে না যেতে। নবীন তবুও যায়। বলে পেছনে থাকতে। নবীন সামনে থাকে। বিকেলটা হারু বড়ো চিন্তায় কাটালো। হারুর একটাই ছেলে নবীন। যদি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু হাঙ্গামা কিছু হলো না। রাজা ওদের দাবি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। বলেছেন— এর বিহিত হবে। তাই খুব মজা। ওরা ফিরে আসে আবার ওদের আস্তানায়, শ্মশান চত্বরে। লাস আসে, কাঠ আসে, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, চিতার আগুন মানবদেহ জ্বালিয়ে দিয়ে শেষ রেখে যায় নাভিমূলে— জীবনকেন্দ্রে— ওঁ ধ্বনিকম্পনে। চারিদিকে ক্রন্দন, ধোঁয়া, ফুল.... বৈচিত্র্যের বিচিত্র সমাহার। ক্রমাগত হরিবোল ধ্বনি।

এইভাবে চলেছে.....এইভাবে চলে আসছে। নবীন, গোণা, হারুর দল এইভাবে দিনের পর দিন মড়ার সাথে দিন কাটিয়ে চলেছে।

তরুণ পাঠক! তুমি তো জানো.....শ্রমিক তোমার কাছে মহামূল্যবান সম্পদ। কৃষক তোমার প্রিয় বন্ধু। তুমি তো তাদের কথা শুনেছো, ভেবেছো....। কিন্তু এ ডোম। সমাজের মহা উৎসবে যার ভূমিকা, মাটির নীচের অন্ধকারে যখন দুধের শিশুর মুখে তাড়ির গেলাস, বালকের হাতে গাঁজার কলকে তুলে দিয়ে চীৎকার কোরে বলতে চায়— না! না! না! তাড়ি-গাঁজা কখনই ক্ষুধার খাবার হতে পারে না— তুমি কী বলবে?

নবীন গোণার সাথে গলা মিশিয়ে তুমিও বলবে— "না! এ কিছুতেই হতে পারে না!" যখন তোমার সামনেই মৃত শিশুর দেহ গলতে শুরু করবে? মানব দেহ পচতে দেওয়া মানবতার শ্রেষ্ঠ অসম্মান।

তাই রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি যখন গঙ্গার ঘোলা জলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো, যখন আরও কয়েক হাজার মানুষের মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, আবার নবীন-গোণা ভাবতে শুরু করে। হারু আবার চিন্তিত হয়।

সবশেষে শুরু হয় শ্মশান-কর্মী ধর্মঘট। ডোমরা ঠিক করেছে, তারা আর কাজ করবে না। তাদের দাবি বড়ো ভীষণ দাবি। তাদের দাবি— কর্পোরেশনকে তাদের সুস্থ কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে। নবীন-গোণারা সকাল থেকে বসে আছে। মৃতেরা একে একে সারি বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে পথে। মুহূর্তে সর্বত্র পড়েছে ভীষণ বিভীষিকার ছায়া। শবযাত্রীরা আতংকিত। আতংকিত কলকাতা।

আতংকিত হারুও। জীবনে সে এই প্রথম দেখছে ধর্মঘট। নবীনের কাছে সে এসে বলে— "নবীন, এই ধর্মঘট করা ঠিক হচ্ছে না বাপ্।"

নবীন বলে— "না করাটাই এদ্দিন ঠিক হয়নি।"

হারু বলে— "এতে হাঙ্গামা হবে।"

নবীন বলে— "হাঙ্গামা হলে কাজ হবে।"

হারু বলে— "লোকে কষ্ট পাচ্ছে।"

নবীন বলে— "মড়া কষ্ট পায় না।"

হারু বলে— "তুই লেখাপড়া শিখেছিস। এসবের মধ্যে তুই কেন?"

নবীন বলে— "আমি ডোমের ছেলে ডোম। আমার বাপের পরিচয় ভুলতে পারবো না।"

হারু সন্ধ্যেবেলায় তাড়ি খাবার কথাও ভুলে গেছে। কতো লোক বসে আছে মড়া

নিয়ে। কেউ যায় এখানে ওখানে, কেউ প্রিয়জন বিয়োগ ভুলে যায় কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে। কী ভীষণ! হারু ভাবে— কী ভীষণ!

গোটা একটা দিন চললো এই ধর্মঘট। সন্ধ্যেবেলো খবর আসে শ্মশানে। রাজার খবর। রাজা বলেছেন— ডোমেরা ধর্মঘট তুলে নাও, দাবি মেনে নেওয়া হবে।

নবীন ভাবে, গোণা ভাবে। সবাই বসে ভাবে। শেষে সবাই মিলে রাজার খবর চিতায় জ্বালিয়ে দেয়।

হারু ভাবলো— তাইতো, নবীন কেন এমন করে! রাজা তো বলেইছে, দাবি মেনে নেবে। তবুও কেন ধর্মঘট! বিশাল মৃত্যু-মিছিল সামনে দাঁড়িয়ে, কাঁদছে সবাই। হারু দেখছে আর ভাবছে— আর সবাই যা কিছু করুক, নবীন তার ছেলে, লেখাপড়া জানে, সে কেন এমন করে.....! যদি সত্যিই কোন হাঙ্গামা হয়।!

হারু জিজ্ঞেস করে নবীনকে, "দাবি তো মেনে নেবে বলেছে রাজা?"

নবীন বলে "প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, চুক্তি করে নি।"

আবার হারু ফিরে যায়। হারু তাড়ি খাওয়া ভুলে গেছে।

পরদিন বিকেল হয়। সবাই এসে জড়ো হয়। মিছিল।

এবার মিছিল চলেছে রাজার কাছে। দাবি মেনে চুক্তি করো, তবে ধর্মঘট তুলে নেবো। নইলে নয়। হারু এসে বারবার বলে নবীনকে— "না, তুই যাস নি, হাঙ্গামা হবে।" নবীন তবুও যায়......।

রাজপ্রাসাদের সামনে মিছিল এলে পুলিশ আসে। লাঠি দিয়ে ডোমের মিছিল আটকে দেয়। রাজামশাই-এর হুকুম, তার রাজ্যে ধর্মঘট করা চলবে না। ধর্মঘট চললে পর দাবির কথা শুনবে না রাজা। বাবা, রাজা ভীষণ রাগী!

নবীন বলে— আমরা রাজার সাথে দেখা করতে চাই। পুলিশ বলে— না! রাজার হুকুম, ধর্মঘট করলে রাজা দেখাই করবে না। নবীন বলে— আমরা রাজার কাছে আমাদের দাবির কথা শুধু বলতে চাই। পুলিশ বলে— না! রাজার হুকুম, ধর্মঘট করলে রাজা কথা শুনবে না। রাজা ভীষণ রাগী।

এইভাবে কিছুক্ষণ চললে পর পরিস্থিতি হঠাৎ পরিবর্তিত হলো। হলো, কেন না শ্মশান-কর্মীরা ক্রমাগত আবেদন করা সত্ত্বেও রাজার কাছে পৌঁছোবার কোনও পথ পেলো না। পেলো না, কেন না রাজা ধর্মঘটীদের সাথে কথা বলতে নারাজ। নারাজ এরাও ধর্মঘট তুলে নিতে। এই রকম একটি অবস্থা। হঠাৎ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত শকুনগুলো লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিছিলে। সে ভয়ানক কাণ্ড।

শকুন মড়ার মাংস খুটে খুটে খায়। জীবন্ত মানুষকে ভুলে মড়া মনে করেছে। শ্মশান থেকে জ্যান্ত মানুষেরও যে মিছিল হয়, শকুনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত তো নেই। ঘাড় বেঁকিয়ে শকুনি দৃষ্টি তাই ভুল দেখেছিলো। ভুল দেখেছিলো, কেন না মুহূর্তে সমস্ত অঞ্চল পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। ছোটো থেকেই মড়া দেখে দেখে মরার ভয় এদের কেটে গেছে।

শেষ অবধি পুলিশ গুলি ছুড়লো। সোজা সেই গুলি এসে বিধে গেলো নবীন ডোমের

হৃৎপিণ্ডে। মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় বিদ্রোহ করেছিলো। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পিচের রাস্তায় রক্ত দিয়ে লিখে দিলো তার বীরের মৃত্যু ঘোষণা।

হাজার মড়া পোড়ানো গোণা জীবনে এই প্রথম মানুষ মরতে দেখলো। খুন আর খুন দুই-ই। চিতায় মড়ার শরীর যখন জ্বলে, রক্ত জ্বলতে দেখেনি সে কখনও। শরীরে এত রক্ত যদি থাকে, মড়া পোড়ে কী কোরে? গোণা স্তব্ধ।

হারু খবর পায়। ছুটে আসে। পিচের রাস্তায় নবীন ডোমের দেহ গুটিয়ে পড়ে আছে। ঘিরে আছে হাজার ডোমের দল। ডোমের দল মড়াই পোড়ায় শুধু, মড়া সাজায় নি তো? হারু এসে দাঁড়ায়। এই তিন দিন তার বারবার অনেক অলুক্ষুণে কথা মনে পড়েছে। এই মুহূর্তে কিছু আর মনে পড়ছে না। চুপ কোরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর পিচের রাস্তার উপর নিজের মাথাটি জোরে ঠুকতে থাকে। কোনও কথা নেই, শুধু দুই কঠিন বস্তুর সংঘর্ষের কর্কশ ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দ। হাজার ডোমের দল নীরব। হারুর মাথা ফেটে রক্ত বেরোয়, সেই রক্ত লুটিয়ে-পড়া নবীনের বুকের রক্তে মিশে যায়। হাজার ডোমের দল লক্ষ্য করে বিস্ময়ে— দুই রক্তই লাল। তাই খেয়াল হয় গোণার। ছুটে যায়, হারুকে ধরে। ধরে নিয়ে যায় শ্মশানে। মৃত নবীনকেও যে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, এটা ওরা এখনও বুঝতে পারছে না। তাই জ্যান্ত হারুকে ধরে নিয়ে যায় শ্মশানে।

সন্ধ্যের দিকে নবীনের মড়া সাজানো হলো। আরও কত ডোম ভীড় করেছে সেখানে। ফুল দিয়ে সাজিয়েছে নবীনকে। কত ব্যবস্থাই না করেছে তারা। হারুর ছেলে নবীনকে ওরা সাজিয়ে নিয়ে চলে আবার শ্মশানে।

বিরাট মিছিল। মিছিলের সামনে সাজানো মৃতদেহ। কলকাতার লোকে শ্মশানে মৃতকে নিয়ে যায়, এরা নিয়ে আসছে। রাস্তার লোক দেখছে, ডোমের দল ফিরছে তাদের ডেরায়। বোধ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ওই দূরে ওই মহাশ্মান। ওইখানে চিতা জ্বালানো হয়। নবীনের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশান-কর্মীর দল ধীরে ধীরে এগোয়। দূরে হারু দাঁড়িয়ে।

তিনদিন পর বুঝি আজ হারু আবার তাড়ি খেয়েছে। ছয় ফুট লম্বা বিশাল দেহ ভয়ংকর চেহারায় দাঁড়িয়ে সামনে। চোখ দুটো চিতার আগুনের মতো জ্বলজ্বলে। হঠাৎ বিকট চীৎকার কোরে ছুটে আসে হারু। থমকে যায় মিছিল। কী ভীষণ মূর্তি হারু ডোমের আজ! ডোমের বুকেও এত শোক জমা হতে পারে?

হুংকার দিয়ে ওঠে হারু— "খবরদার!"

চমকে মিছিল আবার তাকায় হারুর দিকে।

হারু বলে— "না! কিছুতেই না। এ লাস পুড়তে আমি দেবো না। ধর্মঘট ভাঙতে আমি দেবো না।"

মিছিল দাঁড়িয়ে যায়।

হারু ডোম ধর্মঘট ভাঙতে দেয় না।

অনীক, মে, ১৯৭৪

মে-দিনের কবিতা

তড়িৎ চৌধুরী

দুনিয়া-কাঁপানো আগুন-ঝরানো আজ সে দিন
হতাশার কালো মেঘ যতো ছিল সব বিলীন
হে'র মার্কেটে মিছিলে মিছিলে
রক্তে ঘামেতে অশ্রুতে মিলে
সর্বহারার দৃপ্ত ঘোষণা আজ সে দিন—
রক্তে রক্তে জাগে কল্লোল ডাকে মে-দিন।

শ্রমিকের তাজা রক্তে-রাঙানো এই মে-দিন
দেশ থেকে দেশে আগুন ছড়ায় আঁধার ক্ষীণ
পড়ে পড়ে আর মার খাওয়া নয়
কাঁধে কাঁধ দিয়ে আসে বরাভয়
জনতার মুখে বিদ্যুৎবাণী শংকাহীন—
রক্তে রক্তে জন-কল্লোল ডাকে মে-দিন।

আমার দেশের কোটি জনতার শুধতে ঋণ
গ্রামে ও শহরে পথ খুঁজে খুঁজে কেটেছে দিন
রক্ত ঝরার অবিরাম ধারা
তবু বারবার প্রাণের ইসারা
আকাশের কোণে বিদ্যুৎ আনে ঝড়ের দিন—
রক্তে রক্তে আজও কল্লোল ডাকে মে-দিন।

লড়াইয়ের মাঠে পথ বেঁকে গেছে অনেক দিন
হতাশায় বুকে তবু পদাঘাত আশা রঙীন
ব্যর্থতা আনে নব আশ্বাস
জনতার দলই রচে ইতিহাস
তাইতো লড়াই দুর্বারগতি অন্তহীন—
জনতাই আনে পথের ইসারা সামনে দিন
আকাশ-কাঁপানো পদধ্বনিতে তাই নবীন
মৃত্যুদূতেরা সামনে দাঁড়াক
তবুও আমরা করি না ফারাক
পেরোবো সাগর পাহাড় হাজার মৃত্যুহীন—
রক্তে রক্তে রণ-কল্লোল ডাকে মে-দিন।

অনীক, মে, ১৯৭৪

ফিরে আসবো

সব্যসাচী দেব

ফিরে আসবো, আমরা, ফিরে আসবো।
যারা, হারিয়ে গিয়েছিলাম,
কেউ বারাসতের রাস্তায়,
কেউ জেলখানার আড়ালে,
কেউ বরানগরে, দমদমে, বহরমপুরে—
ফিরে আসবো, সবাই।

ঘাস-বীজেরা মাটির গভীর থেকে ফিরে আসে তৃণ হয়ে,
রোদ ফিরে আসে কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে,
ফিরে আসে মৃত পূর্বপুরুষেরা
নবজাতকের নিষ্কলুষ হাসিতে।
আমরা ফিরে আসবো।
শব্দের গতি মন্থর হয়ে আসে বেগবতী নদীর সামনে;
শঙ্খচিল ডানা মেলে ধরে মহাদিগন্তে,
নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ পেরিয়ে
কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দৌড়োতে থাকে
একজন অপু,
পোড়া তরকারী আর কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া রুটি হাতে,
তার চোখের মণিতে তবু প্রতিবিম্ব ফেলে জীবন।

আমরা ফিরে আসবো, কেননা—
একদিন মানুষ তার ধারালো অস্ত্রে পরাভূত করবে মৃতজকে,
একদিন হেমন্তের উৎস থেকে গতি পাবে বসন্তের নদী,
একদিন অতীতের অন্ধ গর্ভ থেকে জেগে উঠবে হিরণ্যদ্যুতি ভোর—
সেদিন, ফিরে আসবো,
আমরা,
ফিরে আসাবো।

অনীক, মে, ১৯৭৪

কেন এই বিশেষ সংখ্যা?

'অনীক'-এর বর্তমান সংখ্যাটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, এই বিশেষ সংখ্যার দরকার ছিলো। এবং সে সম্পর্কে প্রথমেই আমরা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অবহিত করাতে চাই।

সাম্রাজ্যবাদ আজকের দুনিয়ার প্রতিটি দেশের মেহনতী ও নিপীড়িত জনতার সামনে একটি প্রধান বিপদ। নিজেদের অশ্রু ঘাম-রক্ত দিয়ে দুনিয়ার জনগণ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে তারা মুখোশ-খুলে-যাওয়া পুরোণো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকেই, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রধানতম ও বৃহত্তম শক্তি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকেই, বুঝে থাকেন। অথচ স্তালিনোত্তর যুগের সোভিয়েত ইউনিয়নের আধুনিক সংশোধনবাদী শাসকচক্র যে সেদেশে সর্বহারা একনায়কত্বকে উৎখাত কোরে বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস কোরে দিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি মুখে সমাজতান্ত্রিক ও কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশে, অর্থাৎ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত করেছে— এ সত্য এখনও পর্যন্ত অনেকের কাছেই পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। দুনিয়ার দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো অপর বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও যে আজ দুনিয়ার জনগণের অন্যতম প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে, এ সত্য বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু পরিমাণে ধরা পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সুস্পষ্ট উপলব্ধির পর্যায়ে পৌঁছোয় নি।

অথচ সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদই আজ দুনিয়ার জনগণের অধিকতর বিপজ্জনক ও প্রতারণামূলক শত্রু— কেননা তার চেহারাটা 'সমাজতন্ত্রের' আবরণে ঢাকা, কেননা দুনিয়ার দেশে দেশে 'কমিউনিষ্ট পার্টির' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এবং জনগণের রক্তে-রাঙা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে আধুনিক সংশোধনবাদী পার্টিগুলি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দালালী কোরে যাচ্ছে। বিশেষতঃ আজ যখন আমাদের ষাট কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান শিকার ও মৃগয়াভূমি হয়ে উঠেছে, তখন একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা হিসেবে আমাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে— এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার।

সে চেষ্টাই আমরা করেছি। স্বভাবতঃই এ প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি দুর্বলতা রয়ে যাবার সম্ভাবনা। পাঠকবন্ধুদের আন্তরিক ও তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনাই যে আমাদের সে সব ভুল-ত্রুটি শুধরে দেবে— একথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

অনীক, জুন-জুলাই, ১৯৭৪

সাম্প্রতিক রেল-ধর্মঘট প্রসঙ্গে

রঞ্জন কর

গত আটই মে থেকে ভারতবর্ষের বিশ লক্ষ রেলশ্রমিক যে লাগাতার ধর্মঘট চালাচ্ছিলেন, সংশোধনবাদীদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে তা অবশেষে শেষ হলো গত ২৮শে মে তারিখে। এই ধর্মঘটের মূল দাবীগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো মহলেই বিতর্কের অবকাশ নেই। যে রেল-শ্রমিক বছরে ২৭০ কোটি টাকার মুনাফা দেয় সরকারকে তার বোনাস পাবার অধিকার থাকবে না এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম কোরেও অন্য যে কোনো সরকারী সংস্থার তুলনায় তাকে কম মাইনে নিতে হবে— এ বক্তব্য কোনো মহলেই প্রভাব ফেলতে পারে নি। এমনকি রেল-ধর্মঘট-বিরোধী আইএনটিইউসি-র "রেলওয়ে মেনস্ কংগ্রেস" পর্যন্ত দাবীগুলি সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে পারে নি। কাজেই দাবীগুলোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যেটিকে একটি নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (আপাত বাম কার্যতঃ দক্ষিণপন্থীরা যাকে "নিছক অর্থনীতিবাদ" বলে একটি সবজান্তা ভাব কোরে বসে থাকবেন), সেই রেল-ধর্মঘটটি ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ছিলো রাজনৈতিকভাবে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিনা বাধায় এদেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে কিনা, তার পরীক্ষা হয়েছে খড়্গাপুরের লোকো শেডে, মোগলসরাই মার্শালিং ইয়ার্ডে, ইজ্জতনগরের রেল কলোনীতে। যে পটভূমিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়, তা বিশ্লেষণ করলেই এ বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সকলেই জানেন, গত কয়েক বছরে ভারতীয় বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক সংকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে রাজনৈতিক সংকটও বেড়েছে এবং তা ফ্যাসিবাদী বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। জাতীয় সমাজতন্ত্র কিংবা ভারতীয় ধাঁচের সমাজতন্ত্রের নাম কোরে হিটলারী কায়দায় ভারতের শাসক পার্টিটি কখনও উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে, কখনও ভঙ্গিসর্বস্ব 'গরিবী হটাও'-এর এবং জাতীয়করণের সোনার হরিণ দেখিয়ে ভারতীয় জনতাকে মোহগ্রস্ত কোরে রাখবার চেষ্টা করেছে। নানান অজুহাতে তারা জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে সীমিত কোরে এনেছে এবং প্রথমে কমিউনিষ্ট অর্থাৎ 'নকশালপন্থীদের' এবং তার পরে সমাজ-গণতন্ত্রী অর্থাৎ সি.পি.এম. এবং অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলোকে সংহারের কাজে নেমেছে। এ কাজ তারা প্রায় বিনা-বাধায় সম্পন্ন করবার স্বপ্ন দেখছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত এবং বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুবিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিনা বাধায় তা সম্পন্ন

করতে দিতে রাজী নয়। গত কয়েক-বছর ধরে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সুতাকল, চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে শুরু কোরে বিমান-পরিবহন পর্যন্ত সর্বত্র বিভিন্ন লড়াই-এ নেমেছেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর 'সাজানো বাগান শুকিয়ে দেবার' চেষ্টা করেছেন। এই প্রতিটি লড়াই-ই ফ্যাসিবাদের কালো ঘোড়ার এগিয়ে যাবার পথের এক একটি দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম দমন না কোরে ফ্যাসিবাদের কালো ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, এ সত্য ভারতের শাসকশ্রেণী বুঝেছে। এই পটভূমিতে যখন রেল-ধর্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই ভারতের শাসকশ্রেণী এটিকে একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে এবং গোড়া থেকেই তাকে দমিয়ে দেবার জন্য পরীক্ষিত সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছে। রেল-শ্রমিককে 'শিক্ষা' দিয়ে সমস্ত শ্রমিককে ভয় পাইয়ে দিতে হবে— এই ছিলো তার পরিকল্পনা। এইজন্যই রেল-ধর্মঘট ছিলো সাম্প্রতিককালে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক লড়াই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সংশোধনবাদীদের শয়তানিতে রেল-ধর্মঘট এক তরফাভাবে তুলে নেওয়ায় এ লড়াই-এ শাসকশ্রেণী জিতেছে এবং শ্রমিকেরা আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এ হলো বাস্তবকে স্থূলভাবে দেখা। বিশ দিনের লাগাতার ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর মানসিকতাকে আরও মজবুত কোরে তুলেছে— শত্রু ও মিত্রের মধ্যে সীমারেখাকে স্পষ্ট কোরে দিয়েছে। যতো বেশী হিংস্রতার সাথে শাসকশ্রেণী ঝাঁপিয়ে পড়েছে শ্রমিকদের ওপর, ততো বেশী কোরে ব্যাপক মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়েছে— গরীবী হটানেওয়ালীর আসল মুখ কী নৃশংস! 'কমিউনিষ্টরা নয়, আসলে আমরাই গরীবের পক্ষে'— এই শ্লোগান তুলে যে সমস্ত যুব কংগ্রেসীরা মানুষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করতো, তারাই যখন সবুজ ঝাণ্ডা খুলে লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাঁচরাপাড়ার মা-বোনদের ওপর, সাঁতরাগাছির দরিদ্র লোকো শ্রমিকের উপর, তখনই প্রমাণ হয়েছে ফ্যাসিবাদের আসল চরিত্র কী জঘন্য। এর ফলে খুব সাধারণ মানুষও এ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে শিখছেন। ফ্যাসীবাদ-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্যের বুনিয়াদ সব দেশে এভাবেই তৈরী হয়। ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ায় শাসকপার্টি ও তার সাকরেদ ডাঙ্গে পন্থীদের কি কোনো সুবিধা হবে? মোটেই না। ধর্মঘট ভাঙলে দালালরা ফসল কুড়োয়— এটা একটা বাস্তব বিবর্জিত ধারণা। এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বিশ লাখ রেল শ্রমিক, তাদের পরিবারের এক কোটি মানুষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ আরও দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসী ও ডাঙ্গেপন্থীদের ঘৃণা করতে শিখবেন। সাম্রাজ্যবাদ-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিরাট মোর্চার সম্ভাবনা এ ভাবেই গড়ে উঠছে। এই হলো এ লড়াই-এর সবচেয়ে বড়ো লাভ।

সংকট-জর্জরিত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, এধরণের লড়াই করতে গেলে সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন, তা হলো সর্বস্তরের রেলকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য। নানা সময়ে মতলববাজ

ট্রেডইউনিয়ন নেতারা নানা অজুহাতে ব্যাপক ঐক্য গড়ার কাজটিকে বানচাল কোরে থাকে। এবার কিন্তু ব্যাপক শ্রমিকের সম্মিলিত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করবার সাহস দেখাতে পারে নি তারা। রেলের বাবু অর্থাৎ কেরানী থেকে শুরু কোরে অদক্ষ শ্রমিক পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের বিভিন্ন সংগঠনগুলো "জাতীয় কো-অর্ডিনেশন" গড়ে তুলেছিলো, কংগ্রেসী সংগঠন ছাড়া সমস্ত সংগঠন এই NCCRS-এর ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়। ফলে বিভিন্ন রেল-কলোনীগুলোতে পরিচিত কংগ্রেসী দালালদের পা রাখবার মাটিটুকুও হারিয়ে যায়। প্রধানতঃ বাইরের গুণ্ডা এবং খাকি ও সাদা পোষাকের পুলিশ ও মিলিটারী ছাড়া সরকারের অন্য অবলম্বন থাকে নি। পুলিশ ও টেরিটোরীয়াল আর্মিও এই সার্বিক ঐক্যের সামনে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে টেরিটোরিয়াল আর্মি ট্রেন চালাতে অস্বীকার করে, খড়্গাপুরে শ্রমিকেরা যখন দালালদের উপযুক্ত পুরস্কার দিচ্ছিলেন, তখন RPF-এর লোকেরা শ্রমিকদের বিরোধিতা করতে অস্বীকার করে। সার্বিক ঐক্য শ্রমিকদের কী দিতে পারে, তা বুঝবার জন্য ১৯৭৪-এর রেল ধর্মঘটকে আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় এই যে, এই ধরণের ঐক্য গড়ে উঠেছে নীচু তলা থেকে, উপর মহলের নেতৃত্ব বাধ্য হয়েছে NCCRS গড়তে। দুর্বলতা যা ছিলো তা হলো, এই ঐক্যের অস্তিত্বের প্রাথমিক সর্ত, অর্থাৎ চিহ্নিত সংশোধনবাদীদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার কাজটি, শ্রমিকশ্রেণী হাতে তুলে নেয় নি। তার জন্য এ লড়াইকে মূল্য দিয়ে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি। ব্যাপক ঐক্যের ফলেই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ হয়েছিলো অভূতপূর্ব। এসম্পর্কে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন হীন প্রচার সত্যকে লুকিয়ে রাখতে পারে নি। তাদের অসংলগ্ন বক্তব্য, পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি প্রমাণ করেছে যে, আট তারিখ নয়, কার্যতঃ দু'তারিখ থেকেই পশ্চিম ও দক্ষিণ রেলে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। এবং আট থেকে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আকাশবাণী এবং ষ্টেট্স্‌ম্যান আনন্দবাজার ছাড়া আর কোথাও নিয়মিত ট্রেন চলে নি। শেষদিন পর্যন্ত ওয়ার্কশপগুলোতে উপস্থিতির হার ছিলো নগণ্য। বুর্জোয়া সাংবাদিকেরাও পরের দিকে স্বীকার করেছে যেই অংশগ্রহণ সর্বত্র ছিলো অভূতপূর্ব।

শুধু অংশগ্রহণের কথা নয়, যে অবস্থায় ব্যাপক শ্রমিক লড়াই-এ অংশগ্রহণ করেছেন, সেটির কথাও চিন্তা করবার মতো। একদিকে দিবারাত্র অপপ্রচার, চাকুরি ছেদের হুমকি, রেল কলোনী থেকে বের কোরে দেওয়া, অন্যদিকে পুলিশ-মিলিটারী-কংগ্রেসীগুণ্ডার যৌথ আক্রমণ, প্রহার, স্বামীর অভাবে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, গ্রেপ্তার, মিসা, অতর্কিত আক্রমণ ইত্যাদি দানবীয় প্রতিহিংসা সয়ে রেলের শ্রমিকেরা রেকর্ড পরিমাণ দিনের জন্য রেল অচল রেখেছিলেন— হাজার বার লাল সেলাম তাদের।

স্বভাবতঃই ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে এই ধর্মঘট। বুর্জোয়াদের হিসেবেই মোট বিশ দিনে ৫০ কোটি টাকার মতো লোকসান হয়েছে রেলের। হিসেবটা আরও কিছু বাড়বে। রেল তো শুধু বন্ধ থাকে নি, "রেল চলছে" এই খেলাটিও চালু থেকেছে। তার বাবদ পুরস্কার, বিজ্ঞাপন, দালাল পোষা ইত্যাদির খরচ আছে।

সেটিও কিছু কম নয়। সর্বোপরি রেলের এক টাকা ক্ষতি মানে জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ টাটা-বিড়লার দশ টাকা ক্ষতি। এই হিসেবে বুর্জোয়াদের মোট ক্ষতি কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা। এদিক থেকে রেল-ধর্মঘটীদের তীর ভারতীয় বুর্জোয়াদের বক্ষ ভেদ কোরে তার বিদেশী মালিকদেরও বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত কোরে ফেলেছে। ভারতের অর্থনীতিতে যে সব বিদেশী শক্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী, লুটের মাল বহন করবার জন্য রেলকে যারা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়ে থাকে, এই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানটি বিচার করলেই তা পরিষ্কার হবে। মার্কিণ বুর্জোয়াদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সবিস্তারে ভারতের রেল ধর্মঘটের খবর বেরিয়েছে। এটি যে দরিদ্র ভারতকে কী বিপদে ফেলবে, তা ভেবে ওয়াশিংটনের কর্তাদের ঘুম হচ্ছে না। আসলে তাদের লুটের মাল বহন করবার ব্যবস্থা কী হবে, এই ছিলো তাদের মুখ্য চিন্তা, কোথাও কোথাও মুখ ফস্কে তা বেরিয়েও গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করেছে সোভিয়েত বক্তব্য। প্রথম দিকে 'প্রাভ্‌দা' মন্তব্যহীনভাবে রেল-ধর্মঘটের খবর ছাপিয়েছে। সেগুলোও ভারত সরকার এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে পরিবেশিত বিকৃত খবর। ধর্মঘটের সমর্থনে প্রাভ্‌দায় প্রথম থেকেই কোনো লেখা বা কোনো ইতিবাচক মন্তব্য ছিলো না। মস্কোর অন্যান্য প্রচার মাধ্যমেও কিছু পাওয়া যায় নি। ধর্মঘট যতো বেশিদিন চলতে লাগলো, যতো বেশি কোরে তা ভারতীয় বুর্জোয়া ও তার বিদেশী মালিকদের অর্থনৈতিকভাবে আঘাত দিতে লাগলো, ততো বেশি কোরে সোভিয়েত বক্তব্য খোলাখুলি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যেতে লাগলো। পরের দিকে, এমনকি সাধারণ বুর্জোয়া দেশগুলি পর্যন্ত যখন ভারতের শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করতো লাগলো, চীনের নেতৃত্বে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ যখন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে এবং ভারতীয় বুর্জোয়ার নিন্দায় নামলো, তখনও ইন্দিরার গলায় ঝুলছে ব্রেজনেভের দেওয়া প্রগতিশীলতার সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে ইন্দিরা গান্ধী যখন সর্বত্র নারকীয় সন্ত্রাস চালাতে লাগলো, তখন মস্কো বললো— দক্ষিণপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর উপর অত্যাচার নামিয়েছে! কারা এই দক্ষিণপন্থী? মস্কোর বিচারে ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণপন্থী নয়, দক্ষিণপন্থী হলো স্বতন্ত্র-জনসংঘ। তারা তো পুলিশ-মিলিটারী নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। তাহলে বাকী থাকে কংগ্রেসেরই 'দক্ষিণপন্থীরা'। ব্যাখ্যা তাহলে এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রগতিশীল ইন্দিরা গান্ধীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 'দক্ষিণপন্থীরা' বাধ্য করেছে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করতে। এই যুক্তি দিয়ে কাকে বোঝাবে ব্রেজনেভ কোম্পানি? আসল কথা, ভারতে লুটের বাজার ঠিক রাখতে আপাততঃ ইন্দিরাকে চাই, কিন্তু ইন্দিরার কুকর্মের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবো না— এই হলো ব্রেজনেভী চাল। এই কুৎসিত ফন্দিবাজদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ব্রেজনেভ কোম্পানির এই দু'মুখো শয়তানির একেবারে কার্বন কপি হলো ধর্মঘটে ডাঙ্গে ও তার পার্টির ভূমিকা। মে মাসের গোড়ায় মনে হলো, ডাঙ্গের চেয়ে আগমার্কা

বিপ্লবী ভারতে বিরল। AITUC দ্ব্যর্থহীন মদৎ দিয়েছে ধর্মঘটকে, 'ফার্ণান্দেজকে না ছাড়লে কোনো আলোচনা নয় সরকারের সাথে'— এ আওয়াজ তুলেছে, ১৫ই মে'র ভারত বন্ধের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক হিসেবে পাওয়া গেছে সি.পি.আই-কে। এরই পাশাপাশি আবার তাদেরই মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন কেরালার ত্রিচুর ও ত্রিবান্দ্রামে রেল কলোনীতে অত্যাচার নামিয়েছে; বাহাদুর ডাক ও তার কর্মীরা যখন রেলের সাথে এক সাথে সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, তখন সি. পি. আই সেখানে নেমেছে ধর্মঘট-ভাঙা দালালের ভূমিকায়। শেষদিন পর্যন্ত NCCRS যখন লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তখন ডাঙ্গে প্রথমে NCCRS-এ ভাঙন ধরাতে চেষ্টা করলো, ব্যর্থ হয়ে AITUC-কে দিয়ে আলাদা করে বিবৃতি দিলো এবং তারপর আঞ্চলিকভাবে ধর্মঘট তুলে নেবার অধিকার চেয়ে বসলো। শ্রমিক আন্দোলনে সংশোধনবাদ যা কোরে থাকে ডাঙ্গেকেও সেই রাস্তাই ধরতে হয়েছে এবং অন্য সব অকংগ্রেসী দলও একই পন্থা ধরতে বাধ্য হয়েছে। এই নোংরা দু'মুখো শয়তানি ব্যাপক রেল-শ্রমিক ও জনগণের দ্বারা ধিকৃত হয়েছে। বুর্জোয়ারা যখন সরাসরি হালে পানি পায় না, তখন তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে সমাজ-গণতন্ত্রীরা— এই লেনিনীয় শিক্ষার সার্থকতা আর একবার পরিষ্কার হলো। আগামী লড়াই-এর বর্শামুখ যে শুধু শাসক কংগ্রেসের দিকেই নয়, মস্কোর সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশে তার বিশ্বস্ত অনুচর সিপিআই-এর বিরুদ্ধেও তুলে ধরতে হবে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

অন্যান্য অকংগ্রেসী দলগুলোর কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, তারা খুব ভালো মানুষ— স্রেফ ডাঙ্গের জন্যই লড়াইটা সাময়িকভাবে পিছু হটলো। এইসব পার্টিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে মরিয়া হয়ে লড়তে চায় শাসক-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এ লড়াই-এ জনতাকে তারা সঙ্গে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে লড়াই যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ কোরে শুধু এই সরকার-বিরোধী না থেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও চলে যায়, তখন এই সব পার্টিগুলো পড়ে সংকটে। তারা ইন্দিরাকে চায় না, কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ুক এটা কল্পনাও করতে পারে না। ফলে শাসক কংগ্রেস-বিরোধী লড়াইগুলো রাষ্ট্র-বিরোধী রূপ নিতে শুরু করলে এরা ইন্দিরা বিরোধী লড়াই বন্ধ করতে কিংবা তাকে গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয়। রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও এদের সেই চিরাচরিত শ্রেণী-চরিত্রই আর একবার প্রকাশিত হলো।

এ প্রসঙ্গে সিপিএম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আজকের সমস্ত গণ-আন্দোলনে সিপিএম-এর প্রভাব অনস্বীকার্য— এই পার্টির বহু কর্মী নিষ্ঠার সাথে গণ আন্দোলন গড়ার কাজ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাওয়ায় এই প্রভাব অর্জন করা গেছে। কিন্তু মতাদর্শ ক্ষেত্রে বর্তমানে সিপিএম-এর যে বন্ধ্যাত্ব রয়েছে, সর্বত্র তার অল্পবিস্তর ছাপ থাকছে। রেল আন্দোলনও কিছু ব্যতিক্রম নয়। মতাদর্শগতভাবে এই পার্টিটির সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, ফলে আক্রমণের বর্শামুখ মস্কো এবং

শাসক-কংগ্রেসের বি-টিম সি.পি.আই-এর দিকে ঘুরিয়ে ধরতে এরা অক্ষম। এজন্যই তাদের সিপিআই-এর সাথে ঐক্য গড়বার জন্য নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাতে হয় এবং সিপিআই বেইমানী করলে "তাই তো, ডাঙ্গেটা কী শয়তান" বলে অপ্রস্তুত মুখভঙ্গি কোরে ডাঙ্গের পথই ধরতে হয়। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃঢ়তা না থাকলে গণ-আন্দোলন গড়া যাবে না— এ সত্য প্রতিটি সিপিএম কর্মীকেই আজ বুঝতে হচ্ছে।

সিপিএম-এর রাজনৈতিক দেউলেপনার আর এক উৎস হলো : ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদের পিছিয়ে পড়া ধ্যানধারণা। এরা চোখের সামনে দেখছে নির্বাচন একটি প্রহসন, তবুও গদি দখলের রাজনীতির চিরাচরিত পথ ছাড়তে এদের অনীহা। চোখের সামনে দেখছে ফ্যাসিবাদের উত্থান, প্রতিবিপ্লবের সশস্ত্র হুমকি, বিপ্লবী শক্তিকে সশস্ত্র করতে তবু এদের দ্বিধা। ধর্মঘট, সাধারণ গণ-আন্দোলন প্রভৃতির উপরও যখন রাষ্ট্র বর্বর পশুশক্তি নিয়ে আক্রমণ করছে, ট্রেডইউনিয়ন অধিকার পর্যন্ত যখন বিপর্যস্ত, তখন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন ও বেআইনের সমন্বয়ে নোতুন ধরণের সংগঠন গড়ে তুলতে এদের অনীহা। শ্রেণী-সংগ্রামের আজকের স্তরের বিকাশের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পারায় সিপিএম ইতিহাসের কাছে ক্ষমা পাচ্ছে না। তাদের চিরাচরিত গণ-আন্দোলন পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে কর্মীদের বিভ্রান্ত করছে, জনগণকে হতাশ করছে এবং ফ্যাসিবাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভিত্তি তৈরী করছে। রেল-ধর্মঘটে সিপিএম-এর ভূমিকা এ সত্যকে আর একবার তুলে ধরেছে।

যাবতীয় ভোট পার্টির বেইমানীর মধ্যে দিয়ে রেলধর্মঘটের অবসান অবশ্যই চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রধান দুর্বলতাকে প্রকাশ কোরে দিচ্ছে। এখনও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নির্ধারক শক্তি রয়েছে সংশোধনবাদীদের হাতে। যেখানে লড়াই-এর বর্তমান পর্যায়ে প্রয়োজন ছিলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রেলের শ্রমিকদের পাশে টেনে আনা, সেখানে কেবলমাত্র ডাক ও তার তথা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্যদের সংগঠিতভাবে রেলশ্রমিকদের পাশে দাঁড় করানো যায় নি। এ ব্যাপারে স্বভাবতঃই সংশোধনবাদীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিলো না। সি.আর.পি., পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য যে লেনিনীয় কায়দায় গণ-সংগঠন গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা ছিলো, তাকে সংশোধনবাদীরা কোনো দিনই শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরে নি— তুলে ধরে নি কীভাবে জারের গুপ্তপুলিশ, নারদ্নিক আর অর্থনীতিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার মতো আইনী বেআইনী কায়দার নমনীয় সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে লেনিনবাদের যুগের গণ সংগঠন সেই শিক্ষাকে, কীভাবে গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠনের সংমিশ্রণ ঘটাতে হয় তাও লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত আছে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এ কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা যায় না। কমিউনিষ্টদের সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমেই এ ধরণের সংগঠন গড়ে ওঠে। রেলের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত ছিলো। ফলে শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোথাও কোথাও

প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু অবশেষে তা স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই শেষ হয়েছে। কমিউনিষ্টরা আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়, স্বতঃস্ফূর্ততার কানাগলিতে তার বেদনাময় পরিসমাপ্তি ঘটে— এই লেনিনীয় শিক্ষার অভ্রান্ততা রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে আর একবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এই ধর্মঘটের বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে সবচেয়ে নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারতেন সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবে বিশ্বাসী কর্মীরা। রেল-ধর্মঘটের বাস্তব চাইছিলো আক্রমণের বর্শামূল সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দিকে তুলে ধরা হোক— এ কাজ তাঁরাই করতে পারতেন সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে, কারণ মতাদর্শগতভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁদের কোনো মোহ নেই। আইনের সঙ্গে বে-আইনকে সমন্বয় করবার অপূর্ব বাস্তব অবস্থা তাঁদের ছিলো, কারণ এ ধরণের লড়াই চালাবার আবশ্যিক পূর্বসর্ত— অর্থাৎ মূল সংগঠনটি গোপন রাখা— তাঁরা পালন করেছিলেন। তবুও রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে তাঁরা যে কোনো মৌলিক ছাপ রাখতে পারেন নি, তার কারণ খুঁজতে হবে তাঁদের রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যে।

গত কয়েক বছর ধরে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের রাজনীতির প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছাপ আছে চারু মজুমদারের 'বামপন্থী' লাইনের। এই লাইন কর্মীদেরকে শিখিয়েছে : ভারতের বিপ্লবের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হলো দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, এবং এই অমার্কসীয় সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে খাটো কোরে দেখবার বাস্তব অবস্থা তৈরী হয়েছে কর্মীদের ভেতরে। লেগে পড়ে থেকে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উৎসাহ ছিলো কম, ফলে বিভিন্ন শ্রমিক-সংগঠনে এই পার্টির প্রভাব তেমনভাবে পড়ে নি। লাইনটি আরও শিখিয়েছে, শ্রমিক আন্দোলনে পার্টি-কর্মী অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজন নেই, ফলে কর্মীরা শিখেছে স্বতঃস্ফূর্ততার পূজা করতে। ধর্মঘট ও বিভিন্ন প্রচলিত আক্রমণের ধারা ভোঁতা হয়ে গেছে, এমন কি ট্রেড ইউনিয়ন গড়াও কমিউনিষ্টদের কাজ নয়— এমন মানসিকতা চালু হয়েছে। এ সবই হলো ভঙ্গীসর্বস্ব বামপন্থী আওয়াজ, যা কার্যতঃ গণ-আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে— সংশোধনবাদীদের বিরোধিতার নাম কোরে একপেশেপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কার্যকর গণ-লাইনের অভাবে কর্মীর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। একদিকে কর্মীরা বহু ত্যাগ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও লাইনের গলতিতে জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অন্যদিকে "পঁচাত্তরেই বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে" এই আশু ফললাভের চিন্তা— দুইয়ে মিলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা এবং তার সরাসরি পরিণতিতে সন্ত্রাসবাদ কায়েম হয়েছে।

অন্যদিকে যারা চারু মজুমদারকে বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গণ-সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। একেবারে চিরাচরিত গণ-সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে তাঁরা সিপিএম এবং অন্যান্য বামপন্থীদের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন, সংশোধনবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার কোনো

সঠিক লাইন গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। ফলে কোনো গণ-আন্দোলনেই তাঁরা মৌলিক ছাপ রাখতে পারছেন না। রেল-ধর্মঘটও কিছু ব্যতিক্রম নয়।

তবুও ভারতের গণ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এঁদের হাতেই আছে। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এঁদের গতিধারাই হলো সঠিক। আজকের ভারতের গণ-আন্দোলনকে পার্লামেন্ট দখলের সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা যাবে না, তার নির্দিষ্ট গতিপথ কৃষক-যুদ্ধ তথা ঘাঁটি-এলাকা গড়ার সাথে যুক্ত। তারই সাথে সাথে, আজকের গণ-আন্দোলনকে যে মোকাবিলা করতে হবে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বুলেটের— এই বাস্তবকে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবে বিশ্বাসীরাই উপলব্ধি করেছেন। তাই রেল-শ্রমিক থেকে শুরু কোরে সকলেই বাস্তব থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতিগতভাবে এঁদের কাছাকাছি এসে পড়বেন। এটা হলো ভারতের শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক গতিধারা। রেল-ধর্মঘট আর একবার পরিষ্কারভাবে তার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে।

অনীক, জুন-জুলাই ১৯৭৪

সোভিয়েতের জন্য : সোভিয়েতের বিরুদ্ধে

সব্যসাচী দেব

আমাদের স্বপ্নের মধ্যে এখনও ছুটে আসে শৈশবের হাওয়া,
মনে পড়ে, একেকটা অবাক মুহূর্তে মা গল্প শোনাতেন—
এক সোনালী দেশের গল্প— যার নাম সোভিয়েত,
আর লেনিন-স্তালিনের কথা।
ক্রমশঃ সময় আঁকছে নানা জানা-অজানা বোঝা-না বোঝার আঁকিবুকি,
এখন টের পাই কাচের আধারে আর কোনো সান্ত্বনা নেই লেনিনের জন্য,
ঘাসের নীচে স্তালিনের ঘুম আর নিশ্চিন্ত নেই।
কেননা, যে মানুষগুলি উসুরীর সীমান্তে
লেনিনকে মনে রেখে ভাবছিলো গাঁও-ঘরের কথা,
তাদের বুক চিরে গেছে সোভিয়েত গুলীতে,
কেননা, চেকোশ্লেভাকিয়ার রাস্তায় রুশ সাঁজোয়া গাড়ী
ছুঁড়ে দিয়েছে সমাজবাদ—
ঠিক যেমন কোরে ইন্দোচীনের মাটিতে মার্কিণ বোমারু বিমান থেকে
ঝড়ে পড়ে গণতন্ত্র!

আর, আমার ভারতবর্ষে
হা-ভাতে মানুষের কান্না থেমে যায় গরম বুলেটে—
তখন প্রাভ্‌দার পাতায় উচ্ছ্বসিত হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন।
এখানে স্নেহার্দ্র পিতাও তার সন্তানকে
আছড়ে মারে ফুটপাতে, কয়েকদানা মুড়ির অভাবে—
আর পিঠ চাপড়ে, 'বাহবা সমাজতন্ত্র' বলে ওঠে যে দেশ,
তার নাম সোভিয়েত।
বোকারোর গন্‌গনে লাল আগুনের নীচে
আদিবাসী শ্রমিকের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পরিণত হয় ইস্পাতে—
আর সেই ইস্পাতের নেশায় মস্কোর হোটেলে
ট্যুইষ্টের তালে তালে দুলতে থাকে কমসোমল তরুণ তরুণী,
সামনের বরফ-ঢাকা রাস্তায় পড়ে থাকে নিগ্রো ছাত্রের রক্তাক্ত শরীর।

তারপর, এই ভারতবর্ষের দিকে দিকে
হাজারো ঘরছাড়া আর ঘরহারা মানুষের রক্তে-ডোবানো
লাল কার্পেটে পা ফেলে
পালাম এয়ারপোর্টের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান মহান ব্রেজনেভ
তার বাদিত মুখগহ্বর নিয়ে।
মনে পড়ে, লেনিন একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন
বিপ্লবের লাল ঘোড়া দৌড়োবে পিকিং হ্যানয়-কলকাতা হয়ে।
আজ সেই দীর্ঘ রাস্তার ওপর ছড়ানো ডানায়
কালো ছায়া ফেলে নেমে আসছে বিরাট শকুন—
যার অন্য নাম সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাহায্য,
ওরফে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি।

যারা পুরুষানুক্রমে বয়ে এনেছিলো মার খাওয়ার ইতিহাস—
তারাই একদিন শিখেছিলো ফিরে মার দেওয়া,
জেনেছিলো লেনিনকে, স্তালিনকে, আর তাদের সোভিয়েতকে।
আজ সেই সোভিয়েতের জন্য
তারা মৃত্যুর কোল থেকে ছিনিয়ে আনছে সহোদরকে,
আজ সেই সোভিয়েতের জন্য
তারা লড়ছে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে—
রক্তের সমুদ্রের ওপর থেকে তারা ডাক দিচ্ছে একে-ওকে,
সেতু বাঁধছে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত
কাঠুরেদের আঘাতে যেমন কোরে উপড়ে পড়ে মহীরুহ
হাজারো মানুষের শক্ত হাতের চাপে তেমনি
উপড়ে পড়ছে চার পাহাড়।
বরফ-ঢাকা মাঠের ওপর তখন আবার
বসন্তের নবীন বাতাস—
ক্রেমলিনের ওপর আবার জ্বল্‌জ্বলে লাল তারা।।

অনীক, জুন-জুলাই ১৯৭৪

রাজা ও রাণী

সৈকত রায়

খাস তালুকে ভালুক রাজা
এসে লোটেন একশো মজা
আরাম কোরে খান যে তাজা
জোয়ান ছেলের রক্ত!
তার পেয়ারের ডাইনী রাণী
প্রসাদ পেয়ে একটুখানি
নাচিয়ে বলে পা দু'খানি—
স্বাদ বোঝা খুব শক্ত!
বলেন রাজা মুচকি হেসে—
এইটুকুতে যাচ্ছো টেঁসে
আরও বড়ো দুষমন সে
উত্তুরের ওই দেশটায়—
তাকে নিকেশ করা যে চাই
বের করেছি নোতুন দাওয়াই
একটুখানি দাও দেখি সই
এশীয় নিরাপত্তায়।
রাণী বলেন— সবুর প্রভু
কিছু লুকাই তোমায় কভু?
এতো অধীর কেন তবু
আপৎকালে হায় বীর!
রাজা বলেন— চিন্তা ভারী
সইটা দিলে তাড়াতাড়ি
তোমায় দেবো পুরোপুরি
পূর্বদেশের জায়গীর।

সম্পাদকীয়

বিশে জুলাই! ভিয়েতনামের বীর জনগণের দুনিয়া কাঁপানো লড়াইয়ের স্মরণে ভারত তথা দুনিয়ার ব্যাপক জনতা দীর্ঘদিন ধরে এই দিনটিকে পালন কোরে আসছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পবিত্র শপথ উচ্চারণের একটি মহান দিন হিসেবে। কিন্তু এবছর এই দিনটিই বিশেষ এক তাৎপর্য বয়ে এনেছে আমাদের সামনে। এই দিনটিতেই কলকাতার কার্জন পার্কে প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক-কর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিলের ওপর নেমে এসেছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা পুলিশবাহিনীর হিংস্র আক্রমণ। আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেকে— আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতার পথের ধুলো সেদিন রাঙা হয়ে উঠেছে তরুণ শহীদ প্রবীর দত্তের উষ্ণ রক্তে।

কিন্তু কী অপরাধ করেছিলেন প্রবীর দত্ত? কী অপরাধ করেছিলেন এই সব সাংস্কৃতিক কর্মীরা? তাঁদের অপরাধ— তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন! তাঁদের অপরাধ— তাঁরা বক্তৃতায়-গানে-কবিতায়-নাটকে রঙবেরঙের সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস খুলে দেবার মহান দায়িত্ব পালনে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন! প্রবীরের মা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "কী অপরাধ করেছিলো আমার ছেলে?" আমরাও সেই একই প্রশ্ন করছি ঃ কী অপরাধ প্রবীরের এবং অন্যান্য কর্মীদের? সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা ও জনগণের সেবায় শিল্প-সাহিত্যকে নিয়োজিত করাটা কি অপরাধ? এই অপরাধের জন্যই কি ধৃত কর্মীদের "জামীনের অযোগ্য" বলে ঘোষণা করা হয়েছে? এই জ্বলন্ত প্রশ্নকে আজ দিকে দিকে সোচ্চার কোরে তুলতেই হবে।

কিন্তু না, বিশে জুলাই'র ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না। গত ক'বছর ধরে প্রথমে বিপ্লবীদের এবং পরে বিভিন্ন বামপন্থী দলের জঙ্গী কর্মীদেরও নির্বিচারে খুন করার যে বর্বর ঐতিহ্য ভারতীয় শাসকশ্রেণী অর্জন করেছে, এ হলো সেই ধারাবাহিক ফ্যাসিষ্ট আক্রমণেরই একটি অঙ্গ, আরো ব্যাপক আক্রমণের ষ্টেজ রিহার্সাল। গত ক'বছর ধরে শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা ক্রমশঃই বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, সাহিত্য ও শিল্পকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কোরে গণ-মানসে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের চেতনাকে ক্রমশঃই জোরদার কোরে তুলছিলেন। এই কার্জন পার্কেই গত তিন বছর ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা খোলা মাঠে অভিনয় কোরে সাড়া জাগিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মনে, বাংলার প্রগতিশীল নাট্য

আন্দোলনকে মঞ্চের সীমাবদ্ধতা ছেড়ে নিয়ে এসেছিলেন মাঠে। স্বভাবতঃই শাসকশ্রেণী শংকিত হয়ে উঠেছিলো প্রতিরোধের ভাষাকে প্রতিবাদের শিল্প সাহিত্যে মুখরিত হতে দেখে। তাই যে কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের প্রয়াসকেই অংকুরে বিনাশ করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত অনুসারেই তারা হামলা চালিয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিলের ওপর, বেশ কিছুদিন ধরে প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য-নাটকের ওপর সরকারী ও বেসরকারী গুণ্ডাবাহিনী পুলিশ ও দলীয় মাস্তানদের হামলা ও আক্রমণের ধারাবাহিক চক্রান্তের এক নোতুনতর প্রকাশ হিসেবে। এর পরেও তারা যদি কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়, তবে আরও ব্যাপক স্পর্ধায় তারা প্রগতিশীল সংস্কৃতির নোতুন প্রাণস্পন্দনকে বিভীষিকার শ্বেত সন্ত্রাসের বুটের তলায় পিষে মারবে চিরতরের জন্য।

বিশে জুলাইয়ের ঘটনা কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার ওপর বা সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপরেই আক্রমণ নয়, এ আক্রমণ সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপরেও। এর পরেও যদি প্রতিরোধে মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলিকে সংঘবদ্ধ মিছিলে দাঁড় না করানো যায়, প্রতিবাদের ভাষাকে সোচ্চার ঐকতানে রূপান্তরিত না করা যায়, তবে শাসকশ্রেণী সমস্ত দেশকেই পরিণত করবে শ্মশানে, সমগ্র জাতিকে পরিণত করবে ভয়ে জবুথবু মেষ-শাবকে, আর সেখানে রাজত্ব করবে শুধু উদ্ধত রাইফেল। অগণিত মানুষের গোঙানির আওয়াজের সাথে সুর মেলাবার জন্য তারা তখন ধর্ষিতা সংস্কৃতির বেহালায় টানবে ক্লীবতার ছড়।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল সংস্কৃতির ওপর এই ফ্যাসিষ্ট হামলাকে মোকাবিলা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন পশ্চিমবাংলার খ্যাত ও অখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকরা। তাঁদের সংঘবদ্ধ বলিষ্ঠ প্রতিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুলিশ এখন বিশে জুলাই'র মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করার কথা নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করছে, হাত থেকে প্রবীরের রক্তের দাগ মুছে ফেলে ধোয়া তুলসীপাতা সাজতে চাইছে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা দৃঢ়তার সাথে সুস্পষ্টভাবে এই ঘৃণ্য মিথ্যের মুখোস প্রকাশ্যেই খুলে দিয়েছেন। দলীয় বা গ্রুপগত সংকীর্ণতা শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথে যে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় এতোদিন খাড়া কোরে রেখেছিলো, প্রবীরের হিমালয়ের চেয়েও ভারী মৃত্যু সেই বাধার অচলায়তনকে আজ ভেঙে চুরমার কোরে দিয়েছে, প্রবীরের রক্তের দাগে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবার পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছেন।

আসুন, আমরাও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই একান্ত প্রয়োজনীয় ঐক্যের শরিক হিসেবে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার শপথ গ্রহণ করি। আমরাও প্রবীরের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত, হত্যাকারী পুলিশদের শাস্তি এবং ধৃত কর্মীদের বিনা সর্তে মুক্তি দাবী করি। আমাদের কানে প্রতিনিয়ত বাজতে থাক প্রবীরের মা'র সেই আকুল কণ্ঠস্বর, "এভাবে নিরপরাধ ছেলেদের আর কতো মারবে ওরা? এর কি কোনো শেষ নেই?" আমাদের প্রেরণা জোগায় প্রবীরের মা'র সেই উদাত্ত আহ্বান ঃ "আপনারা লিখুন, আরো বেশি কোরে

লিখুন! আমার ছেলে গেছে যাক্, কিন্তু এভাবে অন্য কারও ছেলেরা যেন আর না যায়।" আসুন, আমরা, পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকেরা প্রবীরের গৌরবময় মৃত্যুকে সামনে রেখে জনগণের মধ্যে প্রেরণাসঞ্চারকারী গল্প-কবিতা লিখি, গান গাই, নাটক করি, প্রবীরের কথা গ্রামেগঞ্জে হাটেবাজারে ছড়িয়ে দিই, প্রবীরের মা'র আকুল প্রশ্ন সবার মনে ছড়িয়ে দিই, তাঁর উদাত্ত আহ্বানকে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করি। প্রবীরের রক্তের দামে আজ ব্যাপক ঐক্যের ও সংগ্রামের যে প্রথম পদক্ষেপ অর্জিত হয়েছে, আসুন, তাকে আমরা চোখের মণির মতো রক্ষা করি, তাকে আরও দৃঢ় মজবুত ও অগ্রসর কোরে তুলি।

জনগণের জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকা শোষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের অন্যতম সক্রিয় অংশীদার হিসেবে 'অনীক' দৃঢ় ও অবিচল ভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে, ভবিষ্যতেও কোরে যাবে।

অনীক, আগস্ট ১৯৭৪

গত বিশে জুলাই
ভিয়েতনাম দিবসে
কলকাতার কার্জন পার্কে
শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিলের ওপর
শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা পুলিশবাহিনীর বর্বর আক্রমণে
চব্বিশ বছরের তাজা যৌবন
কমরেড প্রবীর দত্ত
শহীদ হয়েছেন।
'অনীক'
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে,
গভীর শোকপ্রকাশ করছে,
এবং এই দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করছে যে,
প্রগতিশীল সংস্কৃতি তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে
শাসকশ্রেণীর সমস্ত রকমের হিংস্র ও বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদের ভাষাকে সোচ্চার ঐকতানে রূপ দেবার জন্য
এবং প্রতিরোধের মুষ্টিবদ্ধ বলিষ্ঠ হাতগুলিকে
সংঘবদ্ধ মিছিলে পরিণত করার জন্য
সর্বশক্তি দিয়ে দৃঢ় ও অবিচলভাবে
লড়াই চালিয়ে যাবে।।

রক্তাক্ত বিশে জুলাই : ১৯৭৪

'অনীক'-এর বিশেষ প্রতিনিধি

বিশে জুলাই, ১৯৭৪। স্থান : কলকাতার কার্জন পার্ক। সময় : বেলা আড়াইটা। কলকাতার কয়েকটি প্রগতিশীল নাট্যসংস্থার উদ্যোগে গঠিত 'বিশে জুলাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কমিটি'র ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতার বিভিন্ন নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পী-সাহিত্যিক ও কর্মীরা সমবেত হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মহান প্রতীক এই উজ্জ্বল দিনটিকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনগণের উত্তাল লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জানাতে, ভারতের বুকেও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে রংবেরঙের যে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা তাদের মুখোস খুলে দিতে এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরেরও বেশ কিছু সংস্থা ও পত্রিকার কর্মীরা এসে সামিল হয়েছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীরা বক্তৃতায়-গানে-নাটকের মধ্যে দিয়ে ভিয়েতনামের বীর জনতার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন, ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। সভায় সমবেত সাংস্কৃতিক কর্মীরা ছাড়াও প্রায় হাজারখানেক সাধারণ মানুষ বিপুল উৎসাহে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করলেন, অভিনন্দন জানালেন। উর্দিপরা ও সাদা পোষাকের কয়েকশো পুলিশ তখন সভার ওপর শিকারী বাজপাখীর মতো দৃষ্টি রাখতে ব্যস্ত।

সাড়ে তিনটে নাগাদ সভা শেষ হলো। কয়েকশো সাংস্কৃতিক কর্মী এবার মিছিল কোরে ধর্মতলা-সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার-কলেজ স্ট্রীট-মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত এগিয়ে যাবেন। মিছিল শুরু হলো। ট্রামলাইনের মধ্যে দিয়ে মিছিল এগোচ্ছে ধর্মতলার দিকে। হঠাৎ মিছিলের পেছন দিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। অন্যতম উদ্যোক্তা দেবর্ষি চক্রবর্তী মিছিলের পেছনে দিকে অংশগ্রহণকারীদের হাতে হাতে লিফলেট দিচ্ছিলেন বিলি করার জন্য, হঠাৎ একজন সাদা পোষাক পরা পুলিশ "এই যে, একটু শুনুন" বলে তাঁকে ডাকলো এবং তিনি এগিয়ে যেতেই দু'দিক থেকে দু'জন অফিসার তাকে চেপে ধরে কাছেই অপেক্ষমান পুলিশের ভ্যানের দিকে নিয়ে চললো। শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় পুলিশের এই হামলায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মিছিলের মুখ ঘুরিয়ে আবার সবাই এগিয়ে চললেন পুলিশ ভ্যানের দিকে।

ভ্যানটা তখন সুভাষ বসুর মূর্তির ঠিক সামনে রাস্তার ওপর, সঙ্গে আরও কয়েকটা ভ্যান ও বেশ কিছু পুলিশ। মিছিল ভ্যানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, উত্তাল স্লোগান উঠতে লাগলো— "আমাদের কমরেডকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া চলবে না, চলবে না!" "প্রগতিশীল সংস্কৃতির ওপর পুলিশী হামলা বন্ধ করো, বন্ধ করো!" হঠাৎ ভ্যানটা বেরিয়ে গেলো, আরও কয়েক ভ্যান পুলিশ এসে হাজির, একটা ভ্যান থেকে একজন পুলিশ অফিসার লাফিয়ে পড়ে খিস্তি দিতে দিতে দুজন সাংস্কৃতিক কর্মীর কলার চেপে ধরলো, কর্মীরা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অফিসারটি কোমরে গোঁজা রিভালভার বের কোরে তাক করলো, একটা পুলিশী ভ্যানের ভেতর থেকে হিংস্র আওয়াজ ভেসে এলো— 'চার্জ'— বিপুল পুলিশবাহিনী লাঠি হাতে মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পুলিশের এই আকস্মিক আক্রমণের সামনে কর্মীরা স্বভাবতঃই যেদিকে পারলেন ছুটতে লাগলেন— তাঁদের সঙ্গেই ছুটতে লাগলেন এই মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণনাট্য আন্দোলনের প্রবীণ কর্মী সঙ্গীতকার ও যাত্রার কাহিনীকার পরেশ ধর, বিপ্লবী নেতা সুশীতল রায় চৌধুরীর স্ত্রী অমিয়া রায়চৌধুরী প্রভৃতিরা। পুলিশবাহিনী তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, যাকে পাচ্ছে তাকেই লাঠিপেটা করছে। পাশেই নাটক করছিলেন 'সিল্যুয়েট'-এর কর্মীরা, তাঁরা এবং তাঁদের দর্শকরাও রেহাই পেলেন না। বহু কর্মী আহত ও গ্রেপ্তার হোলেন। আশেপাশের হাজার হাজার মানুষ পুলিশের এই হিংস্র তাণ্ডব নৃত্য দিনে দুপরে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলেন।

পুলিশের লাঠির আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রবীরও ছুটলো। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে পুলিশের লাঠির আঘাত এসে পড়লো তার পিঠে। মুখ থুবড়ে পড়লো সে। তার পেটের ওপর দু'জন পুলিশ বুট দিয়ে হিংস্রভাবে লাথি মারতে লাগলো। কাতর গোঙানি বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। কিছু লোক তা দেখে সেদিকে এগোতে লাগলো। আক্রমণকারী পুলিশেরা বেগতিক বুঝে কেটে পড়লো দ্রুতগতিতে। কলকাতার লিগ্যাল এড্ কমিটির কর্মী দীপা চক্রবর্তী এবং নাটক দেখতে আসা গ্রেট-ইষ্টার্ণ হোটেলের দু'জন কর্মচারী এগিয়ে এলেন সাহস কোরে, প্রবীরের সংজ্ঞাহীন দেহটিকে একটি ট্যাক্সি কোরে নিয়ে এলেন মেডিক্যাল কলেজে। একটু আগে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নাটক ভিয়েতনামের বীর শহীদ নগুয়েন ভ্যান ত্রয়ের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের যে অত্যাচারের ছবি সবার সামনে তুলে ধরেছিলো, তার অবিকল প্রতিচ্ছবি তাঁরা দেখতে পেলেন চোখের সামনে কোলকাতার বুকে।

মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত ডাক্তার প্রবীরকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। খ্যাত অখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এসে জমায়েত হলেন মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে। সবাই বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদে সোচ্চার। পুলিশের কয়েকজন হোমড়াচোমড়া অফিসার মেডিক্যাল কলেজে এসে নির্লজ্জভাবে জানালো— তারা মিছিলে আদৌ লাঠিচার্জ করে নি! আর প্রবীরের মৃত্যু? সে সম্পর্কে তারা নাকি কোনো খবরই রাখে না। তাদের মুখের সামনেই প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

তাদের সোচ্চার সমর্থন জানালেন সমবেত শিল্পী-সাহিত্যিকরা।

সেদিন রাতে মেডিক্যাল কলেজে জন্ম নিলো এক নোতুন ইতিহাস। দলমত নির্বিশেষে খ্যাত-অখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রবীরের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করলেন এক নোতুন মানসিকতা— সংস্কৃতির ওপর শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃপ্ত চেতনা। ভিয়েতনামের বীর শহীদ ন্‌গুয়েন ভ্যান ত্রয়ের গৌরবময় মৃত্যুবরণ ভিয়েতনামে ও দুনিয়ার দেশে দেশে জাগিয়ে তুলেছিলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ দুনিয়ার জনগণের মনে অভূতপূর্ব এক প্রেরণা। প্রবীর দত্তের গৌরবময় মৃত্যুবরণ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতেও জাগিয়ে তুলছে এক নোতুন প্রেরণা— প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, ফ্যাসিষ্ট রক্তাক্ত বিশে জুলাইয়ের স্মৃতি অমর হোয়ে থাক্ সবার মনে মনে। শাসকশ্রেণীর রক্তাক্ত আক্রমণের যথোপযুক্ত মোকাবিলা করার দৃপ্ত শপথ সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগ্রামের ইতিহাসে নোতুন প্রভাবের সূচনা করুক। রক্তাক্ত বিশে জুলাই এ দাবীই আজ করছে।

রক্তাক্ত বিশে জুলাই ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

- পুলিশ বলছে, বিশে জুলাই'র সভা ও মিছিলটা ছিলো 'নকশালপন্থীদের' মিছিল। অর্থাৎ পুলিশ দাবী করছে, 'নকশালপন্থী' হলেই তাদের ওপর আক্রমণ করার অধিকার পুলিশের আছে! এই দাবী নিয়েই গত ক'বছর ধরে তারা অসংখ্য বিপ্লবীকে খুন করেছে। কিন্তু তাহলে, 'নকশালপন্থী' হওয়াটাই অপরাধ— এই মর্মে কেন তারা আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছে না? মুখে 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের' বুলি আওড়াবো, আবার বিশেষ কোনো পন্থায় বিশ্বাসীদের গলা টিপে খুন করবো— এ বুজরুকি আর ক'দিন চলবে?
- কিন্তু বিশে জুলাই'র মিছিল কি সত্যি সত্যিই 'নকশালপন্থীদের' মিছিল ছিলো? প্রখ্যাত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতকার পরেশ ধর, সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পথিকৃৎ'— এরা কি আজ পুলিশ রিপোর্টে 'নকশালপন্থী' বলে বিবেচিত হচ্ছেন?
- পুলিশ বলছে, দেবর্ষি চক্রবর্তী নামে একজন 'ফেরারী আসামী'-কে তারা গ্রেপ্তার করে বলেই নাকি মিছিলকারীরা তাদের আক্রমণ করে। কিন্তু দেবর্ষি চক্রবর্তী কি ফেরারী? তিনি কি একটি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত নাট্যসংস্থার প্রকাশ্য কর্মী নন? কিছুদিন আগেও পুলিশ কি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ কোরে ছেড়ে দেয়নি? তাহলে কোন্ যুক্তিতে তাঁকে 'ফেরারী আসামী' বলে চিহ্নিত করা যায়?
- পুলিশ বলছে, সেদিন তারা নাকি লাঠিচার্জই করে নি! তাহলে এসপ্ল্যানেডের অগণিত লোক সেদিন যাদের লাঠি হাতে তাণ্ডব নৃত্য করতে দেখলো, তারা কারা? 'পথিকৃৎ'-এর বাদ্যযন্ত্র যারা লাঠির আঘাতে ভেঙে দিলো, তাদের একজন কর্মীকে আহত করলো— তারাই বা কারা? পুলিশ সত্যি কথা বলে— এমন কথা কেউ সাধারণতঃ বিশ্বাস করে না। তাদের বর্তমান বক্তব্য কি সাধারণের এই বিশ্বাসকেই প্রমাণিত করছে না?
- পুলিশ বলছে— সাংস্কৃতিক কর্মীরা নাকি ঢিল ও ছোরা ইত্যাদি নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেছিলো! কোথায় তার প্রমাণ? ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে একটা ঢিলও কি কেউ দেখতে পেয়েছেন? সেই ঢিলগুলি কি হাওয়ায় উড়ে গেল?
- পুলিশ বলছে, প্রবীর দত্তের মৃত্যু সম্পর্কে তারা নাকি কিছুই জানে না! তাহলে দীপা চক্রবর্তী, গ্রেট ইষ্টার্ণের কর্মী বাহাদুর প্রভৃতি যারা নিজের চোখে পুলিশের এই হিংস্র হত্যাকাণ্ড দেখেছে, তাদের 'মিথ্যাবাদী' প্রমাণ করতে হয়! পুলিশ তাতো করেই নি, উপরন্তু দীপা চক্রবর্তীকে বাড়ীতে গিয়ে ভয় দেখিয়েছে, বাহাদুরদের খোঁজে সেদিন রাত

দুপুরে গ্রেট ইস্টার্ণে গিয়ে হানা দিয়েছে। তারা যদি ভাজা মাছটি পর্যন্ত উল্টে খেতে না-ই জানে, তবে এসব কেন?

- পুলিশ বলছে, ময়না তদন্তের তথাকথিত রিপোর্ট পুলিশের কথার সত্যতাই প্রমাণ করছে! তাহলে পুলিশ কেন শেষ রাতে প্রবীরের মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে জোর কোরে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে ময়না তদন্ত করালো? কেন চারু মজুমদারের 'মৃত্যুর' ময়না তদন্ত করার জন্য কুখ্যাত ডাক্তারকে দিয়ে প্রবীরের ময়না তদন্ত করা হলো? কেন প্রবীরের মাকে ময়না তদন্তের সময় থাকতে দেওয়া হলো না? কেন প্রবীরের পিঠের আঘাতের চিহ্নকে "ও কিছু নয়" বলে এড়িয়ে যাওয়া হলো? কেন? কেন? কেন?
—এসব প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়েও পুলিশের বক্তব্য বিশ্বাস করবে— এমন মূর্খ কি এদেশে কেউ আছে?

অনীক, আগস্ট ১৯৭৪

দাগ

অমল মজুমদার

সকাল থেকেই বি. ডি. ও. অফিসের সামনে ভীড় জমে উঠেছে। ভীড় জমার নানা কারণেই সম্ভব— নতুন বীজ ধান, এককালীন অর্থ-সাহায্য কিংবা এগুলো না হওয়ার কারণে বিক্ষোভ-সমাবেশ। কিন্তু আজকের ভীড়ের কারণ একটু ভিন্ন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বাধীন সরকার মশাই এসেছেন সরকারী তদন্ত কমিশনের প্রধান হয়ে। আজ তার প্রকাশ্য অধিবেশন। অভিযোগে প্রকাশ, গত মাসের প্রথম দিকে কালীগঞ্জ থানার পশ্চিমে সাতগাছি নামে কোনো নিম্ন চাষী-প্রধান অঞ্চলে পুলিশ তল্লাশীর নাম কোরে জনসাধারণের উপরে নির্মম অত্যাচার চালায়। ফলতঃ দু'জন চাষী নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কালী সর্দার নামে এক উগ্র কৃষক নেতা এই অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ তল্লাশীতে গেলে এই অঞ্চলের চাষীরা বাধা দিতে আসে। লাঠি এবং তীর ধনুক ব্যবহৃত হয় বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশ দুই রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে এবং তাতে দু'জন চাষী নিহত হয়। পুলিশের তরফেও বেশ কিছু আহত হয়েছে।

কিন্তু ঘটনার পর থেকেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন যে, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় প্রচুর গুলি চালায় এবং যথেচ্ছ অত্যাচার করে।

আমরা সাংবাদিকরা এরকম অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের সাথে এত পরিচিত যে, এই রকম একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনায় যাই হোক না কেন, খুব একটা উত্তেজিত বোধ করি না। কিন্তু আজ উত্তেজনার কারণ অন্যত্র। গুলি চালানো এবং তাতে দু'জন চাষীর মৃত্যু— পাশবিকতার এই রূপকে আজকাল পশুরা খুব একটা লজ্জার কারণ বলে মনে করে না, কিন্তু এর যে আর একটা চেহারা আছে, তাকে কিন্তু আজও পশু সমাজ লুকিয়ে রাখতে চায়। তাই মহুয়া নামে কোনো এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে— এই অভিযোগ কালীগঞ্জ থানা ডিঙ্গিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মুখে প্রকাশ পেলে, ঘটনাটি আমাদের, অর্থাৎ সাংবাদিকদের, দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ গুলি চালানোর ঘটনার চেয়ে এই নারী ধর্ষণের অভিযোগই বেশী গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি করে। বিধানসভার বিরোধী সদস্য মন্মথ মণ্ডল কালীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত। ফলে অভিযোগের গুরুত্ব বেশ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীস্বাধীন সরকারের নেতৃত্বে সরকারী তদন্ত

কমিশন আজ কালীগঞ্জ বি. ডি. ও. অফিসে প্রকাশ্য অধিবেশনে বসছেন। আর এখানেই সাক্ষ্য দেবে মহুয়া নাম্নী উক্ত মহিলা, যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

যাই হোক, সকালবেলা আমরা একবার স্বাধীনবাবুর সাথে দেখা করলাম। উনি খুব স্বাভাবিক কারণেই তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও মন্তব্য করতে রাজী নন। এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী সরকার জানালেন, ইতিমধ্যেই তাঁর কমিশন, থানার দারোগা, উক্ত রাত্রে যে পুলিশ অফিসার তল্লাশী পরিচালনা করেন এবং জেলাশাসকের প্রাথমিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শ্রী সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্তের আসল সাক্ষ্যই দেবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এবং সমস্ত অভিযোগের সত্যতা কার্যতঃ নির্ধারিত হবে এদের সাক্ষ্যের উপর। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, অভিযোগের অবশ্যই গুরুত্ব আছে, এবং আছে বলেই সরকার নিজে তদন্ত না কোরে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। জানা গেলো, মহুয়া দেবী আজ দুপুরের কিছু পরে সাক্ষ্য দিতে আসবেন বলে . স্থানীয় এম এল এ, শ্রীমণ্ডল জানিয়েছেন।

আমরা বেরিয়ে আসতেই কিছু জনতা, গ্রামের দিকে যাঁরা নিজেদের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত মনে করেন এবং তার প্রমাণ হিসাবে শহরে ভদ্রলোকের সাথে গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন, সেই শ্রেণী আমাদের ঘিরে ধরলো। তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো, তবু যা হোক কোরে বেরিয়ে আসা গেলো। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো— এরা সবচেয়ে বেশী উৎসাহী মহুয়াদেবীর সাক্ষ্যে। তাই আমি এবং বন্ধু ফটোগ্রাফার মিলনবাবু প্রায় একই সঙ্গে ঠিক করলাম— সাতগাছি গিয়ে মহুয়াদেবীর সাথে দেখা করতে হবে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ যাঁরা গ্রামের পথে আসেন, পথে পথে ঘুরে বেড়াতে তাঁদের ভীষণ আনন্দ। পালক যেমন ঝোড়ো বাতাসে ঠিকানাহীনভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে, তেমন এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন পথ চলায় তারা হঠাৎ কোরে মুক্তির স্বাদ পেয়ে বসেন। বাঁশবনের বাণিজ্যিক মূল্যই হয়ত প্রধান, তবু শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে সাতগাছি অভিমুখে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায়ই এদিক ওদিক চাইতে ইচ্ছে করছিলো। হাঁটুর উপর কাপড়ের অধিকাংশই কোমরে গুঁজে গ্রাম্যরমণী মাঠের কাদায় ছোট ধানের চারা বুনে চলেছে, আর বহুদূর থেকে ধুতি-শার্ট পরা ভদ্রলোক মাথায় ছাতা দিয়ে এগিয়ে আসছে, সবটাই ভারি ভালো লাগে। মিলনবাবুও বেশ উপভোগ করছিলেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটে আমার ভালো লাগা প্রকাশ করতেই মুচকি হেসে তিনি বললেন— এ চোখের ব্যারাম! হবে হয়তো!

ঘন্টাখানেক হাঁটার পরে সাতগাছি পৌঁছোলাম। প্রায় প্রত্যেকেই সন্দিগ্ধ চোখে চাইছে, আমাদের পরিচয় জানিয়ে আমরা আশ্বস্ত করছিলাম। ছোটো ছোটো মাটির বাড়ী। কালো কালো শিশুর দল, সবাই ন্যাংটো, সাত-আট বছর অবধি কারো পরনেরই কিছু নেই। প্রত্যেকটি শিশুর উদর স্ফীত, পিলের ভারে। আমরা অল্পকালের মধ্যেই এদের দ্রষ্টব্য বস্তু

হয়ে গেলাম। নাভির চারপাশে ধুলো লেগে, হাঁটু অবধি মাটি লেগে ধূসর, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নির্বাক মুখে অথচ বিস্ময়ে সরব চোখে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। গ্রামের পথে সার্কাসের প্রাণীগুলোকেও সম্ভবতঃ এরা এই চোখেই দেখে থাকে। মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে চাষী-রমণী ঘোমটার আড়ালে আমাদের লক্ষ্য করছিলো, সম্ভবতঃ চোখে চোখ পড়তেই আড়াল হয়ে গেলো। গল্পের বইয়ে এমনটি জেনেছি, আগেও দু'একবার দেখেছি। কিন্তু একমাত্র শিশু ছাড়া আর সকলেরই মুখ বিমর্ষ এবং আতংকিত বলে মনে হলো।

একজন প্রধান গোছের আমাদের পরিচয় জানার পর, মৃত চাষীদের পরিবারে নিয়ে গেলেন। আমরা গেলাম। কান্নার আওয়াজও পেলাম, তবে মনে হলো, কান্নাটাও অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে, এই আশংকায় তা রুদ্ধ।

মহুয়া দেবীর বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। ধারণা ছিলো, হয়তো প্রচুর লোকের সমাগম দেখব, হয়তো সমস্ত বাড়ীতে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ ব্যস্ততা লক্ষ্য করবো। কিছুই না। কিন্তু এক অজানা অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা যেন সর্বত্র বিরাজ করছে।

আলাপ হলে বুঝলাম, দেবী বলার প্রয়োজন নেই। নেহাত ছোটো মেয়ে মহুয়া— কিশোরী। গায়ের রং কালো। আধময়লা শাড়ী পরে এসে বসলো। ভীত চোখে আমায় একবার দেখে চোখ নামিয়ে নিলো। বুঝলাম, চোখ তুলে চাইতেও বেচারীর কষ্ট হচ্ছে।

গভীর রাতে মাটির মেঝেয় মহুয়া ঘুমিয়ে ছিলো। বারান্দায় দাদা শোয়— বিছানায় বাপ। মা নেই, বহু আগে গত। গ্রামে এখনও মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। আলো বলতে সূর্যের আলো। কুপির আলো নেহাৎই নগণ্য। তাই বেশী রাত অবধি জেগে থাকাটা নিয়ম বিরুদ্ধ। হঠাৎ দাপাদাপি চীৎকারে মহুয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে উঠে দেখে, বাপ-দাদা উঠে দরজা খুলে বাইরে— হাতে লাঠি।

আমি নোট করছিলাম দ্রুত। কেন না পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ ছিলো— অধিবাসীরা লাঠি এবং তীর ধনুক সহকারে বাধা দেয় পুলিশ বাহিনীকে। জিজ্ঞেস করলাম— লাঠি হাতে কেন?

—ভাবলাম কি, ডাকাত পইরেছে বুঝি! আমিও তো কাঁচি লিইছিলাম!

—তারপর?

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তারা বুঝতে পারে, এ বাহিনী ডাকাতের চেয়ে বড়ো এবং সাংঘাতিক কিছু, কেন না বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এ আওয়াজ এদের অচেনা নয়।

বাপ-দাদারা লাঠি হাতেই দৌড়ে গেলে, আমিও ওই দিকে যাবো কিনা বারান্দার ওই খুঁটি ধরে দাঁইড়ে দাঁইড়ে ভাবতেছিলাম— মহুয়া আমায় খুঁটিটা দেখায়।

আমি মহুয়ার মুখের দিকেই চেয়েছিলাম। মলিন, অথচ কী সুন্দর! আমি কথা বলতে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে— এই রমণীয় অবস্থাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলো যে বর্ব্বর, সম্ভবতঃ পৃথিবীর হিংস্রতম জন্তু সে!

খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ঘুম জড়ানো চোখে সে ওই দিকের অন্ধকারে চেয়েছিলো। আশংকো বাপ আর দাদাকে কেন্দ্র কোরে— কেননা গুলির আওয়াজ চীৎকার চেঁচামেচি সমস্ত কিছুর উৎস তখন সামনের ওই ভয়ানক অন্ধকার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁচি ধরা হাতটাকে চেপে ধরে। হাত থেকে কাঁচিটা পড়ে যায়— মহুয়া চীৎকার কোরে ওঠে। কিন্তু সেই চীৎকার বৃহত্তর আওয়াজের কাছে পরাজয় স্বীকার কোরে নেয়।

সমস্ত রকমের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য কোরে সেই শয়তান— মহুয়া শয়তানের চেয়ে বড়ো গালি জানে না— সেই শয়তান তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পাশের ওই জঙ্গলের দিকে। দুটো থাবা— আর যেন বলতে পারে না মহুয়া— দুটো থাবা তাকে বার বার আঘাত করতে থাকে। বুকের পাঁজর খুলে যাবে বলে মনে হতে থাকে। শকুনের ঠোঁটের মতো শয়তানটার ঠোঁট তার সমস্ত মুখে চোখে ঠোকরাতে থাকে। খ্যাপা শেয়ালের মতো তাকে কাবু কোরে গিলে ফেলতে চায়। মহুয়া বলে, যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারছিলো যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রতিবাদ করার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে, আত্মসমর্পণই হবে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ— কিশোরী হলেও সে তখন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অপরাধের শিকার— আগুন দিয়ে ঝল্‌সে ঝল্‌সে তার মাংস খুবলে খুবলে খেতে চাইছে একটা শকুন— মহুয়া তখনই তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলো তার দাঁতে।

নরম ঠোঁটে মহুয়া বলে চলেছে তার কাহিনী। আমার কলমের নিব ঠিক সেই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করায় একটু ছেদ পড়লো। মিলনবাবু এক গ্লাস জল চাইলেন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান গোছের লোকটার কাছে।

বাঁচবার তাগিদ তখন চরমে পৌছে গেছে। মহুয়া সমস্ত শক্তিতে সেই লোকটির, কাঁধে রাইফেল যার, রাইফেল উপেক্ষা কোরে থুতনিতে কামড় বসিয়ে দেয়।

এক কিশোরী পরিশ্রম কোরে তার রক্ত-মাংস গড়ে তুলেছে, আর সেই রক্তে-মাংসে পড়েছে সরাসরি আঘাত! কামড় তাই মরণ কামড়। শয়তানেরও যন্ত্রণা আছে। কিন্তু, নির্মম পরিহাস, শয়তানের চীৎকারও পৌছোতে পারে না তার বন্ধুদের কানে। পৌছোলে কি হতো, তা মহুয়া জানে না। শুধু এইটুকু মনে আছে, তার কামড়ে থুতনির মাংস উঠে এসেছে সেই শকুনটার— রক্ত তার ঠোঁটে জিভে লেগেছে— কিন্তু লোকে যে বলে রক্তের স্বাদ নোনতা, তা সে বুঝতে পারেনি।

দৌড়ে পালিয়ে এসেছে মহুয়া। সে জানে ও দাগ সহজে ওঠার নয়। আমায় সে স্পষ্ট কোরেই জানালো— ওই দাগ দেখেই সে আসামীকে চিনতে পারবে। ওই দাগ তার আমৃত্যু বহন করবে এক কিশোরীর মর্ম বেদনাকে। দাগী আসামী! এ রমণীয় প্রতিবাদের ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ।

আমার ধারণা ছিলো মহুয়া হয়তো মিছিল কোরে আসবে। শ্রীমণ্ডল আমায় তেমনই জানিয়েছিলেন। তাঁর দলের পক্ষ থেকেই ওই মিছিলের ব্যবস্থা। কিন্তু দুপুরবেলা মহুয়া যখন এলো— অনেকেই তখন জানতে পারেনি।

আমি দুপুরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম, হয়তো সেই দাগী পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের পাপের ছাপ থুতনিতে বহন কোরে। বাংলার রমণীর শৌর্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থান পাবে এই কিশোরী।

আজ বিচারালয়ে প্রকাশ পাবে পাশবিকতার এই কুৎসিত উদাহরণ। বৃটিশ সরকার দুশো বছর ধরে এই পুলিশবাহিনীর অবলা-নিধন-যোগ্যতা গড়ে তুলেছে সম্ভবতঃ বাংলার এই মহুয়াদের বুকে। সেই শকুনটা রাতের অন্ধকারে যে মহুয়া চুরি করতে গেছিলো মহুয়ার, ঠোঁটে থুতনিতে নিয়ে এসেছে সে দাগ— পাপের চিহ্ন।

আজ যখন প্রকাশ পাবে এ সংবাদ— সেই শয়তান কোথায় লুকোবে? কোন্ নির্জন বনে ঘুরে ঘুরে আপস করতে চাইবে শৃগাল-কুকুর বাহিনীর সাথে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ধড়মড় কোরে উঠেই ছুটে যাই বি. ডি. ও. অফিসে। দেরী হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ মহুয়ার সাক্ষ্যও শেষ। অবশ্য আমার তাতে কোনও ক্ষতি নেই। ক্ষতি নেই কেননা সবটাই আমি আগেই জেনে ফেলেছি। সেই দাগী শয়তানকে গ্রেপ্তার করতেই হবে— কেননা, প্রকাশ্য বিচারালয়ে এ সংবাদ প্রকাশ পেলে চেপে যাবার কোনও উপায় নেই।

আমার অনুমান ঠিকই। মহুয়ার সাক্ষ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যে সংবাদের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, সে সংবাদ হলো— মহুয়া সাক্ষ্য দেয়নি। দেয় নি! চমকে উঠলাম। কেন দেয় নি! কেউ ভয় দেখিয়েছে! লজ্জায় কাতর হয়ে পড়েছিলো! নাকি, স্বাভাবিক সংকোচ বোধ! কিংবা আরও জটিল কোনো ঘটনা, চক্রান্ত!

দেখলাম, এ প্রশ্নগুলো সবার মুখেই ঘুরছে। কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বভাবতঃই আমার পক্ষে এটা ক্ষতিকারক হয়ে পড়লো। আমি সাংবাদিক, সমস্ত খবর ইতিমধ্যেই সংগ্রহ কোরে ফেলেছি— এই আত্মপ্রসাদে বিচারালয়ে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে আমার হলো না— এটাই ক্ষতিকারক।

শ্রীমন্মথ মণ্ডল, বিধানসভার সদস্যের সংগে আমি সাক্ষাৎ করলাম। জানতে চাইলাম, যাকে নিয়ে এত রৈ-রৈ, সাক্ষ্যের কাঠগড়ায় ওঠা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিতে সে বিমুখ হলো কেন? শ্রী মণ্ডলের মুখে শুনলাম— বুঝলাম, আমার আশংকাই সত্যি। কাঠগড়ায় উঠেও সে কথা বলতে পারে নি, নেমে গেছে। তাকে কেউ নিঃসন্দেহে ভয় দেখিয়েছে। কেন না, সংকোচ যদি হতো— হতেই পারে, নারীর চূড়ান্ত ক্ষতির সাথে লড়াই করতে হয়েছে মহুয়াকে— তা হলেও সে সাক্ষ্য দিতে পারতো। কারণ, বিচারকক্ষে সে যখন কথা বলতে পারলো না— সমস্ত দর্শককে বের কোরে দেওয়া হয়েছিলো। শ্রী মণ্ডল জানালেন সম্ভবতঃ তাকে আগেই ভয় দেখানো হয়েছে।

একটা টেলিগ্রাম কোরে এসে মিলনবাবুকে বললাম রাতের ট্রেণে কলকাতায় ফিরে যেতে, আমি থেকে যাবো।

— কেন?

— কেননা, সাংবাদিক হিসাবে আমার কর্তব্য অর্ধ-সমাপ্ত। মহুয়ার সাক্ষ্য দিতে না

পারাটা রহস্যজনক। পুরো ব্যাপারটা না জেনে আমি যেতে পারছি না।

সন্ধ্যের ট্রেনে মিলনবাবুকে তুলে দিয়ে আমি সাতগাছিতে পৌঁছলাম। অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সব মিলিয়ে আমি ভাবছিলাম, এরকম কোনও অন্ধকার রাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিলো।

রাতে আমার স্পষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিলো। কারণ, সাতগাছি গাঁয়ের খবর— কমিশনের সাথে সবাই চলে গেছে। অতএব, আমার থেকে যাওয়াটা রহস্যজনক।

প্রধান গোছের লোকটা আমায় চিনতে পারলেন। কালো মোটা লোকটিকে এখন দৈত্য বলে মনে হচ্ছিলো। চোখ দুটো লাল দেখেই বুঝলাম এদের রাত গভীর হয়েছে, যদিও ঘড়িতে আমার তখন আটটা বাজে মাত্র। মহুয়া কি ঘুমিয়ে পড়েছে? গিয়ে দেখি— না। একটা কাঁচিতে সে ধার দিচ্ছে কুপি জ্বালিয়ে। কুপি জ্বালিয়ে, অর্থাৎ রাতেই ধার দেওয়াটা বিশেষ দরকার। আমার ভয় করছিলো— মেয়েদের কাস্তে ধার দিতে কখনও দেখিনি, এমনকি ছুরিও না। আমায় দেখে একটু হাসলো মহুয়া। ভয়টা কাটলো। জানতে চাইলাম— সাক্ষ্য দিলে না কেন সে?

—"কী হবে?" নির্লিপ্ত জবাব! তবে তো আমার আশংকা ভুল। মহুয়া স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে। আমি বললাম— হয়তো তোমার হারানো সম্মান ফিরে পাওয়া যেতো না— কিন্তু দোষীর শাস্তি হতে পারতো। মহুয়া একটু চুপ কোরে রইলো। কিন্তু তারপর সে যা জবাব দিলো তার জন্য মোটেই তৈরী ছিলাম না। সাক্ষ্যের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মহুয়া সোজা বিচারকের দিকে চেয়ে দেখেছিলো— বিচারকের থুতনিতেও সেই একই দাগ। তারপর মহুয়া আর কী কোরে সাক্ষ্য দেয়?

অনীক, আগস্ট, ১৯৭৪

তুমি কি পাথর তবু?

জয়ন্ত চৌধুরী

তোমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ের শরীর
অজগর হবে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসছে
বড়বাজার থেকে—লালবাজার থেকে—
পার্কস্ট্রীট—বালিগঞ্জ—নিউ আলিপুর থেকে—
গড়িয়াহাট ব্রীজ থেকে—
রাতের পাখীর মত কালো অন্ধকার
হিমেল ছোঁয়াচ নিয়ে।

অজস্র আঘাতে, ভীষণ ভয়ে
তুমি পাথর হয়ে আছো
উল্টোডাঙ্গা বস্তিতে— শেয়ালদা ষ্টেশনে—
রাজাবাজারের অন্ধ গলিতে—
বিশ্বাসহীনতায় বিবর্ণ হয়ে,
যন্ত্রণায় নীল হয়ে।

এখন তোমার ভয় করে না,
রাগে শরীর ফেটে পড়ে না,
বেদনায় ককিয়ে ওঠো না,
ভালবাসায় স্ত্রী-র আদরেও গলে যাও না,
মিছিলে পায়ে পা মিলিয়ে স্বপ্ন দেখো না!

তুমি এখন বেশ্যাগৃহ থেকে ফিরে-আসা
দেশপ্রেমিক নেতার ক্লান্তিকর বক্তৃতায় অভ্যস্ত,
ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকাটাই তোমার কাছে স্বাভাবিক,
দুশ্চিন্তা তোমার নিত্যসঙ্গী,
বয়সের অনিবার্যতার ডিনামাইটের মত আতঙ্ক তো
তোমার সঙ্গে একই বালিশে মাথা রেখে রাত্রি যাপন করে!
পাথরের মত তুমি নিরুত্তেজ, কী ভীষণ স্থির!

শহরে মানুষ নেই,
ভয়ের শরীর নিয়ে অজগর রাত
দাঁড়িয়ে রয়েছে, দ্যাখো, প্রবল প্রতাপে,
অথচ তবুও তুমি ভয় পেতে ভুলে গেছো, হায়,
সাহসীর মত তুমি একবারো চেঁচিয়ে উঠো না :
    জ্বলে যাচ্ছে আমার শরীর প্রচণ্ড ঘৃণায়,
    রাগে, ক্ষোভে দুর্বিনীত ইচ্ছের ছিলায়!

মাটিতে আগুন জ্বলে, জল বিষে ভরা।
এ-আগুন, এই বিষ টেনে নাও বুকের ভিতর,
অস্ত্রের ভাণ্ডার খোলো, হাতে হাতে তুলে নিয়ে এসো
জরুরী কৃপাণ, বর্শা, আরো যা যা লাগে নিয়ে নাও।
তারপর নিশানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও,
ভল্ল, তীর, কাস্তে আর লাঙলের ক্রোধ।

তুমি কি পাথর তবু? এসব না পারলেও
অন্ততঃ একবার মানুষের মত উঠে দাঁড়াও
অন্ততঃ একবার নাড়াচাড়া দাও
তোমার প্রস্তরীভূত ক্লীব অস্তিত্বকে
আগ্নেয়গিরির মত— মানুষের মত।

অনীক, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

চুপচাপ বসে আছো কেন?

অমিত দাস

প্রত্যেক দরজায় কড়া নেড়ে বলবো :
"এখনো চুপচাপ বসে আছো কেন?"

আমাদের দুর্দশা সইতে না পেরে
সারাদিন
আকাশ তাকিয়েছিলো সূর্য চোখে!

আর এখন
বাইরে এসে দেখো
অন্ধকার রাতের আকাশে কালপুরুষ
তার খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়েছে
তারারা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে
আমাদের জাগাবে বলে।

প্রতিটা দরজায় কড়া নেড়ে বলবো :
"এখনো চুপচাপ বসে আছো কেন?"

অনীক, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

আজ এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে নেমে এসেছে অভূতপূর্ব এক দুর্ভিক্ষের ছায়া। দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধার্ত হাহাকার। গ্রাম থেকে দলে দলে নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ শহরে আসছে খিদের তাড়নায়, যা পাচ্ছে তাই খেতে বাধ্য হচ্ছে। ঘাস ও কুকুর বিড়ালের মাংস পর্যন্ত আজ খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, এমনকি ক্ষুধার্ত মা'র ছেলের মাংস পর্যন্ত পুড়িয়ে খাবার মতো নিদারুণ ঘটনার কথাও শোনা যচ্ছে। শাসকশ্রেণী ও তাদের ভাড়াটে প্রচারকের দল পর্যন্ত আজকের এই নির্মম বাস্তবকে ঢেকে রাখতে পারছে না। প্রতিদিন সংবাদপত্রের ছবি আর রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে ক্ষুধা-বঞ্চনা-অনাহার-অর্ধাহার ও মৃত্যুর বীভৎস ছবি— 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' ভারতবর্ষের দিকে দিকে আজ জেগে উঠেছে দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের এক ভয়াল পদধ্বনি।

'স্বাধীনতার' পরবর্তী সাতাশ বছর ধরে ক্ষুধা-অনাহার-অর্ধাহার ও মৃত্যুর এই অবিরাম মিছিল পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' এই ভারতবর্ষের একটা চিরস্থায়ী ছবি হলেও, এমুহূর্তে সেটাই আজ পৌঁছে গেছে এক চরম বিন্দুতে, বিভীষিকাময় পঞ্চাশের মন্বন্তরকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। দেশের সমস্ত বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা ও মন্ত্রী-আমলাদের মুখেও যখন শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের বার্তা, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের সভাপতি পর্যন্ত শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই অন্ততঃ এক হাজার লোকের অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন— তখনও জেলায় জেলায় লোক-দেখানো লঙ্গরখানা খোলার আড়ালে চলছে শাসকদলের গ্রুপগত রাজনীতি আর লুটের মাল ভাগাভাগির খেলা, চলছে মজুত উদ্ধার আর স্মাগলার-দমনের ভাঁওতাবাজী, আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার দাড়ির জঙ্গলে লজ্জার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লুকিয়ে রেখে নিউইয়র্কে বসে ঘোষণা করেছেন— ভারতে পাঁচ শতাংশের বেশি লোককে খাদ্যাভাব স্পর্শ করতে পারেনি, আর অনাহারে একজন লোকেরও মৃত্যু হয়নি। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত!

গত সাতাশ বছর ধরেই এদেশের বর্তমান উজীর-বাদশা-সম্রাজ্ঞীর দল অম্লানবদনে শুনিয়ে এসেছেন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার আকাশকুসুম গালগপ্পো, আর বছর বছর দেশজোড়া ক্ষুধার্ত হাহাকার তীব্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে তাদের এই নির্মম রসিকতাকে ব্যঙ্গ কোরে। আজ তারাই আবার নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য শোনাচ্ছেন বিশ্বজোড়া সংকটের কথা, এই দুর্ভিক্ষকে 'সাময়িক' একটা ব্যাপার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। কিন্তু বাস্তব তথ্যই তাদের সমস্ত বোলচালের স্বরূপ উদঘাটিত কোরে দিচ্ছে।

কারণ আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের চিরস্থায়ী রাজত্বের কারণটা লুকিয়ে রয়েছে এদেশের শোষণভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, ভূমিব্যবস্থার মধ্যে। সেকারণেই কোটি কোটি মেহনতী জনতার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাদের রক্তজল করা শ্রমের ফসল আত্মসাৎ কোরে সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে রংবেরঙের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের তাঁবেদার দেশী মালিকদের দল, জোতদার-মহাজনদের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ চীন আজ তার বিপ্লবের পঁচিশতম বার্ষিকী উদযাপন করছে বিপুল গৌরবে ক্ষুধা-অনাহার-বঞ্চনা ও শোষণের ইতিহাসকে পেছনে ফেলে। চীনা সমাজের শোষণের ভিত্তিটাকেই উপড়ে দিয়ে চীনের মহান জনগণ এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। মহান ভারতীয় জনগণও সেই কাজটা অবশ্যই সম্পন্ন করতে পারেন ভারতের শোষণের রাজত্বটাকেও উপড়ে ফেলে। শাসকশ্রেণীর শত চেষ্টাতেও ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যটাকে চেপে রাখা যাবে না।

আর ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে ইতিহাসের পদধ্বনি। শাসকশ্রেণীর কাছে শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে ক্ষুধার্ত জনতা আজ নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছেন ইতিহাসের রথের রশি, মজুত করা খাদ্যভাণ্ডার কেড়ে নিয়ে ভাগ কোরে নিচ্ছেন নিজেদের মধ্যে, গড়ে তুলছেন প্রতিরোধ। কিন্তু জনতার এই বিস্ফোরণ তো এই পশ্চিমবাংলাতেই প্রচণ্ডভাবে ঘটেছে ১৯৬৬ সালে, ১৯৬৯ সালে— কিন্তু শোষণ থেকে মুক্তি তো আসেনি! জনতার এই ন্যায্য বিস্ফোরণগুলি শোষণ-মুক্তির চূড়ান্ত উজ্জ্বল দিনটিকে তো নিয়ে আসতে পারেনি! আজ কি পারবে? না, পারবে না— যদি পার্লামেন্টারী দলগুলির নির্দেশিত পথে ভোটের লড়াইয়ে জিতবার হাতিয়ার হিসেবে এই সব গণ-সংগ্রামগুলিকে সীমাবদ্ধ কোরে রাখা হয়। এই বাস্তব সত্যটি এদেশের ব্যাপক জনগণও আজ ধরে ফেলেছেন, আর সেকারণেই এই সব পার্লামেন্টারী বামপন্থী দলগুলির আয়োজিত প্রাক্-পূজা গতানুগতিক 'বিরাট আন্দোলনের' ডাকেও কেমন সাড়া মিলছে না।

আবার অন্যদিকে জনগণের লড়াইয়ের পথের দিশারী বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে মতদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্য গড়ে তুলবার অবশ্য ও আশু প্রয়োজনীয়তাকে যদি শুধুমাত্র কথার কথায় সীমাবদ্ধ রাখেন, জনগণের দুঃখকষ্ট নিয়ে শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই নিয়ে সোচ্চার উৎসাহ প্রকাশ কোরে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না। আজকের অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ এটাই দাবী করছে যে, বিপ্লবীদের দ্রুত সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, এদেশের ও অতীতের সংগ্রামগুলির ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের কোটি কোটি শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের রণনীতিগত সঠিক লাইন খুঁজে বের করতে এবং প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এবং একমাত্র সেটাই হবে আজকের হাহাকার ও অনাহার থেকে মুক্তির লং মার্চের পথে একটা বাস্তব পদক্ষেপ।

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪

আজকের চীন/১

দীপ্তি চৌধুরী

এবছরের পয়লা অক্টোবর চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের পঁচিশতম বার্ষিকী প্রতিপালিত হলো। আজকের দুনিয়ায় চীন সম্পর্কে যে কোনো লোক যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করুন না কেন, চীনকে এড়িয়ে যাবার উপায় কারও নেই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে : কেন আজ চীনের অস্তিত্বটা সবার কাছে এতো বেশি কোরে অনুভূত হচ্ছে? একজন ভারতীয় হিসেবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আজকের চীন সম্পর্কে যে সব চিন্তা মনের মধ্যে আনাগোনা করছে, সেগুলোকেই আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

এক

আজকের চীনকে বুঝতে গেলে প্রথমেই শুরু করতে হয় অতীতের চীনকে দিয়ে। দেশ হিসেবে চীন অতি প্রাচীন, আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মতো চীনের সভ্যতাও এককালে অত্যন্ত উন্নত ছিলো। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছলে-বলে-কৌশলে চীনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে চীনকে শোষণ ও লুণ্ঠন করতে থাকে; চীনের মহান জনগণ বারবার তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরে গেছেন। অবশেষে ১৯৪৯ সালে মহান নেতা মাও সেতুঙের পরিচালনাধীন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব বিজয় অর্জন করেছিলো, চীন মুক্তি অর্জন করেছিলো।

প্রাক্-বিপ্লব চীন ছিলো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ (কিছু সময়ের জন্য অংশতঃ ঔপনিবেশিকও বটে)। অর্থনীতির দিক থেকে তা ছিলো কৃষি-প্রধান ও অত্যন্ত অনুন্নত। বেকার সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব প্রভৃতি তখন ছিলো চীনা জনগণের জীবনের সাধারণ ঘটনা, দুর্ভিক্ষ-অনাহার ও মৃত্যু ছিলো নিত্য সঙ্গী। কোটি কোটি চীনা জনগণের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করতো সাম্রাজ্যবাদী, মুৎসুদ্দি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি এবং সামন্ত জমিদারের দল— আর ব্যাপক জনগণ বাঁধা থাকতেন দারিদ্রের চিরস্থায়ী বন্ধনে, শোষণ ও নিপীড়ণের নির্মম নাগপাশে। এটাই ছিলো চীনের সাধারণ অবস্থা।

মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে চীন-বিপ্লবের সাধারণ দিক্‌নির্দেশ, রণনীতি ও রণকৌশল সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছিলো। লেনিন শিখিয়ে গেছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার পুঁজিবাদ যখন

তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে গেছে ও ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে, তখন কোনো দেশের অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব আর বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, সর্বহারাশ্রেণীকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তর হিসেবে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। লেনিনের এই শিক্ষাকেই মাও সেতুং চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ ঘটান ও বিকশিত করেন। চীনের পার্টি গণফৌজ, ঘাঁটি এলাকা ও যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলে এবং সশস্ত্র জনযুদ্ধের মাধ্যমে চীন-বিপ্লবকে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়। লেনিন মার্কসবাদী তত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন রাশিয়ার মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে চীনের মতো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন মাও সেতুং। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অবস্থা যেহেতু কম-বেশি প্রায় প্রাক্-বিপ্লব চীনেরই মতো, অতএব তাদের কাছে চীন-বিপ্লবের শিক্ষা প্রায় সর্বজনীন এক বিপ্লবের মডেল হিসেবে বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

১৯৪৯ সালে চীন-বিপ্লবের প্রথম স্তরে বিজয় অর্জিত হলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন যে নয়া চীন জন্ম নিলো, ব্যাপক ভূমি সংস্কার ঘটিয়ে এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিকানায় মূলগত রূপান্তর ঘটিয়ে ১৯৫৬ সালে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ সম্পূর্ণ হয়েছিলো। বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে সফল উত্তরণের ব্যাপারেও চীন দুনিয়ার নোতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হবার পরেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটেনা, বরং নোতুনতর ও ব্যাপকতর ভাবে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা পুনরায় ক্ষমতা দখল কোরে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার গোপন ও প্রকাশ্য চক্রান্ত চালাতে থাকে। লেনিনের এই শিক্ষাকে চীন ভোলে নি। বিশেষতঃ স্তালিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতাদখলকারী সংশোধনবাদী চক্র যেভাবে ধীরে ধীরে সেদেশে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছিলো, তার নেতিবাচক দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি মাও সেতুঙের নেতৃত্বে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলো। এই সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই ১৯৬৬ সাল থেকে চীনে শুরু হয়েছিলো মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে ব্যাপক জনগণকে সক্রিয় কোরে তুলে এবং লিউ শাও-চি চক্রের পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে বিধ্বস্ত কোরে দিয়ে এই বিপ্লব কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে ধূলিসাৎ কোরে দেবার ব্যাপারে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো।

সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পথে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত যে চলতেই থাকে, এবং তা ঠেকাবার জন্য বারবার যে এরকম সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ১৯৭১ সালে লিন পিয়াও চক্রের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে ধ্বংস কোরে দিয়ে চীন তারও প্রমাণ দিয়েছে। জনগণ, এবং একমাত্র জনগণই যে ইতিহাসের স্রষ্টা, এবং জনগণের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিপ্লব চালিয়ে যাওয়াই যে ইতিহাসের স্রষ্টা

জনগণ কর্তৃক পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ব্যর্থ করার মৌলিক গ্যারান্টি, ১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে শুরু কোরে ১৯৭৩-৭৪-এর লিন পিয়াও ও কনফুসিয়াসকে সমালোচনার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারই সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলেছে।

অর্থাৎ এককথায়, চীন-বিপ্লবের বিজয় থেকে আজ পর্যন্ত চীনের অভিজ্ঞতা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সামনে বিভিন্ন মৌলিক শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, নিজ নিজ দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে যার প্রয়োগ বিভিন্ন দেশের সর্বহারা পার্টি ও জনগণকে নোতুন নোতুন বিজয়ের পথে নিয়ে যাবার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে।

দুই

সংশোধনবাদীরা হচ্ছে সর্বহারা বাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুচর, মার্কসবাদের বুলি আউড়ে মার্কসবাদকে বিকৃত করা এবং এভাবে বিপ্লবকে বিপথে চালিত কোরে প্রতিক্রিয়াশীলদের সেবা করাটাই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মৌলিক দায়িত্বই হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। আজকের যুগে আধুনিক সংশোধনবাদের প্রধান পাণ্ডা সংশোধনবাদী রুশ শাসকচক্র-সহ দুনিয়ার বিভিন্ন সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে এই মৌলিক দায়িত্বই চীন পালন কোরে চলেছে অবিচলভাবে ও নীতিনিষ্ঠভাবে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হিসেবে চিত্রিত করে, যে কোনো যুদ্ধই আণবিক বিশ্ব-যুদ্ধে পরিণত হয়ে দুনিয়ার ধ্বংস আনবে— এই অজুহাত দেখিয়ে সমস্ত রকমের যুদ্ধেরই বিরোধিতা করে, এবং এভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষা করে। এর বিপরীতে চীন সঠিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল যে আসলে কাগুজে বাঘ— এই সত্য তুলে ধরেছে, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস কোরে দুনিয়া থেকে যুদ্ধের আশংকা চিরতরে দূর করার আহ্বান জানিয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য জনযুদ্ধকে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন ও সাহায্য কোরে এসেছে। একারণেই আজ দুনিয়ার জনগণ চীনকে তাদের লড়াইয়ের সাথী ও প্রেরণা বলে মনে করেন।

'নোতুন যুগের' দোহাই দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথে ভোটের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংশোধনবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা কোরে চীন সঠিকভাবেই দেখিয়েছে যে, ভোটের মাধ্যমে শাসন বদলালেও শোষণ বদলায় না, শোষণের হাতিয়ার বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না কোরে কখনই সর্বহারা একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। অতীতের অসংখ্য দৃষ্টান্তের মতো চিলির সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানও চীনের বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করেছে। এবং দুনিয়ার প্রকৃত বিপ্লবীরা চীনের শিক্ষা অনুসারে নিজের নিজের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে স্থান-বিশেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও, ভোটের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংশোধনবাদী তত্ত্বকে আবর্জনাস্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের

মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস কোরে সর্বহারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে (Principle) একটি রণনীতিগত প্রশ্ন হিসেবে হাজির করে, এবং একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সে দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের শ্রেণীসংগ্রামকে স্তব্ধ কোরে দেবার চক্রান্ত চালায়। এর বিপরীতে চীন সঠিকভাবেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে রণকৌশল হিসেবে দেখাচ্ছে এবং কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে কোনো পুঁজিবাদী দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে জনগণের শ্রেণী-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মৌলিক দায়িত্বকে সমর্থন করছে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বকেই আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিত্রিত কোরে দুনিয়ার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চক্রান্ত চালায়। এর বিপরীতে চীন সঠিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, আজকের দুনিয়ায় বিশ্ব-বিপ্লবের চালিকাশক্তি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ দুটি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও সর্বহারা পার্টিগুলির নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ ও জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এবং এর ফলেই সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও চীন দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করছে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে একটা পুঁজিবাদী দেশেও তথাকথিত অ-পুঁজিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা এবং তা থেকে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রার সম্ভাবনার তত্ত্ব হাজির কোরে নিজেদের নয়া উপনিবেশবাদী শোষণের জাল বিস্তৃত করার চক্রান্ত চালায়। এই কুৎসিত তত্ত্বের আড়ালেই তারা ভারতকে তাদের সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। আর এর বিপরীতে চীন সঠিকভাবেই বলেছে যে, কোনো পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে সেদেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে কিছুটা সাহায্য করা গেলেও, চরিত্রগত বিচারে সে দেশ পুঁজিবাদীই থেকে যায়, এবং কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই সে দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে পারে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা যে কোনো দেশের শোষণ-মুক্তির লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং এভাবে বিপ্লব রপ্তানি করার নাম কোরে অন্য দেশে আগ্রাসন চালায়। এর বিপরীতে চীন সঠিকভাবেই কোনো দেশের শোষণ-মুক্তির লড়াইকে মূলতঃ ও প্রধানতঃ সে দেশের জনগণের ওপরেই নির্ভরশীল বলে মনে করে,

এবং সমাজতান্ত্রিক সাহায্যকে গৌণ সহায়ক বলে মনে করে। চীন তাই এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশে বিপ্লব রপ্তানি করার প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকে সমর্থন করে না— এবং এ কারণেই সে 'গণতন্ত্রের' নাম কোরে ভিয়েতনামে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনকে, বা 'সমাজতন্ত্রের' নাম কোরে চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে, বা 'জাতীয় মুক্তি' ও 'গণতন্ত্রের' নাম কোরে বাংলাদেশে ও সিকিমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসনকে সমর্থন করে নি।

সংশোধনবাদীরা কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা দখল করলে সে দেশে যে সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তারা যে তখন ধীরে ধীরে সে দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, এবং সে দেশের কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অচিরেই যে সে দেশ পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়— চীনই এই অখণ্ডনীয় নির্মম সত্যটিকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে এবং সঠিকভাবেই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুনিয়ার জনগণের অন্যতম প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আধুনিক যুগে, সাম্রাজ্যবাদ মানেই হচ্ছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে, দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একই সঙ্গে সমঝোতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা— এবং এই দু'টি দিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকটাই হচ্ছে প্রধান ও স্থায়ী, সমঝোতার দিকটি অপ্রধান ও সাময়িক। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের এই সঠিক শিক্ষা যে আজও কার্যকরী রয়েছে এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি দু'টি যে আজকের দুনিয়ায় সেই দুনিয়াজোড়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, দেশে দেশে অনুপ্রবেশ, আগ্রাসন, নিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে— সে দিকে চীন সঠিকভাবেই দুনিয়ার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেরণা জোগাচ্ছে।

অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে, চীন গত পঁচিশ বছর ধরে মার্কসবাদ লেনিনবাদ থেকে বিভিন্ন রকম সংশোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে এবং বিভিন্ন ঘটনায় মার্কসবাদী তত্ত্বের সঠিক ও নীতিনিষ্ঠ প্রয়োগ ঘটিয়ে গেছে। সেকারণেই চীন আজ পরিণত হয়েছে দুনিয়ার সর্বহারা ও জনগণের প্রেরণার উৎসে।

তিন

গত পঁচিশ বছরে চীন নিজের দেশের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যার মূলগত সমাধান করেছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্কের অধিকারী এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা-বিশিষ্ট একটি অনুন্নত দেশ কীভাবে দ্রুত ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যেতে পারে, মুষ্টিমেয় লোকের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও ব্যাপক জনতার দুর্দশা বৃদ্ধি না কোরে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফসল

ব্যাপক মেহনতী জনতার মধ্যে ভাগ কোরে দেওয়া যায়— তার এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে আজকের চীন।

প্রাক্-বিপ্লব চীনের ক্ষুধা-বঞ্চনা-অনাহার ও মৃত্যুর বিভীষিকা আজকের চীনে অতীত একটা তিক্ত স্মৃতিমাত্র, বর্তমানে সে বিভীষিকার অস্তিত্ব নেই। চীনের জনগণের খাদ্যসমস্যার সমাধান ঘটেছে, খাদ্যের ব্যাপারে চীন আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি বিদেশে পর্যন্ত সে রপ্তানি বা সাহায্য হিসেবে খাদ্য পাঠাচ্ছে। শিল্প-উৎপাদনের ব্যাপারে পশ্চাৎপদ প্রাক্-বিপ্লব চীন আজ সারা দেশ জুড়ে সুষমভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। গত পঁচিশ বছরে শিল্প-উৎপাদন বেড়েছে কুড়ি গুণেরও বেশী; ইস্পাত উৎপাদন বেড়েছে ১৩১ গুণেরও বেশি; কয়লা ১১ গুণ। খনিজ তেলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিতান্তই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে সরে এসে সে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে— উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩০০ গুণ। বেকার সমস্যার কোনো অস্তিত্ব নেই। জিনিসপত্রের দাম গত কুড়ি বছর ধরে স্থিতিশীল আছে, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। এবং চীনই আজকের দুনিয়ার একমাত্র দেশ, দেশের ভেতরে বা বাইরে যার কোনো ঋণ নেই।

প্রাক্-বিপ্লব চীনের ব্যাপক অশিক্ষার হার দূর কোরে চীন আজ ব্যাপক জনগণকে ন্যূনতম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোরে ফেলেছে। আগে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের প্রায় প্রবেশাধিকারই ছিল না উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, আজ সেখানে শ্রমিক-কৃষকদেরই সুযোগ সবচেয়ে আগে। বাস্তব জীবন-বিমুখ শিক্ষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার যথার্থ সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

প্রাক্-বিপ্লব চীনে তো বটেই, এমনকি বিপ্লবের পরেও চীনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে রাজত্ব করতো রাজা-মন্ত্রী বড়লোক ও ভূতপ্রেতের দল। আজ জনগণের অগ্রণী চরিত্রই মঞ্চে প্রাধান্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত; অতীতের ও বিদেশের শিল্প-সাহিত্যকে বর্তমানের সামাজিক বিপ্লবের কাজে লাগানো হচ্ছে; জনগণের জন্য জনগণের ভাষায় বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার এসেছে।

প্রাক্-বিপ্লব চীনে সাধারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ পেতো না, আজ সেখানে সারা দেশে চিকিৎসার জাল বিস্তৃত। একদিকে পুরোণো গ্রাম্য চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় ট্রেনিং দিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে; অন্যদিকে প্রাচীনকালে চীনে চিকিৎসা শাস্ত্রের যতো উন্নতি হয়েছিলো, বিভিন্ন নোতুন নোতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে সবকে পুনর্জীবন দেওয়া হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনা হোচ্ছে আকুপাংচারের মতো প্রাচীন বিদ্যাকে আধুনিকভাবে রূপায়ণের মাধ্যমে।

অর্থাৎ এককথায়, চীন অর্থনীতি-রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক জনগণের স্বার্থে অগ্রগতির পথ ধরে এগিয়ে গেছে, ও এগিয়ে যাচ্ছে— এবং এ সব কিছুই দুনিয়ার মেহনতী জনগণকে চীনের অগ্রগতি সম্পর্কে আগ্রহী কোরে তুলেছে।

চার

সব শেষে একটা কথা না বললে চীন সম্পর্কে সমস্ত কিছুই না বলা থেকে যায়। চীন তার আশি কোটি জনগণকে প্রগতির পথে একটা বাধা হিসেবে দেখে না— দেখে সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে। জনগণ, এবং কেবলমাত্র জনগণই যে ইতিহাসের স্রষ্টা— এই মৌলিক সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং জনগণের উদ্যোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কোরেই চীন তার অগ্রগতি ঘটাচ্ছে, জনগণের অফুরন্ত সৃজনীশক্তির প্রাণবন্যায় সমাজতান্ত্রিক চীন জোয়ারের মতো এগিয়ে যাচ্ছে।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজের দিকে যাত্রার পথে একটি পর্যায়। চীনের লক্ষ্য সাম্যবাদে পৌছানো। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে— তাই চীন রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে এখন থেকেই ব্যাপক জনগণের সক্রিয় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের ওপর জোর দিচ্ছে। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে— অতএব চীন বৈষয়িক উৎসাহের ওপর গুরুত্ব কম দিয়ে জনগণের বিপ্লবী চেতনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সাম্যবাদী সমাজে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে ব্যবধান থাকবে না— অতএব চীন এখন থেকেই মানসিক শ্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে কায়িক শ্রমে আংশিকভাবে হলেও অংশগ্রহণ করার ওপর, এবং কায়িক শ্রমে যুক্ত ব্যক্তিদের-মানসিক শ্রমের ব্যাপারে উপযুক্ত কোরে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে। সাম্যবাদী সমাজে গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব থাকবে না— তাই চীন তার শিল্প-বিকাশকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে, গ্রামে গ্রামে ছোটো ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলছে, জনস্রোতের সঞ্চালনকে গ্রাম থেকে শহরের দিকের বদলে শহর থেকে গ্রামের দিকে পরিচালিত করছে। এবং এ সব কিছুই সে করছে ব্যাপক জনগণের ওপর নির্ভর কোরে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তি-স্বার্থের অস্তিত্ব থাকবে না, যৌথ শ্রম-ভিত্তিক যৌথ সামাজিক স্বার্থই সব কিছুর পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আজ তাই চীনে ব্যক্তি-স্বার্থের বিরুদ্ধে যৌথ-স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। চীন আজ এই মহান শিক্ষাই তুলে ধরছে যে, দশহাজার বছরের শ্রেণী-বিভক্ত ব্যক্তি-স্বার্থ-ভিত্তিক সমাজের যে সব পুরোনো চিন্তা ও ভাবধারা জনগণের মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, সেগুলি সমূলে বিলুপ্ত কোরে মানুষের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করাটাই হচ্ছে মূল কথা। "চীনের এই শিক্ষা বিশ্বজনীন, শুধুমাত্র চীনের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য নয়, আমরা যদি কান পেতে শুনতে পারি, তবে আমাদের চারপাশের আকাশে-বাতাসেও সেই শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যাবে— কেননা আমাদের প্রত্যেকের মনের কথাই তাতে ভাষা পেয়েছে : এমন একটা পৃথিবী দরকার, যেখানে আমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারবো।"*

* ফেলিক্স গ্রীণ : 'মানুষ হবার পথ দেখাচ্ছে চীন'/অনীক : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৪

আজকের চীন / ২

রঞ্জন কর

এক

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর পিকিং বেতার থেকে সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা হলো ঃ চীনে জনগণের গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কুয়োমিনটাং রাজত্বের অবসান হয়েছে— চীনের মূল ভূখণ্ডে কোথাও আর জমিদার, সুদখোর-মহাজনের রাজত্ব নেই। বলা যেতে পারে, সেদিন থেকেই চীন সারা বিশ্বের কাছে একটা আলোচনার বিষয়— যাঁরা তাঁদের পথ মানেন তাঁদের কাছে তো বটেই, যাঁরা মানেন না, তাঁদের কাছেও।

'চাষা-মজুরের দল'ও যে ক্ষমতা হাতে নিতে পারে, রাজত্ব চালাতে পারে— এটা অবশ্য সেদিন আর বিতর্কের বিষয় ছিলো না, 'অরোরার কামান গর্জন' ১৯১৭ সালেই সে বিতর্কের যবনিকা টেনে দিয়েছে। প্রশ্ন ছিলো : এশিয়ার একটা দীর্ঘকালের অনুন্নত দেশ, ভাববাদী দর্শন যার নাকি গোটা জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এতদিন, সেখানকার মানুষকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বস্তুবাদী মতাদর্শে গড়ে তোলা কতটা সম্ভব? সমস্যা ছিলো একটা বিশাল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা নিয়ে, সমস্যা ছিলো বিশাল জনসংখ্যার (১৯৫৩তে যা ছিলো ৫৮.২৬ কোটি, এখন যা ৮০ কোটির কাছাকাছি) আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা নিয়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আণবিক হুমকি ছিলো, কোরিয়াতে উস্কানিমূলক কাজকর্ম ছিলো, পেয়ে-হারাণো রাজত্বের লোভে উন্মাদ চিয়াং কাই-সেকের হুংকার ছিলো কাছেই তাইওয়ানে। এই ছিলো পঁচিশ বছর আগের অবস্থা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরী কোনো পথ ছিলো না চীনা কমিউনিষ্টদের। সামনে ছিলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্য, নেতা ছিলেন চেয়ারম্যান মাও, সঙ্গে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক চীনা জনগণ। যে দৃঢ়তা নিয়ে দীর্ঘ আট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন কমিউনিষ্টরা লং মার্চের সময়, তার মতই দৃঢ়তা নিয়ে তারা নোতুন পথ অতিক্রম করবার কাজে হাত লাগালেন।

পঁচিশ বছর সময়টা কিছু বিশাল নয় একটা জাতির জীবনে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যেই চীন আমাদের কী দেখালো? চীন দেখালো, দাঁতে দাঁত কামড়ে নিজেদের উপর নির্ভর কোরেই কীভাবে দেশ গড়া যায়। একথা আজ কেউ অস্বীকার করেন না যে, খাদ্যের ক্ষেত্রে চীন স্ব-নির্ভর হয়ে গেছে। ১৯৭২-এ সে নিজের দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও ৩০ লক্ষ টন

খাদ্যশস্য বিদেশে পাঠিয়েছে সাহায্য হিসাবে। ১৯৫২ থেকে '৭০ পর্যন্ত সরকারী হিসেবে বছরে চীনের সামগ্রিক উন্নতির হার শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ। বিদেশী সাংবাদিকদের ও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের হিসেবেও গত এক দশকে চীন যে কেবল বিদেশ থেকে কোনো ঋণ নেয়নি তা নয়, সোভিয়েত থেকে নেওয়া সব ঋণ পরিশোধ করেছে, এমনকি কোরিয়া যুদ্ধের সময় রাশিয়া যে সব যন্ত্রপাতি দিয়েছিলো তাও চীন পরিশোধ করে দিয়েছে।[১]

অবশ্য এসব তথ্য গোড়ার দিকে আমাদের 'মুক্ত দুনিয়ার' সাংবাদিকেরা আদৌ বিশ্বাস করতেন না। এসব তথ্য নাকি অধিকাংশই অসত্য। তাদের হংকং-তাইপে মার্কা 'সৎ' সাংবাদিকরা দুবেলা প্রচার করতো— চীনে দুর্ভিক্ষ এসে গেছে, ব্যাপক অপুষ্টি আর ক্ষুধার দেশ কমিউনিষ্ট চীন[২] ইত্যাদি ইত্যাদি। "চীন যে বছর তার ইতিহাসের বৃহত্তম ফসল ফলিয়েছে সেই ১৯৫৭ সালেও সংবাদ-সংস্থাগুলোর ঐ জাতীয় প্রচার বন্ধ হলো না। আমি সে বছর চীনে ছিলাম। আমি অনেক হাজার মাইল পরিভ্রমণ কোরে সর্বত্রই উপচে-পড়া ফসলের চিহ্ন দেখতে পাই। আমি যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার অল্প দিনের মধ্যেই 'টাইম' পত্রিকা প্রশ্ন তোলে : (চীনে) দুর্ভিক্ষ কি এসে গেলো?" লিখেছেন ফেলিক্স গ্রীন।[৩] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেন চীনের বিরুদ্ধে দু'বেলা কুৎসা করা হয়, কেন লালচীনের ফিল্মে শিশুদের হাসি দেখালে ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে,[৪] সে সব কারণ সাধারণ মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারেন।

আজকের দিনে অবশ্য চীনকে নিয়ে এমন কাঁচা প্রচার আর করাও হয় না। ঘরে-বাইরে হাজার ধরণের শত্রুতার বিরুদ্ধে লড়াই কোরে চীন জগৎসভায় তার যোগ্য আসন যে গ্রহণ করেছে, তা এক অনস্বীকার্য ব্যাপার। চরম চীন-বিরোধী সাংবাদিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হন— পঁচিশ বছরে সেখানে ঘটেছে এক অবিশ্বাস্য অগ্রগতি।

পঁচিশ বছরের সেই লং মার্চের কাহিনী আজ যত বেশী কোরে বাইরের দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে, ততই চীনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বেড়ে চলেছে। বিশেষ কোরে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে, যেখানে বাস্তব অবস্থা প্রাক-বিপ্লব চীনের খুব কাছাকাছি, সেখানে কিভাবে চীন উন্নতি ঘটাচ্ছে, এ নিয়ে প্রশ্নের আর অন্ত নেই। যত বেশী কোরে এসব দেশে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের অর্থনৈতিক উন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় দাওয়াই অকেজো হয়ে পড়ছে, তত বেশী কোরে সে সব জায়গায় চীনের পথ নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে।

কমিউনিষ্টদের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিরোধিতা কোরে অ-কমিউনিষ্ট দুনিয়ার বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদেরা যে সব ফর্মূলা বের করেছেন, তার সার কথা হলো : অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোতে বড়গোছের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই এসব অনুন্নত দেশের অবস্থা বদলানো সম্ভব। এসব দেশে আছে জনসংখ্যার প্রবল চাপ, ভারী শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি। দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে লিপ্ত থাকেন। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা সাধারণ অর্থনৈতিক বদ্ধ অবস্থা থাকে। বলা হয় : এসব দেশ গরীব বলেই গরীব। ব্যাখ্যা হলো : এরা গরীব বলেই তাদের আয় কম, আয় কম বলেই সঞ্চয় কম,

সঞ্চয় কম বলেই বিনিয়োগ কম, বিনিয়োগ কম বলেই এদের আয় কম, আয় কম বলেই আবার এরা গরীব।

এই দারিদ্র্যচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে এসব দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দেশের ভেতরে সঞ্চিত সম্পদ সরকারকে বের করতে হবে বিনিয়োগের জন্য— তা আনতে হবে প্রধানতঃ কৃষি থেকে। কিন্তু সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে সেই প্রাথমিক বিনিয়োগ, যা কিনা তাকে এই দারিদ্র্যচক্র থেকে মুক্তি দেবে, তার সবটা বের করা সম্ভব হয় না। তাই বিদেশী ঋণও নিতে হবে। এই টাকায় ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা খুলতে হবে, তা দিয়ে দেশের শিল্প বিকাশ হবে, শিল্পের বিকাশই দেশকে ক্রমশঃ উন্নত করবে এবং পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। এই হচ্ছে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের মত।

প্রাথমিক বিনিয়োগের জন্য যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন, তা কীভাবে যোগাড় করা যায়, এ নিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রচলিত তত্ত্বগুলোর অসারতা আজকের দিনে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনুন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক বিনিয়োগের জিগির তুলে একদিকে উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের ট্যাক্স বসছে। যদিও বড়লোকদের বেশী ট্যাক্স দেবার সব আয়োজন কাগজে-কলমে করা আছে, তবুও সামাজিক কাঠামোর কল্যাণে ট্যাক্সের দায়ভাগ অবশেষে হাকিম সেখ আর রামা কৈবর্তদের ঘাড়েই এসে পড়ে। পরিকল্পনার জন্য ট্যাক্সের নাম শুনলে তাই সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্তই হন। বিনিয়োগের জন্য টাকার যোগাড় যত বাড়ছে, সাধারণ মানুষ তত বেশী কোরে দরিদ্র হচ্ছে। অন্য দিকে বিনিয়োগের দৌলতে একদল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও বড় জোতদার ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে উঠছে। প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রশ্নটিকে ঘিরে এইসব অনুন্নত দেশে তাই বর্তমানে সামাজিক কাঠামোটির কার্যকারিতাকে ঘিরে এক বিরাট প্রশ্ন উঠছে।

প্রশ্ন উঠছে প্রাথমিক বিনিয়োগের দ্বিতীয় উৎস অর্থাৎ বিদেশী ঋণের ব্যাপারটিকেও নিয়ে। বিদেশী অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশের ঋণ কি উন্নতিশীল দেশগুলোকে স্বনির্ভর কোরে তুলতে সক্ষম হচ্ছে? বাস্তবে কিন্তু সমস্ত উদাহরণই নেতিবাচক আকারে দেখা দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ঋণ শেষ বিচারে এই সব অনুন্নত দেশকে যে আরও বেশী কব্জায় ফেলবার একটা হাতিয়ার মাত্র, তা ক্রমশঃ উপলব্ধি করা যাচ্ছে।[৫] সুতরাং প্রাথমিক বিনিয়োগের যাবতীয় বুর্জোয়া তত্ত্ব এইসব অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলাবার জন্য কোনো মতেই কার্যকরী নয়।

তাদের অভ্যন্তরীণ পুঁজি সঞ্চয়ের তত্ত্ব দেশের গরীবকে আরও গরীব করার তত্ত্ব, তাদের বৈদেশিক সাহায্যের তত্ত্ব দেশের মানুষকে দেউলে করার তত্ত্ব। গত কয়েক দশক ধরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাধারণ অর্থনৈতিক মানের দ্রুত অবনতি একথার যথার্থতা প্রমাণ করেছে। মরীয়া হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এবং বুর্জোয়া দার্শনিকরা "এরা গরীব কারণ এরা গরীব" এই তত্ত্ব থেকে অবশেষে গরীবদের হাজার দোষ বের করতে করতে "এরা অলস, এরা দুর্নীতিবাজ, এদের দেশগড়ার ইচ্ছা নেই" থেকে শুরু কোরে "এদের প্রজননের হারের বৃদ্ধিই এদের অনিষ্টের কারণ" এই তত্ত্বে পৌঁছেছেন।

বস্তাপচা মালথাসকে গুরু হিসেবে দাঁড় করিয়ে পরিবার পরিকল্পনাকেই সব সুখের উৎস হিসেবে তুলে ধরে চলতি সমাজ-বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ দাওয়াই আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রাথমিক সঞ্চয়ের সমস্যাটিকে মোকাবেলা করতে গিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই বিনিয়োগের শ্রেষ্ঠ উৎস হিসেবে ধরে চীন কিভাবে দ্রুত তার সমস্যাকে মেটাতে পেরেছে এবং তা করতে গিয়ে বুর্জোয়া সমাজ-তত্ত্ববিদদের সমস্ত প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চুরমার কোরে দিয়েছে, সেটাই আমরা এবার দেখবো।

দুই

একথা সত্যি যে, অর্থনৈতিক জড়তা কাটাবার জন্য একটা প্রাথমিক বিনিয়োগের ধাক্কা দিতেই হবে। ইউরোপের 'সুসভ্য' জাতিগুলো এই প্রাথমিক বিনিয়োগের ধাক্কা দেবার মত প্রাথমিক পুঁজি পেয়েছিলো যে তিনটি সূত্র থেকে,[৮] তা এই সব দেশের কাছে এখন এতটা সহজলভ্য নয়, এই সব দেশের সামগ্রিক কাঠামো বদলাবার প্রশ্নটি অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক বিনিয়োগ যে দরকার এবং তা দিয়েই ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ভারী শিল্পই অবশেষে ভোগ্যপণ্য এবং কৃষির ক্ষেত্রে কারিগরীর সবিশেষ জ্ঞানটি পৌঁছে দিয়ে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য আনতে সক্ষম। সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা জানেন, ঘোড়ায় টানা লাঙলের যুগকে ধরে রাখার জন্য রাশিয়া সমাজতন্ত্র চায়নি, বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাবার আর এক নামই ছিলো সমাজতন্ত্র।

সুতরাং প্রাথমিক সঞ্চয় চাই এবং বিদেশ থেকে নয়, স্বদেশ থেকেই তা অর্জন করতে হবে— এটা কমিউনিষ্টরা মনে করেন। সমমতাবলম্বী সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে এই প্রাথমিক সঞ্চয়ের জন্য কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রধানতঃ নিজের ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়েই নিজের দেশ গড়তে হবে— এটি কমিউনিষ্টরা সবসময় প্রচার করেন। এতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না, বরং তা আরও বেশী দৃঢ় হয়।

প্রাথমিক সঞ্চয়ের প্রধান কাজটি তাই নিজের দেশের মধ্যে থেকেই করতে হবে। আর পাঁচটা অনুন্নত দেশের মত চীনও ছিলো কৃষিনির্ভর দেশ। সঞ্চয়ের কাজ যদি করতেই হয়, তবে তার প্রধান ভাগ যে নিতে হবে তার কৃষিকে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ তার ছিল না।

কিন্তু প্রধানত কৃষিকে সঞ্চয় করতে হবে— একথার অর্থ বড় সহজ নয়। অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ থাকে কৃষি-নির্ভর। কৃষির উৎপাদনও এমন কিছু একটা থাকেনা, যাতে কোরে এর একটা বড় অংশ অন্যত্র সরিয়ে নিলে তেমনভাবে অনটন দেখা যাবে না। খুব ভালো হয় যদি ভারী শিল্প গড়ার জন্য প্রাথমিক সঞ্চয়ের কাজটি কৃষিকে খুব বেশী অনটনে না ফেলে করা যায়। কিন্তু তা করতে গেলে আর কোথা থেকে সঞ্চয় করা যাবে?

সমস্যা শুধু এখানেই নয়। প্রাক্-পরিকল্পনা অর্থনীতিতে কৃষিতে খুব বেশী

উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি, সার বা সেচের ব্যবস্থা থাকে না। ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়া কৃষিতে বন্যায়, খরায় বছরে বছরে চলে বিপর্যয়। কাজেই কৃষিতে কিছু বিনিয়োগ করা দরকার, যাতে তার থেকে একটা মোটামুটি ভালো ধরণের উৎপাদন পাওয়া যায়। এই ভালো ধরণের উৎপাদন পেলে তা থেকে ভারী শিল্পের জন্য একটু বেশী সঞ্চয়ও করা যায়। আর তা যদি না থাকে, কৃষিতে বিপর্যয় সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিপর্যয় টেনে আনবে, অন্যান্য খাতে খরচের মত সঞ্চয়ের পরিমাণেও পড়বে ঘাটতি এবং গোটা দেশটার অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে উঠবে। এই বিশ্লেষণটির সঙ্গে আমরা ভারতীয়রা তো বিশেষভাবে পরিচিত। বছরে বছরে এই চিত্রই তো এখানে দেখা যায়। যেবার 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়' খারিফ এবং রবিশস্যের ভাল ফলন হয়, সেবার দিল্লীতে পরিকল্পনা জমে ওঠে; যেবার 'ঈশ্বরপুরুষের রসিকতায়' এবং জোতদার-মহাজনের আনুকূল্যে খারিফ এবং রবিশস্যের ফলনে মন্দা আসে, সেবার আমাদের 'যোজনা ভবনে' মধ্যদিনেই অন্ধকার নামে— আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ভিক্ষাপাত্র হাতে বসে থাকেন ওয়াশিংটনে!

কাঠামোগত পরিবর্তন হওয়া সত্বেও চীনের মত একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রথমদিকে কৃষিকে কেন্দ্র কোরে এই ধরণের সমস্যার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

সুতরাং সমস্যা হলো : উন্নতির জন্য চাই প্রাথমিক সঞ্চয়। বিদেশী ঋণ যেহেতু কোন কার্যকরী সমাধান আনে না, কাজেই এই সঞ্চয় দেশের ভেতর থেকেই করতে হবে। দেশের ভেতর থেকে তা যোগাড় করতে হবে, এবং তার বড় অংশটাই দিতে হবে কৃষিকে। কিন্তু প্রাক-পরিকল্পনার কৃষি নিজেই থাকে নড়বড়ে, তা থেকে সাধারণভাবে খুব বেশী সঞ্চয়ের আশা করা যায় না।

তিন

দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে অবশ্য জোর কোরে কিছু সঞ্চয় করানো যায়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব থাকলে পরে তা সহজে ঘটানো সম্ভবও বটে, কিন্তু তার ফল সব সময় ভাল নাও হতে পারে। "সমাজতন্ত্রের জন্য", "আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য" ইত্যাদি শ্লোগান নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি সাধারণ মানুষের সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ববোধ বিকশিত করার জন্য নিশ্চয়ই তা কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু যে কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে পারে, যদি তা তার আজকের আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছু অংশ চরিতার্থ না করে। মাও সেতুঙের ভাষায় বলতে গেলে, এক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্বটি কাজ করে তা হলো : বৈষয়িক উৎসাহ এবং অবৈষয়িক উৎসাহের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। কমিউনিষ্টরা অবশ্যই এক্ষেত্রে অবৈষয়িক উৎসাহকে প্রাধান্য দেবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা বৈষয়িক উৎসাহের তথা জীবনযাত্রার উন্নতির প্রশ্নটিকে একেবারে নাকচ কোরে দেবে।

সুতরাং প্রাথমিক সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘকালীন কৃচ্ছ্রতার প্রশ্নটিকে মার্কসীয় উপায়ে সমাধান করতে হবে। ভারী শিল্প গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের গুরুত্ব হ্রাস করা

চলবে না। "ভারী শিল্প হলো (উন্নতির) ভারকেন্দ্র এবং তাদের বিকাশকে প্রথম প্রাধান্য দিতেই হবে।"[৭] কিন্তু তার জন্য কৃষি ও ভোগ্যপণ্যের সেকটরকে মার খাওয়ানো চলবে না এটাই হলো এই সমস্যার দ্বান্দ্বিক সমাধান।

কী কোরে তা সম্ভব, এই নিয়েই পরের প্রশ্নটি উঠে আসছে— বিশেষতঃ এমন একটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যাটির সমাধান করতে হবে, যেখানে রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা, যার ফলে ভোগ্যপণ্য ও কৃষির রয়েছে এক বিরাট চাহিদা। শুনতে অবাক লাগবে, কিন্তু চীন তার বিশাল জনসংখ্যাকেই এর সমাধানের পথ হিসেবে ব্যবহার করেছে। ছকটি মোটামুটি এই রকম।

এক) ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ যা দরকার, তা অর্থনীতি থেকে নিয়ে নিতে হবে, এ রসদ থেকে অবশ্যই কোনো অংশ কৃষিতে বা ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হবে না।

দুই) কিন্তু কৃষির ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াতেও হবে, প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক কলাকৌশলও ব্যবহার করতে হবে। এই কাজের জন্য হাতের কাছে যা আছে, তা হল ৭০ কোটি চীনা জনগণ। "ব্যাপক জনতার শ্রম নিজেই হলো একধরণের বিনিয়োগ। জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জমানায় আমাদের সম্পদের এক বিরাট অংশ টাকার অংকে প্রকাশিত হচ্ছে না। এটা হলো কয়েকশো মিলিয়ন জনগণের সচেতন অথবা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত স্বাধীন শ্রমের হিসেবে প্রকাশিত শ্রম বিনিয়োগ। যে বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, তা হলো নোতুন চীনের খেটে খাওয়া মানুষের অফুরন্ত শ্রম ও সৃজনী শক্তি। এমন একটি বিরাট জাগতিক শক্তিকে একমাত্র সমুদ্রের জলের সাথেই তুলনা করা যায়, কোনো মানদণ্ডেই তার হিসাব চলে না।"[৮] তাদের নিজেদের ভাষায় প্রকাশিত উপরের এই কয়েকটি কথাই হলো চীনাদের সমস্ত পরিকল্পনার মূল কথা। পরিকল্পনার জন্য ব্যাপক জনগণকে কাজে লাগাতে হবে। কিভাবে? প্রথমতঃ, কৃষির জন্য প্রধানতঃ শ্রমের উপর নির্ভরশীল প্রকল্পের কাজে হাত দিতে হবে; অর্থাৎ সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পাহাড় কেটে কৃষির জন্য জমি-উদ্ধার প্রভৃতি কাজে বিরাট সংখ্যক জনতাকে কাজে লাগাতে হবে। বেশী লোক লাগিয়ে অল্প জমিতে বেশী ফলনের চেষ্টা করতে হবে।

তিন) জনসংখ্যার আর এক অংশকে কাজে লাগাতে হবে হালকা শিল্পে— যে শিল্পগুলো হবে প্রধানতঃ শ্রমনির্ভর। এই শিল্পগুলো দু'ধরণের কাজ করবে : প্রথমতঃ, এগুলো থেকে কৃষির জন্য হালকা ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী হবে; দ্বিতীয়তঃ, এগুলো থেকে ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তৈরী মাল কিংবা আধা-তৈরী মালপত্র বানাতে হবে। এছাড়াও এসব শিল্প প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য তৈরী করবে।

এর ফলটা কী দাঁড়াবে? প্রথমতঃ থমকে-দাঁড়ানো কৃষিতে নোতুন উৎপাদনের বন্যা বয়ে যাবে, যাতে কোরে ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয় রসদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ, ছোট ও মাঝারি ধরণের শ্রমভিত্তিক শিল্প ভারী শিল্পের উপর চাপ কমাবে, কৃষি ও অন্যান্য সেকটরকে তার প্রয়োজনীয় রসদ দিতে পারবে। সর্বোপরি বিপুল জনসংখ্যাকে

ঠিকমত কাজ দেওয়ার ফলে জনতার মধ্যে আসবে এক নোতুন প্রাণবন্যা, যা কিনা সমগ্র জাতিকে আরও বেশী উৎপাদনের জন্য নতুন উৎসাহ যোগাবে।

এসবের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ভারী শিল্প গড়ে উঠে প্রাক-পুঁজিবাদী অনুন্নত দেশটাকে দ্রুত গতিতে শিল্পভিত্তিক দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে ফেলবে, অন্যদিকে কৃষি ও ভোগ্য পণ্যের বাজারে দীর্ঘস্থায়ী হাহাকারটিও কিন্তু লোপ পাবে।

আমাদের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসছে, চীনের এই পরিকল্পনা কাঠামোটিতে হাল্কা শিল্পের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভারী শিল্প গড়তে হলে হালকা শিল্পের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যেহেতু এগুলো শ্রমভিত্তিক, সেহেতু এগুলোতে বিনিয়োগ সমস্যা বেশী নেই, কিন্তু এগুলোর বিকাশ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি ঘটাবে। "কারণ এগুলো জনগণের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাবী মেটাতে পারে, অন্যদিকে এরা আরও বেশী দ্রুতগতিতে আরও বেশী উদ্বৃত্ত তৈরী করতে পারে।"[৯]

১৯৫৬ সালের পর থেকে মাও সেতুং নির্দেশিত এই পথেই চীন তার সামগ্রিক পরিকল্পনাটিকে সাজিয়ে নিয়েছে। এ পথ ধরেই মিতব্যয়িতার সাথে চীন মোটামুটি দ্রুতগতিতে তার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র চীন জুড়েই এক মোটামুটি স্বচ্ছলতা ও প্রাণপ্রাচুর্যের ছবি দেখা যাচ্ছে, ঘরে এবং বাইরে তার কেনো ঋণ নেই, আন্তর্জাতিক মর্যাদা তার আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চার

অর্থনৈতিক উন্নতির এই সামগ্রিক মডেলটিকে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, এটির সঙ্গে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মডেলের অমিল রয়েছে। চীন তা অস্বীকার করে না। ভারী শিল্পের উপর একতরফা গুরুত্বকে একটা 'ভুল' হিসেবে দেখিয়ে চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, "কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশ হাল্কা শিল্প এবং কৃষির উন্নতির-মূল্যে ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে যে ভুল করেছিলো, সে ভুল আমরা করি নি। তাদের এই ভুলের ফলে বাজারে জিনিসপত্রের যোগানে অপ্রতুলতা এসেছিলো, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের টানাটানি দেখা দিয়েছিলো এবং তাদের মুদ্রার ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল অবস্থা দেখা দিয়েছিলো। আমরা হাল্কা শিল্প এবং কৃষিতে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। ...আমরা একথা বলতে পারি না যে, আমাদের দৈনন্দিন জিনিসপত্র অঢেল, কিন্তু তাদের যোগানে টানাটানি নেই।"[১০]

সত্যি কথা বলতে কি, সমাজতন্ত্রের জমানায় প্রাথমিক সঞ্চয়ের প্রকৃত চেহারা কী হবে, তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা বিতর্ক চলেছে। বুখারিন ও প্রিয়ব্রাজজেনস্কীর মত বুর্জোয়া দালালদের বিরুদ্ধে এই প্রশ্নে স্তালিন যদিও সিংহবিক্রমে লড়াই কোরে প্রলেতারীয় স্বার্থকে তাঁর জীবদ্দশায় রক্ষা কোরে গেছেন, তবুও এই ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সমাধানগুলো প্রশ্নাতীত নয়।

ঐতিহাসিকভাবে চেয়ারম্যান মাও যে কারণে এই প্রশ্নে একটি সঠিক সমাধান বের

কোরে চীনের মাটিতে তা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলেন, তার কারণ হলো— সমাজতন্ত্রের জমানায় দ্বন্দ্বগুলোর চরিত্র ও তার সমাধানের পথ সম্পর্কে রাশিয়ার অভিজ্ঞতার ইতিবাচক ও নেতিবাচক শিক্ষাগুলোকে তিনি সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সমাজতন্ত্রের গোটা জমানায় থাকে দু'ধরণের দ্বন্দ্ব— একটা জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, আর একটা জনগণের ও তার শত্রুদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বগুলো গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে, কারণ সমাজতন্ত্রে বহু সময়েই শত্রুরা প্রকাশ্য থাকে না।

মুষ্টিমেয় ধনীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিতে হলেও মনে রাখতে হবে যে, সমাজতন্ত্রের জমানাতেও জনগণের উৎপাদনের সমস্ত অংশটি জনগণ সরাসরি ভোগদখল করতে পারে না— সমাজতন্ত্রের গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের প্রশ্নটি আসে। যদিও এ সঞ্চয় জনগণের জন্যই, তবুও চেতনার মানের বিভিন্নতার জন্য এই সঞ্চয়কে ঘিরে জনগণের শত্রুরা গোপনে এবং প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ কোরে তুলতে পারে, যদি না একদিকে এই সঞ্চয় যে ব্যাপক মানুষের জন্যই, এমন রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত করা যায়। তারই সাথে সাথে সর্বহারা রাষ্ট্রের তরফ থেকে পরিকল্পনাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন "সমাজতন্ত্র মানেই কৃচ্ছতার প্রতিযোগিতা" এমনটি না দাঁড়ায়। কারণ এমন অবস্থায় জনগণের শত্রুরা 'কৃচ্ছতার' সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেবার মত রাস্তা খুঁজে পেতে পারে।

দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্লেষণ থেকেই চেয়ারম্যান মাও একদিকে সমাজতন্ত্রের জন্য সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ার প্রশ্নে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন— যে রাজনীতি মানুষকে সংঘবদ্ধ অস্তিত্বের দিকে বেশী কোরে নিয়ে আসছে, অন্যদিকে জনগণের "জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীগুলি" বজায় রেখেই যে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য চালাতে হবে— এই দিকটিও তুলে ধরেছেন।

এর ফলে অবৈধ উপায়ে বৈষয়িক ও অবৈষয়িক উৎসাহ দানের দ্বন্দ্বটিকে দূর করা যাচ্ছে, এবং জনগণের শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে।

এই ধরণের একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী নেওয়ার জন্য যে সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো চীনে গড়ে উঠেছে, তার রূপ হলো কমিউন। কমিউন সংক্রান্ত আলোচনার জন্য আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা করিনি। কেবল মনে রাখতে হবে, জনগণকে নিয়ে জনগণের জন্য পরিকল্পনা করতে হলে তার সাংগঠনিক রূপ 'কমিউন' বা ঐ ধরণের অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন হতে বাধ্য— যার হাতে থাকবে স্থানীয় কৃষি ও হালকা শিল্পের যাবতীয় দায়িত্ব, কেন্দ্রের সামগ্রিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও স্থানীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যার থাকবে সর্বাধিক স্বাধীনতা। এই ধরণের পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীভূত হতেও বাধ্য থাকে, কারণ তার মধ্য দিয়েই জনগণের উদ্যোগ বিকশিত হতে পারে।

চীনে এই রকম একটি পরিকল্পনার জয়যাত্রা যে অব্যাহত আছে, তার কারণ এই পরিকল্পনার প্রথম কথাটি হলো— একটা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ সে দেশের মানুষ। আমাদের নেতারা দেশে জনসংখ্যার আধিক্য থেকে মালথাসীয় তত্ত্বকে স্মরণ কোরে বর্ধিত

জনসংখ্যার মুণ্ডপাত কোরে জনগণকেই যখন দুর্দশার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন চীনারা বলেন, "এটা সৌভাগ্যের কথা যে, চীনের একটা বিরাট জনসংখ্যা আছে। যদি এই জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশীও বেড়ে যায়, তবুও চীন এর একটা সমাধান বার করতে যথেষ্ট সক্ষম এবং এই সমাধান হলো উৎপাদন। দুনিয়ায় যা কিছু মূল্যবান জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো মানুষ।"[১১]

সংক্ষেপে বলতে গেলে— অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে সংঘাতটি হলো দুই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। একটি দৃষ্টিভঙ্গি বলে, সাধারণ মানুষ থাকলে সব কিছুই তৈরী কোরে নেওয়া যায়। আর এক দৃষ্টিভঙ্গি বলে, সাধারণ মানুষ না থাকলে সব কিছুই ভোগ দখল করা যায়। প্রথম দৃষ্টিটি সবাইকে নিয়ে বাঁচতে শেখায়, দ্বিতীয়টি সবাইকে মেরে নিজেকে বাঁচতে শেখায়।

পিকিং থেকে নয়াদিল্লীর বা ব্যাঙ্ককের দূরত্ব তাই মাত্র কয়েক হাজার মাইল নয়— কয়েকটা গ্রহজগতেরও বটে।

নির্দেশিকা

১. Ajit Sing : 'Political Economy of Chinese Development / Economic & Political Weekly : Nov. 24, 1973 / P 2102
২. Harry Schwarz in 'Newyork Times' : April 22, 1952
৩. Felix Greene : 'A curtain of ignorance' / P. 99
৪. ১৯৬১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস্ স্কুলে দেখাবার জন্য তোলা লাল চীন সম্পর্কে একটি তথ্য চিত্রের প্রদর্শন এই অজুহাতে প্রত্যাহার কোরে নেওয়া হয় যে, তাতে লাল চীনের শিশুদের হাসতে দেখা গেছে, এবং কমিউনিষ্ট শাসনে শিশুদের হাসি দেখানোটা বিপজ্জনক (সূত্র : 'Sanfransisco Chronicle' / Oct. 11, 1961)
৫. 'অন্য অর্থ' সংখ্যা ৪ ও ৫ (১৯৭৩)-এ ভারতে মার্কিণ ও সোভিয়েত পুঁজির নেতিবাচক ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।
৬. মার্কস প্রাথমিক পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলির কথা বলেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে— জমি বিলির নয়া বন্দোবস্ত এবং তা থেকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি নির্ভর জনগণের অর্থনৈতিক পরিবর্তন (dislocation), একচেটিয়া বাণিজ্য, মুদ্রাস্ফীতি ও উপনিবেশের শোষণ প্রভৃতি।
৭. মাও সেতুং / উদ্ধৃত : Jerome Chen : 'Mao Papers' / P. 65
৮. Mui Tzu : Chi-hua Chin / Ch. 6
৯. মাও সেতুং / ঐ
১০. অজিত সিং-এর উপরোক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।
১১. মাও সেতুং / উদ্ধৃত : Brule : 'China Comes of Age' / Ch. 1.

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪

সিকিম প্রসংগে

প্রতীক মৈত্র

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভারতের ৩৬ তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে সিকিম ভারতের 'আশ্রিত রাষ্ট্র' থেকে 'সহযোগী রাষ্ট্রে' রূপান্তরিত হলো। ঘটনাটিকে কেন্দ্র কোরে বিভিন্ন মহলে নানারকম ব্যাখ্যা শোনা গেছে। ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো কারণ নেই, বরং গত দু'দশকের, বিশেষতঃ গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর অনুসৃত নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটনাটিকে দেখা উচিত।

১৯৪৭ সালের আগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে দেখতো প্রাচ্যে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের 'প্রধান রত্ন' হিসেবে, এবং এই ভারতকে কেন্দ্র কোরেই তারা ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন চালাতো। ১৯৪৭ সালে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া ও জমিদার-জোতদাররা আপোষের মাধ্যমে এদেশের শাসনভার পাবার পর তারা কিন্তু বৃটিশ প্রভুদের পুরোণো ছেঁড়া জুতো প'রে বৃটিশদের মতো একই কায়দায় এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এবং তাদের এই সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ কোরেই তারা ১৯৫০ সালে সিকিমের সঙ্গে একটি চুক্তি করে এবং সিকিমকে তাদের 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত কোরে বৃটিশদের কায়দাতেই সেখানে প্রভুত্ব চালাতে থাকে।

কিন্তু ট্রাজেডিটা ছিলো এখানেই যে, ভারত বৃটিশদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির শোষণের জাল থেকে মুক্তি পায়নি, বরং যতো দিন গেছে ততোই সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া উপনিবেশিক শোষণের তীব্রতা বেড়েছে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বৃটিশদের ক্রম-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নোতুন মাতব্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে ভারতে তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়িয়ে গেছে, এবং বৃটিশদের মতো ভারতকেই ঘাঁটি কোরে এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলির ক্রমবর্ধমান ঝোড়ো হাওয়াকে টুটি টিপে হত্যা করতে চেয়েছে, দুনিয়ার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের নোতুন প্রাণকেন্দ্র ও প্রেরণার উৎস সমাজতান্ত্রিক চীনকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল এবং কার্যতঃ তাঁবেদার ভারতীয় শাসকশ্রেণী মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবেই নিজেদের সম্প্রসারণবাদী

আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে— সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সঙ্গে ভারতের সম্প্রসারণবাদী স্বার্থ অভিন্ন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কালক্রমে এই অঞ্চলে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এগিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্র থেকে অধঃপতিত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক সংকটের সুযোগ নিয়ে সে ক্রমেই ভারতের ওপর তার নিয়ন্ত্রণকে বেশি জোরদার কোরে তুলেছে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে তার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লেজুড়ে পরিণত করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত 'মৈত্রী চুক্তি'র সাইনবোর্ডের আড়ালে ভারতকে সে একটি সামরিক চুক্তিতে বেঁধে ফেলেছে। মস্কোর এই নয়া জাররাও বৃটিশ ও মার্কিণীদের পদাংক অনুসরণ কোরে ভারতের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষার ডিমে তা দিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে এশিয়ায় সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অঙ্গীভূত কোরে নিয়েছে। এভাবে রাশিয়া ও মার্কিণ— এই দুই বৃহৎ শক্তির মদৎ পেয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ক্রমশঃই লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে, পার্শ্ববর্তী চীন, নেপাল, সিকিম, ভূটান, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, সিংহল প্রভৃতি দেশের ওপর এবং কাশ্মীরী, নাগা, মিজো প্রভৃতি জাতিসত্তার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে খবরদারী করতে এগিয়ে গেছে, এবং সাম্প্রতিককালে রুশদের সহায়তায় আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের বিরাটত্ব জাহির করতে চেষ্টা করেছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এই বাধাবন্ধহারা ব্যাপ্তির পটভূমিকাতেই সে এবার গ্রাস করেছে সিকিমকে। সিকিমের সামন্ততান্ত্রিক শাসক চোগিয়ালের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী সিকিমে তাদের নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করার চেষ্টা করছিলো, গত বছর সিকিমে চোগিয়াল-বিরোধী গণ-বিক্ষোভ তাদেরকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সিকিমে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' আওয়াজ তুলে তারা গতবছরই সিকিমের কার্যকরী ক্ষমতায় একজন ভারতীয় আমলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি সংবিধান সেখানে চাপিয়ে দিয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে হাজার হাজার সৈন্য ও সি আর পি-কে সেখানে মোতায়েন করেছে, এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত তাদের তাঁবেদার সিকিম কংগ্রেসকে 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতেই সিকিমের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে।

তারপর এবছর সিকিমের প্রধানমন্ত্রী কাজী লেণ্ডুপ দর্জি জনৈক ভারতীয় আমলা কর্তৃক প্রণীত একটি প্রস্তাব (ইংরাজীতে) গত ১১ই মে তারিখে সিকিমের আইন সভায় উত্থাপিত করেন (আইন সভার শতকরা ৮০ জন সদস্যই ইংরাজী বোঝেন না) এবং কোনো আলোচনার সুযোগ না দিয়েই সেটি পাশ করিয়ে নেন। সিকিম সরকারের এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী ভারতের সংবিধান সংশোধন কোরে ভারতীয় পার্লামেন্টে সিকিমের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কোরে ফেলেছে এবং সিকিমকে ভারতের 'সহযোগী রাষ্ট্রে' রূপান্তরিত করেছে। ভারতীয়

সম্প্রসারণবাদের ফাঁসটা সিকিমের গলায় এমন শক্তভাবে বাঁধা হয়েছে যে, এরপর দু'পক্ষের সম্মতি ছাড়া (অর্থাৎ ভারতীয় শাসকশ্রেণীর সম্মতি ছাড়া) সিকিমের আর পিছু হটার কোন উপায়ই রাখা হয়নি। এভাবেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী সিকিমকে সম্পূর্ণতঃ গ্রাস কোরে নিয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি, সিকিমের ব্যাপারে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের এই নির্লজ্জ আগ্রাসী কার্যকলাপ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রতিবেশী বিভিন্ন ছোটো ও মাঝারি রাষ্ট্রের ওপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের যে লোলুপ দৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে, এটা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। সাম্প্রতিককালে ছোটো ও মাঝারি দেশগুলি যে কোনো ধরণের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রমশঃই বেশি বেশি রুখে দাঁড়াচ্ছে, তাকে দাবিয়ে দেওয়া, নিজেদের আধিপত্যের জাল বিস্তার করা, এবং এভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের চীনকে ঘিরে ফেলার চক্রান্তকে সিদ্ধ করা— এই সমস্ত উদ্দেশ্যকেই রূপ দিতে চেয়েছে ভারতের শাসকশ্রেণী। এবং এটা করতে গিয়ে তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে অর্জিত পূর্ব-অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছে মাত্র। বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সংগত জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনকে ব্যবহার কোরে ঠিক একই কায়দায় ভারতীয় শাসকশ্রেণী ১৯৭১ সালে সে দেশে সৈন্যবাহিনী ও তাঁবেদারদের সাহায্যে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলো। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের মতো সিকিমের চোগিয়ালের অত্যাচার ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধেও জনগণের যে বিক্ষোভ ছিলো, সেটাকে পুঁজি কোরেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী নিজেদের কাজ গুছিয়েছে। পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে যেমন, সিকিমের ব্যাপারেও ঠিক একইভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সাহায্য মিলেছে। এবং দুটি ঘটনাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিপ্লব-বিরোধী ও চীন-বিরোধী চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবেই ঘটেছে।

সিকিমকে গ্রাস করার স্বপক্ষে ভারতীয় শাসকশ্রেণী অবশ্য এই বলে সাফাই গেয়েছে যে, সিকিমের জনগণের প্রতিনিধি কাজী দর্জির সরকারের অনুরোধে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থেই নাকি তারা এ কাজটা করেছে। যুক্তিটা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বহু-ব্যবহৃত একেবারেই বস্তাপচা যুক্তি। ভিয়েতনামে আক্রমণ চালাতে গিয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরাও অতীতে বলেছিলো— দিয়েম সরকারের অনুরোধেই তারা ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠিয়েছিলো। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করার সময় রুশ নয়া জাররা এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবার সময় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও এই একই যুক্তি খাড়া করেছিলো।

আর 'গণতন্ত্রের স্বার্থ'? মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির অতীত মাতব্বর ডালেসও বোধহয় কথাটা শুনে কবরের মধ্যে থেকেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। এক দেশ থেকে অন্যদেশে 'বিপ্লব' বা 'গণতন্ত্র' রপ্তানি করার প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বের আড়ালেই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে আক্রমণ চালিয়ে গেছে ও যাচ্ছে, রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ চালাচ্ছে—ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও এই বহু-ব্যবহৃত

সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিটাকেই আজ ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারেও তারা নোতুন কিছু করে নি। ভারত সরকার যদি সত্যিসত্যিই গণতন্ত্রের পূজারী হতো, তবে সিকিমের জনগণের দাবী অনুসারে ভারতীয় পার্লামেন্টে সিকিমের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের ওপর অনায়াসেই সিকিমের জনগণের মতামত (referendum) নিতে পারতো। সিকিমের গণতান্ত্রিক যুবক ও ছাত্ররা সঠিকভাবেই দাবী করেছেন যে, যেহেতু দর্জিদের নেপাল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যসূচীতে ভারতের 'সহযোগী রাষ্ট্রে' পরিণত হবার প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, অতএব নির্বাচনে দর্জি-চক্রের জয়লাভ কোনোক্রমেই তাদের এই বিশ্বাসঘাতক প্রস্তাবের প্রতি সিকিমের জনগণের সমর্থনের প্রমাণ বহন করেনি (ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা : ৫, ৬ ও ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)। ভারত সরকার এই প্রশ্নে সিকিমের জনগণের মতামত সংগ্রহ তো করেই নি (কারণ তারা জানতো, জনগণ ভারতের সিকিম গ্রাসের বিপক্ষে), উপরন্তু এর বিরুদ্ধে সিকিমের জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শনও নিষিদ্ধ কোরে দিয়েছে, সিআরপি দিয়ে সিকিমের জনগণের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে হিংস্রভাবে দমন করেছে ও করছে। এরপরেও তারা দাবী করছে, তারাই নাকি সিকিমে 'গণতন্ত্রের স্বার্থ' রক্ষা করছে!

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা লক্ষ্য করবার মতো। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান বা সিকিমের চোগিয়ালের মতো জনগণের মৌলিক স্বার্থ তথা আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী লোকেরা সামরিক শাসকচক্র বা সামন্ত শাসকচক্রের প্রতিনিধি হিসেবে রূপের দিকে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে তারাই কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে। আর গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতির স্ব-ঘোষিত দাবীদার বাংলাদেশের শেখ মুজিব বা সিকিমের দর্জী জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবী করলেও তারাই বহিঃশক্তির তাঁবেদার হিসেবে দেশকে বাইরের শক্তির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজকের যুগে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ ও জাতিগুলির যে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটছে, শেখ মুজিব বা দর্জীর মতো ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ভূমিকা সেখানে বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক, তুলনামূলকভাবে ইয়াহিয়া বা চোগিয়ালের মতো স্বৈরাচারী শাসকেরাও সেখানে অধিকতর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিচ্ছে। এই বিষয়টিকেই খেয়াল না রাখলে অনেক সময় অনেকেই অসচেতনভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন— ঠিক যেমন তাঁরা নিয়েছেন বাংলাদেশ বা সিকিমের ক্ষেত্রে। একটা দেশের আয়তন যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সেই দেশের জনসংখ্যা যতো কমই হোক না কেন, সেই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষার অধিকার সেই দেশ বা জাতির নিজস্ব মৌলিক অধিকার। অন্য কোনো দেশ, সে যতো বড়োই হোক না কেন, 'গণতন্ত্র' বা 'সমাজতন্ত্র' এর যতো ঢাকই সে পেটাক না কেন— তার কোনো অধিকার নেই অন্য দেশের এই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার বা নাক গলাবার!

সিকিমের ঘটনায় ভারতের সংশোধনবাদী দলগুলি নিজেদের চরিত্র অনুসারেই অবস্থান গ্রহণ করেছে। রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের সিকিম-গ্রাসকে নির্লজ্জের মতো "সিকিমের স্বেচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্তি" বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে— সিপিআই-ও

তাই একে সমর্থন করেছে। সিপিআই (এম) পার্লামেন্টে এর বিরোধিতা করলেও সিকিমকে ভারতের "আশ্রিত রাজ্য" হিসেবে রাখার পরামর্শ দিয়েছে, অর্থাৎ তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নগ্ন আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা কোরে সূক্ষ্মভাবে আগ্রাসী নীতি চালাবার পরামর্শ দিয়েছে।

কিন্তু ভারতের ব্যাপক মেহনতী জনতা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী বা সংশোধনবাদীদের ছলা-কলায় অবশ্যই ভুলবেন না। কারণ তাঁরা জানেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহভাজন ভারতীয় শাসকশ্রেণী যতো বেশি সম্প্রসারণবাদী কাজ-কারবার চালাবে, ততোই সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সিকিম-সহ অন্যান্য ছোটো ও মাঝারি দেশের জনগণের প্রতিরোধ দানা বাঁধবে। সিকিমের ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে নেপাল, ভূটান তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের জনগণের বিরোধিতার কণ্ঠও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কাজেই ভারতের কোটি কোটি মেহনতী জনগণের শোষণমুক্তির লড়াইয়ের বিস্তৃতি যতো বেশি হবে, ততোই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শিকার এই সব দেশের জনগণও তাঁদের প্রতি সমর্থন জানাবেন— এবং ভারতের ও এই সব দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আগ্নেয়-আঘাতে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং তার বিদেশী প্রভুদের ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসবে।।

> সিকিম একটা ছোটো দেশ হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সিকিমের জনগণের দৃঢ়সংকল্প এবং আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তারা কখনই ভারতের শাসন মেনে নেবেন না, বরং দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তাদের ন্যায্য সংগ্রাম তাদের প্রতিবেশীদের তথা দুনিয়ার জনগণের সমর্থন লাভ করবে। ভারত কর্তৃক সিকিম গ্রাস ভারতীয় জনগণের স্বার্থেরও পরিপন্থী, এ ঘটনা তাদেরও প্রচণ্ড বিরোধিতা জাগিয়ে তুলতে বাধ্য।
> — **পিপলস ডেইলি/পিকিং/সেপ্টেম্বর ৮ '৭৪**

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪

দেবী এখন আলতা মাখেন

নিঃশঙ্ক গুপ্ত

একটু জোরে হাওয়া দিলে
নড়বড়ে ঘর
দরজা জানলা যখন তখন
চমকে ওঠে।
সারা বাড়ি এমনি জবর
বারুদ ঠাসা
একটি ছোট ফুল্‌কি পেলেই
প্রলয় ছোটে—
দেশের তোমার এই তো দশা
তবু কেমন
প্রসাধনেই দেবীর লাগে হরেক রকম
রুজ-পমেটম
মেড ইন রাশা,
তারই জোরে সারা দেশে
ঘুঘুর বাসা
একটু-আধটু ফষ্টি নষ্টি
Sam-এর সাথে।
কাজে কাজেই প্রতিবেশী ভাল মানুষ—
সময় থাকতে নিজের নিজের
মাথা বাঁচাও

দেবীর এখন এক হাতেতে
Sam-এর বাঁশি
অন্য হাতে রুশের রশি
শক্ত সেটাও
এই সবই তো
হাজার হলেও ফরেইন জিনিষ—বিজাতীয়
সবাই জানে দেবীর কাছে
দিশী মালের কদর কেমন—
কেমন প্রিয়।
পায়ের তলায় এখন তো তাঁর
এক কোটি লাশ
তাদের রক্তে আলতা মাখাই
দেবীর বিলাস।

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪

বিহারের আন্দোলন প্রসঙ্গে

ইন্দিরা গান্ধীর বহু ঢক্কানিনাদিত গরীবী হটানোর কর্মসূচীর ধাক্কায় ভারতের ব্যাপক মেহনতী মানুষ যখন ক্ষুধায় অনাহারে দুনিয়া থেকেই হটে যাচ্ছেন, ইন্দিরাজীর পোষ্যবৃন্দ যখন অতুলনীয় দুর্নীতির বন্যায় দেশটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ এসবের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত কোনো গণ-আন্দোলনের জোয়ার ফেটে পড়ছে না, তখন বিহারের ব্যাপক গণ-আন্দোলন স্বভাবতঃই ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এ আন্দোলনের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক প্রশ্ন, অনেক ভাবনা চিন্তা ক্রমশঃই দানা বাঁধছে।

বিহারের এই গণ-আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেও এ আন্দোলনকে কোনোক্রমেই শুধুমাত্র জয়প্রকাশজীর আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যাবে না। অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির করাল বন্ধনে নিষ্পেষিত বিহারের ব্যাপক জনতার বিক্ষোভের বারুদের স্তূপে জয়প্রকাশজী আগুনের একটি ফুল্‌কি ছুঁড়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু বিধানসভা বাতিলের মূল দাবীকে কেন্দ্র কোরে এই শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যেভাবে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, হিটলারী কায়দায় গণ-আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার হিংস্র প্রচেষ্টার ব্যারিকেড ব্যাপক জনতা যেভাবে চূর্ণবিচূর্ণ কোরে দিয়েছেন, তা এই গণ-আন্দোলনের ব্যাপক গণ-ভিত্তির প্রমাণই সবার সামনে তুলে ধরেছে।

এ আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্ভবতঃ এই প্রথম ব্যাপক কোনো গণ-আন্দোলনের বর্শামুখ আংশিকভাবে হলেও ভারতীয় জনতার অন্যতম মূল শত্রু সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। এবং সেকারণই ভারতে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এজেন্ট সিপিআই তার 'প্রগতিশীল' কংগ্রেসী বন্ধুদের সহায়তায় এই আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। জয়প্রকাশজী সত্য-সত্যই সিআইএ-এর লোক কিনা, তার প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে অন্ততঃ মার্কিন লবীর লোক বলে ধরে নেওয়া যায়, এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের বুকে দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন ও সোভিয়েতের আধিপত্য বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতের তথা বিহারের বিপ্লবীরা যদি সঠিকভাবে দুই বৃহৎ শক্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কাজে লাগাতে পারেন, তবে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁরাই

দিতে পারবেন, এই গণ-আন্দোলনকে শোষণমুক্তির মূল লড়াইয়ের পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি হিসাবে বিকশিত করতে পারবেন।

আর এই আন্দোলনকে কেন্দ্র কোরে জয়প্রকাশজী সম্পর্কে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছে, সে মোহও ভেঙে যাবে, যদি তার অতীত ও বর্তমানকে সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। এই জয়প্রকাশজীই ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জংগী জাতীয়তাবাদী শক্তির দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতার এক নির্লজ্জ অবস্থান নিয়েছিলেন, ১৯৪৬-এর অগ্নিগর্ভ নৌ-বিদ্রোহকে ভেতর থেকে ছুরি মেরেছিলেন, বিহারে ১৯৬৭-৬৮-র সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য ভূদান যজ্ঞের শান্তির কারণ-বারি ছিটিয়েছিলেন। এসব ইতিহাস যেমন জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে, ঠিক তেমনি বর্তমানের ব্যাপক গণ-আন্দোলনকে 'অহিংসার' সীমিত গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখার প্রচেষ্টা, তথাকথিত এক শ্রেণী-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আজগুবী ধারণা ফেরী করার চক্রান্ত, এবং সর্বোপরি জনগণের উপর আস্থা না রেখে এই গণ-আন্দোলনকে নির্বাচন মুখী কোরে তোলার সাম্প্রতিক উদ্যোগ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপের স্বরূপও উদঘাটিত কোরে দিতে হবে। জয়প্রকাশজী ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসেবে এই গণ-আন্দোলনের উৎসমুখ খুলে দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক লাইনকে কোনোক্রমেই শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিত হবে না।

তাই, এই আন্দোলনের সঠিক দিকগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এর নেতিবাচক দিকগুলির বিরুদ্ধেও সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে, যুবক ও ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলনে সামিল করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদেরকে এতে সক্রিয়ভাবে সামিল করতে না পারলে, এবং শোষণমুক্তির চূড়ান্ত লড়াইয়ের পরিপূরণ হিসেবে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে, শেষ বিচারে শাসকশ্রেণীর এক বা অন্য অংশই এই আন্দোলন থেকে ফসল কুড়োবে। তাই বিপ্লবীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই কেবল এই আন্দোলনকে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭৪

সন্ত্রাসবাদ বনাম জনযুদ্ধ

সম্প্রতি প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধের কিছু 'সমর্থক' দুবাই থেকে একটি বৃটিশ বিমানকে 'ছিনতাই' কোরে নিয়ে যায় এবং যাত্রীদের শর্তসাপেক্ষে বন্দী করে। এই বিমানে বেশ কিছু ভারতীয় যাত্রী থাকায় স্বভাবতঃই এ ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে আমাদের দেশে বেশ আলোড়ন ওঠে, এবং এই সুযোগে প্যালেস্টাইন জনতার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা ইহুদীবাদীদের পক্ষে জনমত তৈরী করার প্রচেষ্টা চালায়। জনগণ থেকে তথা জনযুদ্ধের ব্যাপক কর্মসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে প্রকৃত বিচারে জনযুদ্ধের অগ্রগতিকেই ব্যাহত করে এবং জনগণের শত্রুদেরই সহায়তা করে— এ বক্তব্য আমরা আগেও রেখেছি। এ ধরণের কার্যকলাপ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীদের পত্রিকা 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করি। বক্তব্যটির মূল অংশ আমরা নীচে তুলে দিচ্ছি ঃ

"এ রকম যুক্তি দেওয়া হয় যে, এধরণের ঘটনা একদিকে প্যালেস্টাইনীদের দুর্দশার দিকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অন্যদিকে ইজরায়েলী ইহুদীবাদের মনোবল নষ্ট করে।...

"বাস্তবতঃ এসব ঘটনা কিন্তু মোটেই প্যালেস্টাইনী প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা সংগঠিত নয়। এসব হচ্ছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় একদল লোকের কাজ, যারা বিপ্লবী কর্মসূচীকে বিঘ্নিত কোরে হঠকারী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছেন। তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন চে গুয়েভারাবাদী 'বাম' সংশোধনবাদী লাইনের, যাতে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের বদলে কয়েকজন 'বীরের' কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এধরণের কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মোটেই প্যালেস্টাইন বিপ্লবকে সমর্থন জানানো হয় না, বরং শত্রুদেরকেই সাহায্য করা হয়।

"পিএলও (প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা) ইহুদীবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তারা প্যালেস্টাইনে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে আরব ও ইহুদী জনগণ সমান হিসেবে বাস করতে পারবেন। কূটনীতি বা প্রচারের ষ্টান্ট দিয়ে নয়, ইজরায়েলী ইহুদীবাদীদের সামরিক পরাজয় ঘটিয়েই কেবল এটা সম্ভব হতে পারে। সে কারণেই পিএলও নিয়মিত ভাবে সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলের ওপর— ইজরায়েলের সৈন্যবাহিনী, আধা-সামরিক অবস্থান, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর। প্রতি সপ্তাহেই তারা এরকম

আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন, অধিকৃত এলাকার ভেতরে ও বাইরে দু'দিক থেকেই। ইজরায়েলের ভেতরেও আরবদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও গণ-সংগ্রাম একই সঙ্গে চলছে।

"পিএলও ইজরায়েলের সমস্ত অধিবাসীদের মোটেই শত্রু বলে মনে করে না। বরং ইজরায়েলের নিপীড়িত ইহুদীদেরকেও তারা ইহুদীবাদের শিকার এবং ইজরায়েল বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাব্য মিত্র বলেই মনে করেন। পিএলও সন্ত্রাসবাদকেও সমর্থন করে না। বস্তুতঃ এধরণের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের সংগে যুক্ত প্রতিবিপ্লবী কিছু ব্যক্তি বা সংস্থাকে শাস্তি দেবার দায়িত্ব তারা নিজেরাই গ্রহণ করেছেন।

'এধরণের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্রমবিস্তৃতমান জনযুদ্ধকে আড়াল করাটা ইজরায়েলী ইহুদীবাদীদের পক্ষে একটা সুবিধেজনক ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রতিরোধ আন্দোলনকেই 'সন্ত্রাসবাদ' আখ্যা দেয় এবং এসব ঘটনাকে প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের নগ্ন ও সুপরিকল্পিত বর্বর আক্রমণের অজুহাত হিসেবেই খাড়া করে।

"আমরাও তাই এ সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশ নিতে পারি না। আমরা নির্দিষ্ট দাবী আদায়ের জন্য বন্দী করারও বিরোধী, কারণ তা মোটেই জনযুদ্ধের অঙ্গ নয়, বরং তা হচ্ছে অপরাধমূলক কার্যকলাপ। কিন্তু তাই বলে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের নিন্দা ও কুৎসার ঐকতানেও যোগ দিতে পারি না, কারণ তা আসলে প্রকৃত মুক্তি আন্দোলনের ওপরেই আক্রমণ। তাই নিপীড়নে নিপীড়নে মরিয়া হয়ে ওঠা নিপীড়িতদের আমরা দোষ দিই না, দোষ দিই নিপীড়কদেরই। ইহুদীবাদীদের সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং তার বিরুদ্ধে আরব (ও ইহুদী) জনগণের প্রতিরোধকেই আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরি।

"প্যালেস্টাইনের জনগণ নিজেরাই তাদের বিপ্লবের গতিপথ নির্ধারণ করবেন। আমরা বিনা দ্বিধায় তাদের এই অধিকার স্বীকার করি। আমরা প্যালেস্টাইনের মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করি এবং সংশোধনবাদ, গুয়েভারাবাদ প্রভৃতির প্রভাব বিস্তার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করি।

"গণ আন্দোলনের মধ্যেকার এই সব সর্বহারা বিরোধী প্রবণতাকে যারা সমর্থন করে, তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতাই প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রশ্ন আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদীদের প্রচার অভিযানে যোগ দেওয়া বা না দেওয়ার নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে— আমরা আরব (ও প্যালেস্টাইন) জনতার জনযুদ্ধকে সমর্থন করি কি করি না...।

"জনগণের বদলে কিছু 'বীর'কে প্রাধান্য দেবার রোমান্টিক প্রবণতা, বা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে শত্রুকে "পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করার" চিন্তা বা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'প্রচারের ষ্টান্টকেই' বিশেষ প্রাধান্য দেবার ঝোঁক ইত্যাদি মানসিকতা পেটিবুর্জোয়া ও লুম্পেন সর্বহারাদেরই বৈশিষ্ট্য। এ সমস্ত কার্যকলাপ সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক লাইনের বিরোধী, প্যালেস্টাইনের জনযুদ্ধের বিরোধী— তাই আমরা এসবের বিরোধিতা করি।"

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭৪

বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ!

অনীক এর বিশেষ প্রতিনিধি

বছর তিনেক আগে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর বদান্যতায় একটি বাংলা গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, প্রায়ই তখন পথে ঘাটে ভেসে বেড়াতো সেই গানের সুর— "আমার বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ"। যতোদুর মনে পড়ছে, সেই গানটির মধ্যে এমন একটা বক্তব্যও ছিলো যে বাংলাদেশের সঙ্গে কারও তুলনাই নাকি চলতে পারে না। কেন জানি না এবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে ওই গানটির কথাই মনে ভেসে উঠছে বারবার। একটি সেন্টিমেন্ট্যাল গানের মধ্যেও যে এতো নির্মম রসিকতা লুকিয়ে ছিলো, তা কি তখন একবারও ভাবতে পেরেছিলাম!

এবার ঢাকা যাবার পথে যশোরে নেমেই বর্তমান বাংলাদেশের একটা বাস্তব ছবি পেয়ে গেলাম বিনা প্রস্তুতিতেই। সেদিনকার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার একটি ছোট্টো খবর : গত আড়াই মাসে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই একটি সংস্থা (আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম) অনাহারে মৃত ৯৭৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, এবং তাছাড়াও স্থানীয় লোকদের দ্বারা সংগৃহীত মৃতদেহ তো আছেই। যশোরের এক সংবাদপত্র সম্পাদকের অফিসে বসে খবরটা পড়লাম, এবং স্তম্ভিত বিস্ময়ে পুরোণো দৈনিক পত্রিকাগুলির ফাইল উল্টাতে গিয়ে ২৩শে অক্টোবরের দৈনিক 'ইত্তেফাক' হাতে এলো, যাতে বলা হয়েছে : শুধুমাত্র রংপুর জেলাতেই প্রতিদিন গড়ে এক হাজারেরও বেশি লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। ক'দিন পরে রেডিওতে শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার নিজেই স্বীকার করেছে যে, এবছর অন্ততঃ সাতাশ হাজার লোক বাংলাদেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবুও এর মধ্যে 'পেটের পীড়ায়' (ভারত সরকারের ভাষায় যাকে বলা হয় 'অপুষ্টিতে'!) মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ধরাই হয়নি। সব দেখে শুনে এটাই এবার মনে হলো যে, আমরা গত সাতাশ বছর ধরে ভারতে বৃটিশ প্রদত্ত দিল্লী কা লাড্ডু স্বাধীনতার যে পরম আস্বাদ পেয়ে আসছি, বাংলাদেশের জনগণ মাত্র তিন বছরেই রুশ নয়া জারদের বকলমে আমাদের মহারাণী কর্তৃক প্রদত্ত সেই পরম স্বাধীনতার আস্বাদ মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরে ফেলেছেন!

অবশ্য মহারাণীর বশংবদ পাত্র-মিত্র-অমাত্যরা এক্ষুণি যুক্তি হাজির কোরে বলবেন— দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণ, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে সামলে উঠতে তো একটু সময় লাগবেই। বলাই বাহুল্য, এদেশেও গত

প্রায় সাতাশ বছর ধরে ঠিক এধরণের যুক্তিই শুনতে শুনতে আমাদের কান পচে গেছে, এখন সেই একই যুক্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে দেখলে স্বভাবতঃই আমাদের ভুরু কুঁচকে যেতে পারে। তার ওপর যখন সরকারী পরিসংখ্যান দিয়েও এ যুক্তি কিছুতেই আর খাড়া করা যায় না। কারণ, শেখ মুজিবের নিজেরই ঘোষণা অনুসারে, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী নাকি বাংলাদেশে সর্বমোট ৯০০ কোটি টাকার ধন-সম্পদ লুঠ বা ধ্বংস কোরে গেছে। আর গত তিন বছরে বিদেশ থেকে 'সাহায্য' বাবদ বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা। তাহলে তো ২১০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকার কথা! সেই ২১০০ কোটি টাকার ধন-সম্পদ কোথায় গেলো? কেনই বা এই বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে না খেয়ে মরতে হয় বাংলাদেশে? কিংবা অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, বাংলাদেশের সরকারী হিসেব অনুসারে ('বিচিত্রা' পত্রিকা / ৮.১১.৭৪ সংখ্যা) এবছর মোট খাদ্য-উৎপাদন ধরা হয়েছে ১০৬ লক্ষ টন এবং মাথা পিছু দৈনিক সাড়ে সাত ছটাক খাদ্য প্রয়োজনীয় বলে ধরে মোট প্রয়োজন হচ্ছে ১২৪ লক্ষ টন খাদ্য— অর্থাৎ ঘাটতি ১৮ লক্ষ টন। এর সঙ্গে এবছর বন্যার জন্য ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ধ্বংস হয়েছে ধরে নিয়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২৩ লক্ষ টন— অর্থাৎ মোট প্রয়োজনের ১/৫ অংশ। তাহলে বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার মাথাপিছু দৈনিক গড় ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে মাত্র দেড় ছটাক। এই সামান্য ঘাটতি থেকে বাংলাদেশে এবারে হাজার হাজার লোকের অনাহারে মৃত্যুবরণের কোনো যুক্তিই মেলে না। অর্থাৎ এককথায়, তথাকথিত শিশুরাষ্ট্রের দোহাই দিয়েও বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

অবশ্য বাংলাদেশের "বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি" কথাটির আরেকটু ব্যাখ্যা দরকার। গত বছর দুয়েক ধরে চীন-সহ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ বাদে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই প্রচণ্ড এক অর্থনৈতিক সংকট চলছে— মন্দা, ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী ইত্যাদি এ সমস্ত দেশের একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশ ভারতও যে তার ব্যতিক্রম নয়— আমরা নিজেদের জীবন দিয়ে প্রতিনিয়ত তা উপলব্ধি করছি। কিন্তু বাংলাদেশে এই বিষয়গুলিই অনেক অনেক বেশি প্রকট— ১৯৭১ সালের পর উৎপাদন মূলতঃ বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমে গেছে; বেকার সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে; আর জিনিষপত্রের দাম? এক কথায়, তার কোনো তুলনাই নেই। আমাদের দেশে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির তাড়নার অস্থির আমরাও বাংলাদেশের তুলনায় এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছি। কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি : ১৯৭১ সালের আগেও দেশের মানুষ এক টাকার বেশি দাম দিয়ে এক সের চাল কেনে নি, এ বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এক সের চালের দাম উঠেছিলো ১৪ টাকা (বর্তমানে নোতুন চাল ওঠার পরেও দাম চলেছে ৬ থেকে ৮ টাকা); লবণের দাম হয়েছিলো ৪০ টাকা সের; সরষের তেল ৪০ টাকা; দুধ ১৬ থেকে ২০ টাকা সের এবং বেবিফুড প্রায় ১০০ টাকা সের— তাও দুটোই দুষ্প্রাপ্য; লংকা ৮০ টাকা সের; কেরোসিন তেল ১৫ টাকা গ্যালন;

আটা ৮-১০ টাকা সের ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায়, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার খরচ গত তিন বছরেই অন্তত ৫ থেকে ৬ গুণ বেড়ে গেছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় কি এর মধ্যে ৫ থেকে ৬ গুণ বেড়েছে? অবশ্যই না। কেরাণী, শিক্ষক, অধ্যাপক অন্যান্য চাকুরে ব্যক্তি বা শ্রমিকদের আয় (টাকার অংকে) বেড়েছে সামান্যই, এবং এরাই পড়েছে সবচেয়ে আর্থিক সংকটে। দেশের শতকরা আশি ভাগ যে কৃষকেরা, তাদের অবস্থাও তথৈবচ— কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাদের মোটেই লাভ হয় নি, তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। ছোটোখাটো ব্যবসাদার-উৎপাদকের অবস্থাও মোটেই সুবিধের নয়। এই অর্থনৈতিক সংকটে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর চোরাচালানকারী ও কালোবাজারীর দল, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরে বড়লোক হয়েছে এক শ্রেণীর আমলা ও সরকারী দলের ধ্বজাধারী— গোটা দেশটা ছেয়ে গেছে ব্যাপক দুর্নীতিতে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের তথাকথিত স্বাধীনতার নেট রেজাল্ট।

কিন্তু কেন এরকম অবস্থা হলো? স্বভাবতঃই এ প্রশ্নটিই মনে সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং বিভিন্ন স্তরের যতো লোকের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বলেছি, তারা সবাই একটি উত্তরই দিয়েছেন— এ সবের মূলে রয়েছে স্মাগলিং বা চোরাচালান, ভারতের ব্যবসায়ীরা ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় চোরাই পথে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে গিয়ে দেশটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। দু'বছর আগে যখন ঢাকা গিয়েছিলাম, তখনও এ ধরণের অভিযোগ শুনেছিলাম, কিন্তু সরকারী মহল সে সম্পর্কে মোটামুটি নীরবই ছিলো। কিন্তু এবার এই অভিযোগটাই দেখলাম সবার মুখে মুখে, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা তো বটেই, এমনকি খোদ সরকারী মহল থেকে এবং প্রত্যেকটি বৃহৎ সংবাদপত্রের (প্রায় প্রত্যেকটিরই পরিচালনায় রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের বা আওয়ামী লীগের লোক) পক্ষ থেকেও ওই একই অভিযোগ শুনলাম। এ সব বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করবার জন্য অনেকের সঙ্গে কথা বলে, অনেক পত্রপত্রিকা ও সরকারী নথিপত্রের পাতা উল্টে আমিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই অভিযোগ মূলতঃ সঠিক। কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম, তা এবার বলছি।

প্রথমেই বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পাটের কথা ধরা যাক। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে : ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ বেল পাট উদ্বৃত্ত হয়েছিলো, পরবর্তীকালে যার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওখানকার সরকারী ও বেসরকারী মহলের অভিযোগ, ওই পাট ভারতে চোরাই পথে পাচার করা হয়েছিলো। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট পাট উৎপাদন ছিলো ৭৫-৮০ লক্ষ বেল— তার মধ্যে সরকারী রপ্তানি হয়েছিলো ২২ লক্ষ বেল, দেশে উৎপাদনের কাজে লেগেছিলো ৩৪ লক্ষ বেল, ক্ষয়ক্ষতি ৪ লক্ষ বেল— অর্থাৎ মোট

উদ্‌বৃত্ত ছিলো অন্ততঃ ২১ লক্ষ বেল। এই উদ্‌বৃত্তের সংগে ১৯৭৩-৭৪ সালের মোট উৎপাদন ৫৫ লক্ষ বেল যোগ করলে দাঁড়ায় ৭৬ লক্ষ বেল— তার মধ্যে রপ্তানি ২৭ লক্ষ বেল, স্থানীয় ব্যবহার ৩৪ লক্ষ বেল— অর্থাৎ এ বছর মোট উদ্‌বৃত্ত থাকার কথা ১৫ লক্ষ বেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারের হাতে ছিলো ৫ লক্ষ বেল— অর্থাৎ বাকী ১০ লক্ষ বেল ভারতে পাচার হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এবছর ভারতের পার্লামেন্টেও সরকারীভাবেই জানানো হয়েছিলো যে, চোরাই পথে বাংলাদেশ থেকে ১০ লক্ষ বেল পাট ভারতে এসেছে। ১৯৭১-৭২ সালের পাচার করা ২৫ লক্ষ বেলের সঙ্গে এই ১০ লক্ষ বেল যোগ করলে, গত তিন বছরে শুধু পাট বাবদই বাংলাদেশ থেকে ভারতে অন্ততঃ ১৪০ কোটি টাকার পণ্য (এক বেলের দাম ৪০০ টাকা) চোরাই পথে এসেছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, এই বিপুল পরিমাণ পাট ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কী ভাবে চোরাই পথে ভারতে নিয়ে এলো? এবং ভারত সরকারই বা কেন এতে বাধা দিলো না? এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়াটাও খুব কষ্টকর হবে না। বাংলাদেশে যে সব অঞ্চলে পাট প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়, সেগুলির অধিকাংশই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত। সেখান থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের অসুবিধে এবং প্রচুর পরিমাণ পাট গুদামজাত কোরে রাখার অসুবিধের পটভূমিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অঢেল টাকা ছড়িয়ে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দালালদের এক দুষ্ট চক্র গড়ে তুলেছে, এবং তাদের সাহায্যে অগ্রিম দাদন দিয়ে বা পাট উৎপন্ন হবার পর সমস্ত ফসল কিনে নিয়ে আগে থাকতেই এই সব পাট দখল কোরে নিয়েছে। সরকারী আমলারা বা আওয়ামী লীগের মাস্তানরা টাকার লোভে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে এবং দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকেরা নগদ টাকা হাতে পেয়ে তাদের উৎপন্ন বিক্রি কোরে দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রধানতঃ নদীপথে এবং কিছুটা স্থলপথে এই সব চোরাই পাট ভারতে পাচার হয়ে গেছে। এ প্রসংগে একটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের ছিলেন খুলনার একজনা সামান্য আয়ের লোক। গত তিন বছরে প্রধানতঃ ভারতীয় চোরাইচালানকারীদের আশ্রয় দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য কোরে তিনি আজ কোটিপতি হয়ে গেছেন— এ খবর বাংলাদেশে খুব প্রকাশ্যভাবেই প্রচারিত হয়ে গেছে। ভারতীয় চোরাচালানকারীরা অন্ততঃ ৪০০-৫০০ কোটি টাকার পুঁজি বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালানী ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেছে। ভারতের কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চোরাচালানী— শ্রীমন্টুভাই ভিমানী গত আড়াই বছর ধরে প্রতি মাসে যে একবার কোরে বাংলাদেশ সফর কোরে আসছে, তা নিশ্চয়ই শুধুমাত্র হাওয়া খাবার জন্য নয়!

আর ভারত সরকার কর্তৃক চোরাই পথে এই পাটের আমদানীকে মদৎ দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা "সত্যি কথা বলতে গেলে, বেআইনী ভাবে পাট আমদানি যে দুটি ফলাফল সৃষ্টি করে, তার কোনোটাই কেন্দ্রীয় অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অনভিপ্রেত নয় : প্রথমতঃ তা ভারতে উৎপন্ন পাটের দাম কমিয়ে রাখে; দ্বিতীয়তঃ চোরাই পথে প্রাপ্ত পাটের গাঁট তৈরী কোরে দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে তা রপ্তানি করা হয়। ফলে

ভারতীয় অর্থনীতি লাভবান হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পাট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও (রণজিৎ রায়, "একটি ক্রমবর্ধমান ব্যবসা", হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা : ২২শে আগষ্ট, ১৯৭৪)। আর এ ব্যাপারে একটি জ্বলন্ত প্রমাণও আমাদের চোখের সামনেই আছে। বছর ২/৩ আগেও মূলতঃ পশ্চিমবংগে উৎপন্ন পাটের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় চটশিল্প উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচামালের অভাবে প্রায় ডুবতে বসেছিলো— কিন্তু গত ২/১ বছর ধরে চটশিল্পের উৎপাদনে নোতুন কোরে জোয়ার এসেছে, ওভারটাইম দিয়ে উৎপাদন চলছে। এর পেছনে বাংলাদেশ থেকে চোরাইপথে আমদানিকৃত পাটের ভূমিকা কাউকে আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

পাটের প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার প্রধান খাদ্যশস্য চাল ও গমের দিকে তাকানো যাক। বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের হিসেব অনুসারে, ১৯৭১-র পরবর্তী তিন বছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩২৩ লক্ষ টন এবং তাছাড়া ১৯৭৪-এ আউস ধান উৎপাদন হয়েছে ২৮ লক্ষ টন— অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৩৫১ লক্ষ টন। আর এই তিন বছরে খাবার জন্য মোট প্রয়োজন ৩৩৩ লক্ষ টন, এবং বীজধানের জন্য (মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ) প্রয়োজন ৩৩ লক্ষ টন— অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৬৬ লক্ষ টন। এই তিন বছরে (১৯৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত) বিদেশ থেকে মোট খাদ্য আমদানির পরিমাণ ৬৪ লক্ষ টন। অর্থাৎ, উৎপাদন ও আমদানি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে— ৩৫১ + ৬৪ = ৪১৫ লক্ষ টন, মোট প্রয়োজন যেখানে ৩৬৬ লক্ষ টন । অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হবার কথা— কিন্তু যার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি 'ইত্তেফাক' পত্রিকা পর্যন্ত দাবী করছে যে, এই খাদ্যশস্য ভারতে পাচার হয়ে গেছে। টাকার অংকে গড়ে ১০০ টাকা খাদ্যশস্যের মন ধরলে এক টনের দাম দাঁড়াচ্ছে ২৭০০ টাকা, এবং ৫০ লক্ষ টনের দাম দাঁড়াচ্ছে ১৩৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকার খাদ্যশস্য গত তিন বছরে ভারতে পাচার হয়েছে বলে বাংলাদেশের তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিযোগ করছেন।

পাট, চাল, গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যই শুধু নয়, এছাড়াও বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করা বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, নানাবিধ ভোগ্য পণ্য, ডেকরন কাপড়, এবং বিদেশ থেকে আগত ত্রাণ সাহায্যেরও একটা বিপুল পরিমাণ অংশ চোরাই পথে ভারতে চালান হয়েছে। ফলে, সব মিলিয়ে অন্ততঃপক্ষে ২০০০ থেকে ৩০০০ কোটি টাকার পণ্য গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চোরাই চালান হয়েছে বলে বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দাবী করছেন। এরপর স্বভাবতঃই ভারতীয়দের দু'হাত তুলে "বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ"! বলে নৃত্য না করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না!

এই চোরাই চালানের ব্যাপারে দু'টি সাম্প্রতিক ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলাদেশ লবন তৈরী হয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে, এবং সেটাও হয় বছরের একটা বিশেষ সময়ে। এবছর লবন উৎপাদনের সময় ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং

তাদের এজেন্টরা এসে উৎপাদনের পরে পরেই ২০-২৫ পয়সা সের দরে প্রায় সমস্ত লবন কিনে নিয়ে যায়। ফলে সারা বাংলাদেশে লবনের প্রচণ্ড অভাব দেখা যায়, লবনের দাম সের প্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়, এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ২০-২৫ পয়সা সের দরে কেনা সেই লবনই আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে ৩০-৪০ টাকা দামে বিক্রি করে, এবং এভাবে প্রচণ্ড মুনাফা কামিয়ে নেয়। আবার লবনের এই সংকটের ফলে পশু চামড়া শিল্পও সংকটে পড়ে যায়। কারণ, সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে গড়ে গরু প্রভৃতির চামড়াকে ঠিকভাবে রাখার জন্য ৪ সের মতো লবন লাগে, কিন্তু এই প্রচণ্ড দামে লবন কিনে চামড়া ঠিকভাবে রাখা আর্থিক কারণেই অসম্ভব হয়ে পড়ার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রায় জলের দামে এই সব চামড়া কিনে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যায়, এবং এভাবে আরেক প্রস্থ মুনাফা কামিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটির সঙ্গে রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশ প্রতি বছর ইরাককে বেশ কিছু পরিমাণ শুকনো লংকা রপ্তানি করতো। এবছর রাশিয়া বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৪ টাকা ৩০ পয়সা দরে প্রায় ২৭০০০ টন শুকনো লংকা কিনে নেয়। এর ফল হয় দু'টো— একদিকে বাংলাদেশে লংকার প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়, শুকনো লংকার দাম সের প্রতি ৮০ টাকায় এবং কাঁচা লংকার দাম ৪০ টাকায় লাফিয়ে ওঠে; অন্যদিকে, রাশিয়া বাংলাদেশ থেকে ৪ টাকা ৩০ পয়সা দরে কেনা এই শুকনো লংকাই ইরাককে বিক্রি করে ৩০ টাকা সের দরে। এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সরকারীভাবে বাংলাদেশ বাণিজ্য সংস্থার দ্বারাই।

ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরের পথে-ঘাটে একটু ঘুরলেই চোখে পড়বে, বিদেশে তৈরী নানারকম ভোগ্যদ্রব্য থেকে শুরু কোরে বিলাসদ্রব্য ইত্যাদির অঢেল বাজার, চোরাই পথেই আসুক বা সরকারীভাবেই আসুক, প্রকৃত দামের ৫/৬ গুণ দামে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে, এবং চোরাইচালান, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির কল্যাণে ফুলে ফেঁপে ওঠা এক নয়া বড়োলোকের দল এইসব বিদেশী জিনিষই দু'হাতে কিনছে, দেদার কাঁচা টাকা উড়োচ্ছে খোলামকুচির মতো। ঢাকা শহরে আমি নিজে দেখেছি, গলির মধ্যে ছোট্টো পানের দোকানেও 'স্টেট এক্সপ্রেস' সিগারেটের প্যাকেট থরে থরে সাজানো, এবং তা কিনবার খদ্দেরের অভাব আদৌ হচ্ছে না। দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যখন অনাহারে ও 'পেটের পীড়ায়' মারা যাচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ যখন ক্ষুধায় ধুঁকছে, তখন মুজিবশাহীর প্রসাদে এই সব নব্যবাবুর দল বিলাসে-ব্যসনে ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চোরাই চালানের এরকম ব্যাপক প্রসার তথা আধিপত্যের ফল হয়েছে মারাত্মক— কোনো বিশেষ উৎপাদন নয়, চোরাই চালান শিল্পই আজ পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে মুনাফাজনক শিল্পে। এবং এটা হয়েছে ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশে মুজিববাদী সমাজতন্ত্র কায়েম করার পটভূমিকাতে। ১৯৭১-এর আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানায় যেসব শিল্প পরিচালিত হতো, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের তাগিদ থেকেই সেখানে উৎপাদন চালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা অন্ততঃ অব্যাহত

রাখা হতো। কিন্তু ১৯৭১ এর পর ছোটো-বড়ো সমস্ত শিল্পকেই রাষ্ট্রায়ত্ত কোরে সেখানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দকেই প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব নয়া মালিকরা শুধু একটা জিনিষই চেনে— আর সেটা হচ্ছে কাঁচা টাকা, উৎপাদন হোক বা না হোক, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। তাই উৎপাদন বন্ধ কোরে কারখানার যন্ত্রপাতি বিক্রি কোরে কাঁচা টাকায় পকেট ভারী করতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত নয়, কারখানার পুঁজি ভেঙে পকেটস্থ করতেও তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এর ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় এসেছে এক সার্বিক নৈরাজ্য। আর এই সব প্রশাসকরা এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরাই আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃহত্তম জাতীয় শিল্প চোরাই চালানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো বেশি কাঁচা টাকা উপায়ের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। উৎপাদন গোল্লায় যাক, যতো পারো লুটেপুটে নেওয়া যাক— এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের একমাত্র জীবন দর্শন। আর অন্যদিকে ব্যাপক চোরাই চালানের মাধ্যমে একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল থেকে শুরু কোরে দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রপাতি পর্যন্ত পাচার হয়ে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতিটাই ভেঙে পড়েছে, আর সেই ছিন্নভিন্ন ও লণ্ডভণ্ড অর্থনীতির বুকের ওপর দাঁড়িয়ে যথেচ্ছ লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে এই মুজিববাদীর দল— শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ কোরে শোষণ তারা যতোটা না করছে, তারা চেয়ে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে করছে লুণ্ঠন। স্বাধীন সত্ত্বা বলতে প্রায় কিছুই নেই তাদের, তারা কাজ করছে প্রধানতঃ ও প্রত্যক্ষতঃ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের 'ফড়ে' হিসেবে— যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা আবার জন্মলগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এককথায়, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, তাদের ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী 'এবং তস্য ফড়ে' বাংলাদেশীয় ফড়ের দল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আজ লুটেপুটে খাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কেও কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও অল্পদিনের মধ্যেই আবার কাজ গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে। ১৯৭১ সালে যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের' মহারাণী পালিত নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড হাঁকডাকে দিগন্ত প্রকম্পিত করতো, বাংলাদেশ অর্থনীতিতে তারা আবার নোতুন কোরে শোষণের জাল বিস্তৃত করার অবাধ আমন্ত্রণ পেয়েছে, অর্থনৈতিক 'সাহায্যের' বকলমে শোষণ চালাবার প্রতিযোগিতায় তারাই আজ আবার প্রথম স্থান নিয়ে নিয়েছে, একমাত্র তেল সম্পদ ও গ্যাস খুঁজে বের করবার নাম কোরেই তারা দেড় হাজার কোটি টাকার পুঁজি বাংলাদেশে বিনিয়োজিত করার কর্মসূচী নিয়েছে। এব্যাপারে নয়া জাররাও কিছু কম যায় না। 'ইত্তেফাক' পত্রিকাই বাংলাদেশের রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর এই 'আনন্দ-সংবাদ' পরিবেশন করেছে যে, বাংলাদেশের সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামালকে ব্যবহার করার জন্য (অবশ্যই 'সমাজতান্ত্রিক' কায়দায়) তারা বাংলাদেশে কল-কারখানা

তৈরী কোরে দেবে, অর্থাৎ পুঁজি খাটাবে এবং তাদের লগ্নী পুঁজি শোধ না হওয়া পর্যন্ত সেসব কারখানার উৎপণ্য পণ্য তারা নিজেরাই ধার শোধ বাবদ নিয়ে যাবে। এই জুলাই তারিখের 'ইত্তেফাক' পত্রিকা এখবরও দিয়েছে যে, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য বাংলাদেশ-সোভিয়েত চুক্তি অনুসারে প্রায় ৭ লক্ষ রুবল ব্যয়িত হবে, তাছাড়াও প্রায় ২১ লক্ষ রুবলের রুশ যন্ত্র বাংলাদেশে পাঠানো হবে, এবং ৩৮ জন রুশ বিশেষজ্ঞ কারিগর আসবে। অবশ্য এসবের বিনিময়ে এসব কারিগরকে মাসিক ৩০০-৬৩৩ রুবল মাইনে দিতে হবে, এয়ারকণ্ডিশনড বাড়ী, ফ্রিজ ও গাড়ী দিতে হবে, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বীমার ও স্কুলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে, এবং বছরে একবার বিমান যোগে ঢাকা-মস্কো যাতায়াতের খরচ দিতে হবে— এবং এই সব ধার (ও তৎসহ ১৯৭১ সালের আগেকার ধার) স্বর্ণমানের ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে। মার্কিণ রুশের এই সব প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়াও, ভারতের প্রাইভেট সেক্টরে মার্কিণ পুঁজির এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে রুশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণ-জাত পরোক্ষ ভূমিকা তো থাকছেই।

আর বাংলাদেশের অর্থনীতির শতকরা ৯০ ভাগ অংশ যে কৃষিব্যবস্থা, সেখানে পূর্বতন অবস্থার, অর্থাৎ আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তনই হয় নি। তার ওপর কৃষিপণ্যের ব্যাপক চোরাইচালান ও উৎপাদনের সার্বিক নৈরাজ্য কৃষিব্যবস্থার সংকটকে আরো বেশি গভীরতর কোরে তুলেছে, ব্যাপক কৃষকসমাজের আগে যদিওবা একবেলা একপেটা বা আধপেটা খাবার জুটতো, এখন সেটাও জুটছে না, এবং এবছরের ভয়াবহ মন্বন্তরে মৃত্যুর সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন তাঁরাই। ধান-পাট-গমের দাম বেড়েছে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ কৃষকদেরই তাতে কোনো লাভ হয় নি— কেননা, চাষের আগেই দাদন নিয়ে বা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ফসলই তারা বিক্রি কোরে দিতে বাধ্য হয়ে থাকে, এবং সেটা অনেক কম দামে। মাঝখান থেকে পকেট ভারী করছে ফড়ে, দালাল ও চোরাইচালাকারীর দল। কৃষকসমাজ চিরস্থায়ী দারিদ্র্য ও অনাহারের করাল বন্ধনেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছেন।

এক কথায়, এই হচ্ছে 'জাতির পিতা' শেখ মুজিবের মানসপুত্র 'সোনার বাংলা'র বর্তমান চেহারা!

অনীক, ডিসেম্বর ১৯৭৪

তোমরা ভালো কোরে দ্যাখো

সমীর রায়

আমার ভালো লাগছে না, আমার ভালো লাগছে না
একটা গোল রুটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মানুষ
কবিতা লিখতে গেলে মরা মানুষের গায়ে হোঁচট খায় কলম।

আর ডিসে ডিসে সাজানো আঙ্গুর-আপেল-চিকেন্
মদ্যপ ইস্পাত মালিকের ঘরে।

ইস্পাত-মালিকদের প্রতিটি বাড়ী ফোর্ট উইলিয়াম
প্রতিটি ঘর লালবাজার।
চাঁদকে হিড় হিড় কোরে টেনে এনেছে তারা বেডরুমে।
প্রতি রাতে বেডরুম সুন্দরবন হয়
ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকী জ্বলে, বাঘ আসে, মেয়েমানুষের মাংস খায়।

আর কাকদ্বীপের মা
মরা ছেলের হাতে এনামেলের বাটি গুঁজে দিয়ে
লাইনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়।
লঙ্গরখানার লাইনে মরা ছেলেটা হাত বাড়িয়ে একহাতা খিচুড়ি নিয়ে পালায়।

ইস্পাত-মালিকের আঙ্গুর-আপেল চিকেন পাহারা দেয় ফোর্ট উইলিয়াম
ইস্পাত মালিকের বেডরুম পাহারা দেয় লালবাজার।

আর কাকদ্বীপের মা
মরা ছেলের হাত থেকে এনামেলের বাটি কেড়ে নেয়
বাটিতে ছোবল মারে।

তোমরা যারা বিপ্লবের প্রোগ্রাম তৈরী করছো
মরা ছেলেটার নীল চোখের দিকে তাকাও
তোমরা যারা মার্কস পড়ছো, লেনিন পড়ছো
তোমরা যারা কবিতার জন্য, গল্পের জন্য মাটি ছেনছো

নদীর জলে পা ধুয়ে একটার পর একটা কালিন্দী পার হচ্ছো
মরা ছেলেটার নীল চোখের দিকে তাকাও।
ভাঙা লণ্ঠনের মতো আধখানা চাঁদকে নীচে নামিয়ে
চাঁদের আলোয় ছেলেটির নীল চোখ ভালো কোরে দ্যাখো

গোলাকার গ্লোবটার যেখানে ভারতবর্ষ
সেইখানে, সেইখানে টল্‌টলে সাদাচোখ নীল হয়ে গেলো
তোমরা ভালো কোরে দ্যাখো।

এখানেই যন্ত্রণা, ঘৃণা আর বারুদের ত্রিবেণী তোমার।

আজকের ভারত

আরও একটা বছর পার হয়ে গেলো শুরু হয়ে গেলো ১৯৭৫ সাল।

নোতুন বছরের প্রথম মুহূর্তে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে আমরা কী দেখতো পাবো?

দেখতে পাবো 'দুনিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্রের' মহিমা— যে গণতন্ত্রের নিত্যসঙ্গী দুর্ভিক্ষ-অনাহার-মৃত্যু, মুদ্রাস্ফীতি-দামবৃদ্ধি-বেকারত্ব, নিরক্ষরতা-অপসংস্কৃতি, শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন। ১৯৪৭-এর তথাকথিত স্বাধীনতার সাতাশ বছর পরেও এই নিত্যসঙ্গীর দল সঙ্গ ছাড়ে নি ব্যাপক মেহনতী জনতার, তাই আজও তাদের ধুঁকতে হচ্ছে। দেশের জনতার সত্তর শতাংশ যে ব্যাপক কৃষক-জনতা, তাঁরা ধুঁকছেন জোতদার-মহাজনদের শোষণের নিগড়ে; শ্রমিকরা ধুঁকছেন মালিকদের শোষণে; ব্যাপক মেহনতী জনতা ধুঁকছেন রংবেরঙের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, তাদের ওপর মূলতঃ নির্ভরশীল দেশীয় পুঁজিবাদ এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের করাল বন্ধনে। ধুঁকতে ধুঁকতে তাঁদের হাত যখনই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠছে, তাঁরা যখন ফেটে পড়ছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের লড়াইয়ে, অমনি নেমে আসছে ফ্যাসিষ্ট শ্বেতসন্ত্রাস— গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি, খুন। গত কয়েক বছরে শোষণ থেকে মুক্তির লড়াইয়ে সামিল কতো হাজার মানুষকে যে খুন করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কতো হাজার মানুষকে যে রুদ্ধকারার অন্তরালে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে— কেউ কি দিতে পারবে তার সঠিক হিসাব? তবুও আমরা নাকি দুনিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে বাস করছি! কী নির্মম রসিকতা!

এই নির্মম রসিকতাটির যারা স্রষ্টা, ভারতের সেই শাসকশ্রেণীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, শোষণ ও শাসনের ব্যাপারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে কেন্দ্র কোরে তাদের নিজেদের মধ্যেই আজ শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি। যে রুশ-মার্কিণ বৃহৎ শক্তিদ্বয় দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতেও নিজ নিজ প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষতঃ ১৯৭১ সালে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর থেকে এ দেশে রুশ নয়া জারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সম্প্রতি মার্কিণী ঈগল সেখানে নোতুন কোরে তার ডানা বিস্তার করতে চাইছে, ভারতের সঙ্গে নোতুন সম্পর্ক গড়ে তুলে নোতুন

কোরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভকেও কাজে লাগাতে কসুর করছে না। এ ব্যাপারে মার্কিণী স্বার্থের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা দাবী করছে— এভাবে তারাই নাকি কমিউনিষ্টদেরকে গণ-বিক্ষোভকে ব্যবহার কোরে বিপ্লব গড়ে তুলবার কাজে কার্যকরী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আবার ইন্দিরা গান্ধীরা তার বিরোধিতা কোরে বলছেন— না, না, সেটা ঠিক নয়, কারণ এর ফলে গণ-বিক্ষোভ আরও সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে, শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বেড়ে যাবে। শাসকশ্রেণীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার এদেশে শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকেই আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শাসকদলের ক্রমহ্রাসমান এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশের সংশোধনবাদী ও সমাজ-গণতন্ত্রী দলগুলি নোতুন কোরে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে এবং লড়াইয়ের বুলি আওড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তবুও সিপিএম-সহ এ ধরণের সংসদীয় বামপন্থী দলের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যে বিপুলসংখ্যক বিপ্লবী শুভেচ্ছাসম্পন্ন জঙ্গী কর্মীরা রয়ে গেছেন তাদের অসংখ্য প্রশ্নকে প্রশমিত করা যাচ্ছে না, তারা আরও নোতুন, আরও জঙ্গী কর্মসূচী দাবী করছেন। এবং নেতারাও চেষ্টা করছেন নোতুন কায়দায় কিছু কিছু বিপ্লবীয়ানা জাহির করতে, যাতে আবার বিপুলসংখ্যক কর্মী ও সমর্থকদেরকে নির্বাচনের কানাগলিতে ঠেলে দেবার সুযোগ নেওয়া যায়। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এদের মধ্যেও বেশ কিছু কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর যারা সশস্ত্র লড়াইকে শোষণ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেন, তারা অনেকেই জনগণ থেকে তাদের অতীত-বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে তুলে আন্তরিকভাবে নোতুন কোরে বিপ্লবী লড়াই গড়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু একাজে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যেকার ঐক্যের অভাব। ব্যাপক বিপ্লবী কর্মীরা ঐক্যের আশু প্রয়োজনীয়তা খুব গভীরভাবে অনুভব করলেও, এখনও পর্যন্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা মূলতঃ আলাপ-আলোচনা, বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। এব্যাপারে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ এখনও তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলতঃ ভারতের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেও তাঁরা কোনো নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছেন না।

এসবের ফলে শত অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী প্রায় বহাল তবিয়তেই শাসন চালিয়ে যেতে পারছে। তাদের আধা-বৃহৎশক্তি হবার আকাঙ্ক্ষা যেমন দিন দিন আরো জোরদার হচ্ছে, ঠিক তেমনি তারা জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চাইছে উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। শুধু তাই নয়, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য, লড়াইয়ের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য তারা চালিয়ে যাচ্ছে এক সর্বাত্মক চক্রান্ত। জনগণকে তারা ঠেলে দিচ্ছে লটারি-জুয়ো-সাট্টার কানাগলির পথে, আধ্যাত্মিকতা-গুরুবাদ ভাগ্যনির্ভরতার পথে, তুলে ধরছে যৌনতা আর রহস্য রোমাঞ্চের গোঁজামিলে তৈরী অপ-সংস্কৃতির নিত্য নোতুন নিদর্শন।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জনগণ রুখে দাঁড়াচ্ছেন অত্যাচার-অনাচার ও

শোষণের বিরুদ্ধে, ভারতের তথাকথিত অসচেতন রাজ্যগুলিতেও সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ। ঐক্যবদ্ধ সঠিক নেতৃত্বের অভাবে রংবেরঙের সুবিধেবাদীরাই এসব আন্দোলনে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে— সাম্প্রতিককালে রেল ধর্মঘট ও বিহারের গণ-আন্দোলন প্রভৃতি তারই প্রমাণ বহন করেছে। অর্থাৎ, ভারতের গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিপ্লবী লড়াইয়ের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কার্যতঃ বিরাট এক শূন্যতা বিরাজ করছে।

বিগত বছরে এই শূন্যতা পূরণের পক্ষে উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ মূলতঃ আমরা দেখিনি। ১৯৭৫ সালের প্রথম লগ্ন ঠিক এটাই দাবী করছে যে, এই শূন্যতা পূরণ করতে হবে— এবং সেটাই হবে এদেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতার শোষণ-মুক্তির পথের প্রথম পদক্ষেপ।

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৫

মৃণাল সেনের 'কোরাস'

যারা মৃণাল সেনের 'কলকাতা-৭১' ছবির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অনুপস্থিতি এবং 'পদাতিক' এর মধ্যে 'সূক্ষ্ম প্রতিবিপ্লব' আবিষ্কার কোরে মৃণাল সেনের গত কয়েক বছরের শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে একটি নেতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলেছিলেন তারা তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবি 'কোরাস' দেখার পরেও কি সেই নেতিবাচক মানসিকতা আঁকড়ে থাকবেন? আমাদের মতে, 'কোরাস' ছবির মাধ্যমে মৃণাল সেন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ কোরে দিয়েছেন— তিনি কোন্ পক্ষের লোক— শাসকশ্রেণীর, না মেহনতী জনতার এবং মেহনতী জনতার পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরার শিল্প সম্মত প্রচেষ্টা হিসেবে এ ছবি অতি অবশ্যই ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের আজ পর্যন্ত সৃষ্ট সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সবচেয়ে পরিণত ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আপাত-দৃষ্টিতে 'কোরাস' একটি আধুনিক ফ্যান্টাসি। মর্তভূমির কোনো এক রাজ্যে দুঃখ অভাব বঞ্চনায় নিয়ত জর্জরিত ব্যাপক মানুষের জন্য সদা-চিন্তিত দেশনায়ক সপারিষদ বৈঠক কোরে চলেন তাদের জনমানব বিচ্ছিন্ন অতীব সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে। বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে দয়াল শাসক অবশেষে একশোটি চাকরির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সেজন্য ফর্ম ছাপান হাজার হাজার— কেননা, প্রতি ফর্ম দু'টাকা কোরে বিক্রি কোরে বেশ কিছু টাকা কামানোর বন্দোবস্ত হয়ে যায়। দুর্গের ফটকে দূর-দূরান্তের মানুষ এসে লাইন দেয় ফর্মের জন্য। সে এক উন্মত্ত অবস্থা— সান্ত্রীর লাঠি ঘোড়া, রোদ্দুর-জল-ঝড়, বোমাবৃষ্টি— কোনো কিছুই দমাতে পারে না একটা ফর্মের জন্য মানুষের আকুলি-বিকুলিকে— চাকরি না হোক, একটা ফর্ম অন্ততঃ চাই। আর এই ফর্মের লাইন থেকেই সাংবাদিক সংগ্রহ করে শহরে ক্রমবিধ্বস্ত এক মধ্যবিত্ত পরিবারের হতাশার করুণ কাহিনী, সংগ্রহ করে দেশের খাবারের জোগানদার যে কৃষক, মহাজন-জোতদারের নির্মম লালসায় তাদের সর্বস্বান্ত হবার, তাদের নাভিশ্বাসের কাহিনী; সংগ্রহ করে কারখানার শ্রমিকদের পাঁজরভাঙা জীবনের কাহিনী, সংগ্রামের পাশাপাশি কলহ-সংঘাত পীড়ন-অবক্ষয়ের কাহিনী, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনায় হতাশাগ্রস্ত মত্ত শ্রমিকের অবিনাশী শ্রমিক-সত্তার কাহিনী। এদিকে চাকরী না পাওয়া তিরিশ হাজার মানুষ উপলব্ধি করে যে শাসকশ্রেণীর দ্বারস্থ হয়ে তাদের দুঃখের অবসান হবে না; তাই তারা বঞ্চনায় ক্ষোভে গড়ে তোলে এক গোপন সংগঠন, গোপন আস্তানা থেকে হুমকি পাঠায় শাসকশ্রেণীর কাছে— তারা এবার নোতুন সাজে সজ্জিত হয়ে শাসকশ্রেণীকে ধ্বংস করবে এবং নোতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। প্রমাদ গোণেন দেশের দয়াল প্রভু, ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে

শুরু করেন ব্যাপক শ্বেত-সন্ত্রাস— জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন, গ্রেপ্তার, গুলি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, কোনো সন্ধান মেলে না সেই রহস্যময় তিরিশ হাজারের। সেপাই-শান্ত্রী-প্রচারবিভাগ একে আখ্যা দেয় একটা হুজুগ হিসেবে, ভাঁওতা হিসেবে। তবু দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তিরিশ হাজারের প্রেরণা, সংগ্রামের আহ্বান— গ্রামের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের মধ্যবিত্ত সবার বুকের মধ্যে, রক্তের মধ্যে মিশে থাকে, তাদের বাঁচবার লড়াইয়ের, লড়াইয়ের অগ্রগতির এক দুর্জয় প্রতীক তিরিশ হাজার। আর এই সংগ্রামী অগ্রগতির সামনে প্রমাণিত হয়ে যায় শাসকশ্রেণীর প্রকৃত দুর্বলতা, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। হাজার নির্যাতনে হাজার সন্ত্রাসেও কোনো ফল হয় না, কোনো খবর পাওয়া যায়না কারণ মরাটা সংগ্রামী জনতার কাছে কিছুই নয়। ওরা বেড়ে চলে, বাড়তে থাকে, তিরিশ হাজার পরিণত হয় তিরিশ লক্ষে, জাগিয়ে তোলে মুক্তির এক দুর্জয় স্বপ্ন, ক্ষেত-কারখানা-শহরের কোটি কোটি মেহনতী মানুষের ভাঙা বুকের মধ্যে নড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সেই ভয়ংকর 'সমাজ-বিরোধী' স্বপ্ন; তারা হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এগোতে থাকে সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য। শাসকশ্রেণী শত চেষ্টা সত্ত্বেও পারেনা সেই স্বপ্নকে নিষিদ্ধ করতে, তাকে চুরমার কোরে ফেলতে— কারণ সেই দুর্জয় স্বপ্নের কাছে শাসকশ্রেণীর আইন-আদালত-সেপাই-সান্ত্রী কোনো কিছুই কাজ করে না, তাদের ওয়ারলেস্ সেখানে কাজ করে না, টেপ-রেকর্ডারে শব্দের দাগ পড়ে না...! শাসকশ্রেণীকে গা ঢাকা দিতে হয় ইঁদুরের গর্তে। দুর্গের ভিত পর্যন্ত উপড়ে ফেলার জন্য এগিয়ে চলে মেহনতী মানুষ, এগিয়ে চলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য।

এই হচ্ছে 'কোরাস'— মৃণাল সেনের 'আধুনিক ফ্যান্টাসি'— আজগুবি কাহিনী। কিন্তু নিটোল কোনো কাহিনীহীন এই আজগুবি কাহিনীর টুকরো টুকরো কথা-ঘটনা-মুহূর্তের মধ্যেই দর্শকরা খুঁজে পাবেন সমসাময়িক ভারতবর্ষকে, খুঁজে পাবেন এদেশের শোষণ নিপীড়ন-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী আন্দোলনকে, সাময়িকভাবে পিছু হটলেও যা আজ পরিণত হয়েছে শোষণ-মুক্তির এক দুর্বার প্রতীকে দুর্জয় স্বপ্নে। সেকারণেই শহরে-গ্রামে পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে তিরিশ হাজারের কথা এবং তার সামনে শাসক শ্রেণীর ভীত সন্ত্রস্ত্র চেহারাটা আমাদের বড্ডো বেশি পরিচিত বলে মনে হয়, পরিচিত মনে হয় দেয়ালের লিখনে পুলিশের আলকাতরা বোলানোর ছবিটাকে; পথে পথে পুলিশের সবুট পায়ের আওয়াজকে, ঘরে ঘরে যুবকদের ও আত্মীয়-পরিজনদের রাত কাটানোর দুঃসহ আশংকিত মুহূর্তগুলিকে, রেডিওতে দেবদুলালীয় কণ্ঠে শাসকশ্রেণীর নির্লজ্জ স্তাবকতাকে। এদেশের মেহনতী জনতার ওপর ফ্যাসিষ্ট কায়দায় সরকারী আইন শৃঙ্খলার প্রহরীদের হামলা, জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন, গণ-বিক্ষোভের ও অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্মম শ্বেত-সন্ত্রাসের বিস্তার, পথে ঘাটে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি কোরে হত্যা, হাজার হাজার লোককে চাকরী দেবার ভাঁওতাবাজী, চাকরীতে যোগ্যতার প্রথম ও একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে পুলিশ-রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব প্রদান, ইত্যাদি সব কিছুই কি আমাদের অতি পরিচিত নয়? অতি পরিচিত নয় কি রক্তচোষা

জোতদারের শোষণের কাহিনী, কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ভাঙাভাঙি ও ইউনিয়নবাজীতে সংগ্রামী শ্রমিকের হতাশা, ক্রমশঃ তলিয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে অস্তিত্বের লড়াইয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত মর্যাদাবোধের দ্বন্দ্ব? অতি পরিচিত নয় কি শাসকশ্রেণীর অন্যতম হিসেবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক জনৈক বিদেশীর উপস্থিতি?

সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণী-সংগ্রামের ঝোড়ো হাওয়ার উথাল-পাথাল আমাদের সমাজের কিছু অতি পরিচিত দৃশ্য-ঘটনা-মুহূর্তকে রূপ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন নি মৃণাল সেন, বরং সমাজের নেতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলিকেও তুলে ধরেছেন, এবং ধরেছেন উজ্জ্বলতরভাবে— যা একজন সমাজ-সচেতন শিল্পীর অবশ্য দায়িত্ব। সেকারণেই ধর্মঘট ভেঙে কাজে-যোগ-দেওয়া হতাশ শ্রমিকের হাজার কাপুরুষতা-হতাশা মত্ততার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার সংগ্রামী শ্রমিক সত্তা, মৃত্যুর মুহূর্তে তার কণ্ঠে তাই সংগ্রামের গান, মেহনতী মানুষের অগ্রগতি মিছিলে তার স্বপ্নের রূপায়ণ; শাসকশ্রেণীর "চেনা-জানা" স্লোগান মিছিল-হুমকি-মেমোরাণ্ডাম-আলোচনা-চুক্তি তথা মেমোরাণ্ডাম-প্রতিশ্রুতি-জনগণের-প্রতীক্ষা মার্কা দেউলিয়া রাজনীতি যা আসলে এই সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে জনগণকে বিভ্রান্ত করারই একটা হাতিয়ার, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি তিরিশ হাজারের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সংগ্রামী মানুষের দৃপ্ততর উজ্জ্বলতর মিছিল। এ ছবি শুধুই স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের বা শুধু রূপায়ণের ছবি নয়, একই সঙ্গে দুয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে এ ছবিতে। তাই এতে ফুটে উঠেছে শাসকশ্রেণীর আপাত শক্তিশালী চেহারার অন্তরালে তাদের জনগণ বিচ্ছিন্ন স্বরূপ, তাদের কাপুরুষতা, তাদের ক্লীবত্ব, তাদের কাগুজে বাঘের চরিত্র, একটা টিকটিকির আওয়াজেও (কিংবা 'বাতাসে পাতা নড়ার আওয়াজেও') তারা ভীত-সন্ত্রস্ত, সংগ্রামী জনতার বলিষ্ঠ অগ্রগতির সামনে তাদের হাজার সেপাই-শাস্ত্রী-সুরক্ষিত দুর্গ আধুনিকতম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও তাই হার মানতে হয়। তাদেরকে শেষ পর্যন্ত লুকোতে হয় ইঁদুরের গর্তে।

সমাজ-সচেতন শিল্পীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি স্থূল বাস্তববাদী শিল্পীর মতো শুধু ঘটমান বাস্তবকে রূপায়িত কোরে থেমে যান না, তিনি আগামী ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শিল্প কর্মে, যা হয়নি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিলো, সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাই আজ পর্যন্ত ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের মূল ত্রুটি যেগুলো— অর্থাৎ সুদৃঢ় ও ব্যাপকতম গণ-ভিত্তির অভাব, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মেহনতী জনতার সুদৃঢ় ঐক্যের অভাব, এবং শত্রু ও মিত্র চিনবার ব্যাপারে ব্যর্থতা— সেদিকে পরোক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে তিরিশ হাজারের প্রতীকের মাধ্যমে মৃণাল সেন যা তুলে ধরেছেন, তা আসলে একটি বিপ্লবী পার্টিরই ইমেজ— যার প্রেরণা অদৃশ্যভাবে মেহনতী মানুষের রুজি-রোজকারের লড়াই-সহ প্রতিটি লড়াইয়ের পেছনে, প্রতিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পেছনে কাজ করে, কাজ করা উচিত। আমাদের দেশের অনেক বাঘা বাঘা বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকের মতো তিনি বিপ্লবের নানা কূটতর্কে নিজের বিপ্লবীয়ানা জাহির করেন নি, বরং ভারতের ও দুনিয়ার অতীত ও বর্তমানের বিপ্লবী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের শিল্পদৃষ্টির

মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের নিতান্ত সাধারণ মূল কিন্তু প্রায়শঃবিস্মৃত সত্যটির দিকেই আঙুল তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র এ কারণেই মৃণাল সেনের 'কোরাস' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৃণাল সেন চলচ্চিত্র তুলতে গিয়ে চলচ্চিত্রের ভাষাতেই কথা বলেছেন, এবং এ ভাষার ওপর তার অসামান্য দক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এ ছবিতে। তাই এ ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ, সঙ্গীত, আলোকচিত্র, অভিনয়, শব্দ সংযোজন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সাফল্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি নিজে এবং তার সমস্ত সহযোগীরাই। টুকরো টুকরো কাহিনী-ঘটনা-মুহূর্তের মালা গেঁথে একটা সামগ্রিক বক্তব্য তুলে ধরার আঙ্গিকের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মৃণাল সেনের 'কোরাস' প্রায় নিখুঁতই বলা চলে।

প্রায় নিখুঁত— কিন্তু সম্পূর্ণ নিখুঁত না— একারণেই যে, এ ছবি আবার নোতুন কোরে মৃণাল সেনকে একটি পুরোণো প্রশ্নের সামনাসামনি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। "শিল্প-সাহিত্য রচিত হবে কার জন্য"— এই মৌলিক প্রশ্নের বিচারে ধরা পড়েবে, 'কোরাস'-এর মূল চরিত্র যে সংগ্রামী জনতা, 'কোরাস'-এর মূল আবেদনেরও যারা লক্ষ্য, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে এ ছবি সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। আঙ্গিকের বিচারে এ ছবির ভাষা নিঃসন্দেহে উঁচুমানের, কিন্তু সে ভাষা যদি জনতার ব্যাপকতম অংশের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়, তবে কি এ ছবির মূল উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যাহত হয়ে যায় না? ছবিকে শিল্পগুণের বিচারে উচ্চমানসম্পন্ন করাটা নিঃসন্দেহে ভুল নয়, কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারও তো (সস্তা জনপ্রিয়তা অবশ্যই নয়) করতে হবে। প্রচণ্ড শীতে যখন দরকার মোটা কম্বল, তখন সূক্ষ্ম সূচিশিল্পসমন্বিত হাল্‌কা চাদরে কি প্রয়োজন মিটবে? শিল্প-মানকে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সমন্বিত যদি না করা যায়, তবে কি সেটা "কার জন্য?" এই মৌলিক প্রশ্নের বিচারে ব্যর্থতা নয়? যে সব দর্শক প্রচণ্ড আগ্রহে বিপুল সংখ্যায় "কলকাতা '৭১" দেখেছেন, "পদাতিক" দেখেছেন, অনেক বেশি পরিণত ও অনেক বেশি বলিষ্ঠ বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কেন 'কোরাস' তাঁদের টানতে পারছে না? এই সব দর্শকরা নিশ্চয়ই রাতারাতি মৃণাল সেন-বিদ্বেষী বা প্রতিবিপ্লবী হয়ে যান নি? কাজেই এ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই, একে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করতেই হবে। এবং সেটা করতে গেলেই ধরা পড়বে যে, খণ্ড খণ্ড অবিস্মরণীয় সব মুহূর্তগুলিকে একসুতোয় গেঁথে একটা চরম মুহূর্তে উত্তরণ ঘটাবার ব্যাপারে, সামগ্রিকভাবে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আমাদের চেতনার অন্তঃস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেবার ব্যাপারে, আমাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে গভীরতমভাবে দাগ কেটে যাবার ব্যাপারে, কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এবং সেকারণেই এ ছবির আবেদন যতোটা বুদ্ধির কাছে, মননের কাছে, ততোটা হৃদয়ের কাছে নয়। অথচ সেটা হওয়া দরকার, সেটাই হতে হবে— যদি মৃণাল সেন যাদের কথা ছবিতে বলেন, সেই ব্যাপক মেহনতী জনতার মনের মানুষ হতে চান। এবং 'ইন্টারভিউ' থেকে 'কোরাস' পর্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপগুলি মৃণাল সেন একের পর এক গ্রহণ করেছেন, সে কথা মনে রেখেই এ কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, জনতার মনের মানুষ হবার সেই অবশ্য পালনীয় ভূমিকা গ্রহণে মৃণাল সেন পরাঙ্মুখ হবেন।

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৫

পশ্চিমবাংলার জেলগুলিতে বন্দীদের অবস্থা

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং অ্যাম্‌নেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে প্রদত্ত ব্যক্তিগত বিবৃতির ভিত্তিতে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বক্তব্যের সারাংশ।

সংখ্যা

আমাদের হিসেব অনুসারে, চরমপন্থী বামপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপের অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বন্দীকে আটকে রাখা হয়েছে। গত বছর পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় জানিয়েছিলেন, ''নকশালপন্থী হিসেবে আটক বন্দীদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৭,৭৪৮'' (আনন্দবাজার পত্রিকা : মার্চ ১৭, ১৯৭৩)। এ বছর পয়লা জানুয়ারী ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার খবর অনুসারে, ২০০০ লোক ডিআইআর ও মিসাতে আটক ছিলেন। এই রিপোর্ট অনুসারে, এছাড়াও ১৭,৮০০ জনকে 'বিচারাধীন' বন্দী হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে, এবং এদের অধিকাংশই দু'বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে বন্দী রয়েছেন। কেউ কেউ প্রায় পাঁচ বছর ধরে এরকম বন্দী রয়েছেন। নিবর্তনমূলক আটক আইনের বন্দীরা মুক্তি পেয়ে গেলেও প্রায়শঃই তাদেরকে একই আইনের বিভিন্ন ধারায় বা নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে, যদিও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৭৩ সালের ১৯শে এপ্রিল মিসা-র ১৭এ ধারা অনুসারে আটক রাখার (আটক রাখার সময়কে ২১ মাস পর্যন্ত বর্ধিত কোরে) ক্ষমতাকে বেআইনী বলে রায় দিয়েছিলো এবং এ ধারা অনুসারে আটক ১৭৬০ জন বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়েছিলো, তবু এদের অধিকাংশকেই আটকে রাখা হয়েছে— হয় একই আইনের অন্য কোনো ধারা অনুসারে বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের অজুহাতে।

নিবর্তনমূলক আটক আইন ছাড়াও প্রায়শঃই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে বন্দীদেরকে আটক রাখা হয়, কিন্তু অনেক সময় বিচার হবার আগেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য ডাঃ গোলাম ইয়াজদানীকে ১৯৭১ সালে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বিচার না কোরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। যে সব বন্দীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, বিচারে তারা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলেও প্রায়ই নোতুন অভিযোগের ভিত্তিতে আবার তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেমন, আমাদের জানানো হয়েছে যে, নকশালপন্থী সন্দেহে বরুণ মুখার্জী, গৌর ব্যানার্জী এবং নাগকে ১৯৭০-৭১

সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। তারপর থেকেই তাদেরকে খুন ও বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা রাখার অভিযোগে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় বিচারক তাদের নির্দোষ বলে রায় দেন, কিন্তু বন্দীদেরকে কোর্টের মধ্যেই আবার গ্রেপ্তার কোরে ডাকাতির অভিযোগে পুলিশী হেফাজতে পাঠানো হয়। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ থেকে খালাস পেয়ে মুক্ত হলেও বিভিন্নভাবে বন্দীদের ওপর 'বিধি-নিষেধ' আরোপ করা হয়, যেমন, পুলিশের কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। আমাদের কাছে প্রদত্ত বিভিন্ন বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তাদের যাতায়াত ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপরও 'বিধি-নিষেধ' আরোপ করা হয়।

জেলের অবস্থা

অধিকাংশ জেলেই নিয়মের চেয়েও বেশি বন্দীকে আটক রাখা হয়ে থাকে। বর্তমানে কলকাতার আলিপুর স্পেশাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেল এবং বিহারের জামশেদপুর জেলে সরকারীভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়েও বেশি বন্দীকে আটক রাখা হয়েছে। ফলতঃ একান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধে থেকেও বন্দীদেরকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। অ্যাম্‌নেষ্টির কাছে প্রদত্ত প্রাক্তন বন্দীদের বক্তব্য থেকে দেখা গেছে অধিকাংশ জেলে বন্দীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে প্রকাশ, কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে ১৫০-২০০ জন বন্দীর জন্য মাত্র একটি জলের কল রয়েছে, এবং গ্রীষ্মের দিনে তাদের পক্ষে পানীয় জল পাওয়াটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। আলিপুর স্পেশাল জেলে ৭০০ জন বন্দীর জন্য রয়েছে মাত্র একটা জলের কল। অন্য কয়েকটি জেলে অন্যান্য বন্দীদের স্নানের ও জামা-কাপড় ধোবার পুকুর থেকে এইসব বন্দীদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। বিচারাধীন বন্দীদের ৮০-১০০ জনকে একসঙ্গে আলো-বাতাসহীন ঘরে আটকে রাখা হয়। বাথরুম-পায়খানায় যাবার কোনো সুযোগ ছাড়াই সন্ধ্যে ৬টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত তাদের তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়। সকালে মাত্র দু'ঘন্টার সময় তারা পায় খাওয়া-দাওয়া, স্নান ও পায়খানা করার জন্য।

অল্প যে ক'টি জেলে 'সিক' ওয়ার্ড আছে, প্রেসিডেন্সী জেল তার অন্যতম হলেও প্রায় কোনো বন্দীকেই সেখানে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় না। চিকিৎসার ব্যবস্থাই খুব দুষ্প্রাপ্য। চর্মরোগ, বিশেষতঃ চুলকুনির প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব বন্দীদের মধ্যে। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, জেলের ডাক্তারদের পরামর্শ সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বন্দীদেরকে বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয় নি। আমরা যে সব রিপোর্ট পেয়েছি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রমল রায়চৌধুরীর ঘটনা। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারপর তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং জেলের ডাক্তাররাও বাইরে চিকিৎসার পরামর্শ দেন। তা সত্ত্বেও সে সুযোগ মেলে নি। ১৯৭২ সালে এপ্রিল মাসে তাঁর 'বিশেষ মুক্তির' দিনই তিনি মারা যান। রিপোর্টে জানা গেছে, আরেকজন বন্দী আজিজুল হককে পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন করা হলে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ এবং শেষ পর্যন্ত

আংশিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা বাইরে চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও সে সুযোগ তিনি পান নি।

জেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

যে সব বন্দীকে বিপজ্জনক বা নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ মনে করা হয়, তাদেরকে লোহার বেড়ী ('ডাণ্ডাবেড়ী' বা 'শিকলবেড়ী') পরিয়ে রাখা হয়। অ্যামনেষ্টি এদের সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। প্রধানতঃ পশ্চিমবংগের জেলে এর প্রচলন থাকলেও, বিহারের জেলেও এ রকম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। হাজারীবাগ জেলে ৫১ জন নকশালপন্থী বলে অভিহিত বন্দীকে দুবছরেরও বেশি সময় ধরে এরকম শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাজারীবাগ জেলের জেলার বলেছেন, "বেশি ঝামেলা এড়াবার জন্য" দিনরাত বন্দীদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়। বন্দীদের দু'পায়ের গোড়ালিতে একটা কোরে লোহার বেড়ী পরানো হয়, সেগুলো ২০ ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার শিকে বাঁধা থাকে, এবং সেটা আবার কোমরে বাঁধা আরেকটা লোহার শিকের সংগে আটকানো থাকে। এরকম একজন বন্দী অসীম চ্যাটার্জী সম্প্রতি অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, দু'বছর ধরে তাকে এরকম শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। অ্যাম্‌নেষ্টির প্রাপ্ত রিপোট অনুসারে, দু'বছর ধরে তাঁকে একা একটা সেলে বন্দী কোরে রাখা হয়েছিলো। এরকম আরেকজন বন্দী শিবল রায় বন্দী অবস্থায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে আবার ডাণ্ডা-বেড়ী দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। হাজারীবাগ জেলে এরকমভাবে ২৪ ঘন্টা ৪-৫ জনকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়ে থাকে। ডাণ্ডা-বেড়ী পরিয়ে রাখার রিপোর্ট অন্যান্য জেল থেকেও পাওয়া গেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দীদেরকে তিন থেকে ছ'মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় এরকম ডাণ্ডা-বেড়ী দিয়ে আটকে রাখা হয়। এ সব কার্যকলাপ, বন্দীদের প্রতি (এমন কি সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদেরও) আচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ প্রণীত সাধারণ ন্যূনতম নিয়মনীতির বিরোধী।

নির্যাতনের অভিযোগ

গত তিনবছর ধরে কলকাতার আইনবিদদের কাছ থেকে আমরা বন্দীদের ওপর নির্যাতনের প্রচুর অভিযোগ পেয়েছি। এই সব রিপোর্ট অনুসারে, পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্পেশাল পুলিশ অফিসে (১৪, লর্ড সিন্‌হা রোড, কলিকাতা) ও কলকাতার লালবাজার পুলিশ ষ্টেশনে প্রায়শঃই নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আছে : প্রচণ্ড মারধর— এমন কি হাত-পা ভাঙা পর্যন্ত, বন্দীদের মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা, নখে এবং শরীরের অন্যান্য অনুভূতিশীল অংগে (যৌনাঙ্গ-সহ) পিন ফুটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক দেবার আধুনিক নির্যাতন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবার এবং গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন লাগাবার রিপোর্টও মিলেছে। এরকম নির্যাতনের ফলে আংশিক পঙ্গু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি

(যেমন প্রেসিডেন্সী জেলের আজিজুল হক ও মেঘরঞ্জন সেনগুপ্তের ক্ষেত্রে)। (পূর্বে উল্লেখিত) রমল রায়চৌধুরী, যিনি মুক্তির পরে মারা যান, পুলিশী নির্যাতনের পর যথোপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ না পাবার ফলেই মারা যান।

সম্প্রতি মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে নিখিলবঙ্গ মহিলা সমিতির রিপোর্টে। এবছর মে মাসে এই সমিতির সদস্যরা ২৫ জন নকশালপন্থী বলে অভিযুক্ত মহিলা বন্দীর সঙ্গে (যারা বর্তমানে প্রেসিডেন্সী জেলে রয়েছেন) এক সঙ্গে আটক ছিলেন। এই সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন যে, ওই ২৫ জন বন্দীকে তাদের গ্রেপ্তারের এক মাস পর লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের কাছ থেকে ঈপ্সিত খবর না পাওয়া যাওয়ায় তাদের উলঙ্গ কোরে সারা দেহে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয় এবং কারও কারও যৌনাঙ্গে ও পশ্চাদ্দেশে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একটু সেরে ওঠার পর ২০/২২ দিন অন্তর তাদেরকে আবার লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই সব অভিযোগের অধিকাংশ সম্পর্কে অ্যামনেষ্টি অনুসন্ধান চালাতে না পারলেও অনেক প্রাক্তন বন্দীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং তাঁরা বলেছেন যে, তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে জনৈক প্রাক্তন বন্দীর সঙ্গে কথা বলে অ্যামনেষ্টির প্রতিনিধি এই তথ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, পুলিশী নির্যাতনে সময় অত্যাচারের ফলেই তাঁর ডান হাতটি পঙ্গু হয়ে গেছে। এই বন্দীটি একজন আইনজীবী, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী থেকে তিনটি অভিযোগে তাঁকে আটকে রাখা হয়, এবং সমস্ত অভিযোগ থেকে তিনি খালাস হবার পর ১৯৭৩ সালের জুন মাসে তাঁকে এই সর্তে মুক্তি দেওয়া হয় যে, তিনি নিয়মিত পুলিশের কাছে হাজিরা দেবেন এবং কোনো রকম রাজনীতি করবেন না।

জেলের ঘটনা

ষ্টেটসম্যান, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ও যুগান্তর পত্রিকার খবর অনুসারে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে শুধুমাত্র পশ্চিমবংগ বিহারেই ৮৮ জন বন্দী জেলের বিভিন্ন ঘটনায় মারা গেছেন। প্রাক্তন বন্দীদের সূত্রে প্রাপ্ত বেসরকারী হিসেব অনুসারে, জেল-ওয়ার্ডার ও পুলিশের সঙ্গে বন্দীদের সংঘর্ষে নিহত বন্দীদের প্রকৃত সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যার অন্ততঃ তিন গুণ বেশি। এসব ঘটনার মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো— যেমন করা হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ২৬শে জুলাই হাজারীবাগ জেলের ঘটনার, যাতে ১৬ জন নিহত হয়েছিলেন। আমাদের জ্ঞাতসারে এসব ঘটনার কোনো সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। তবে ১৯৭১ সালের ৪ঠা আগষ্ট ষ্টেটসম্যান ও টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা খবর দিয়েছিলো যে, "ছোটোনাগপুর ডিভিশনের কমিশনার ও হাজারীবাগের ডেপুটি কমিশনারের প্রাথমিক তদন্ত থেকে দেখা গেছে, বাকী ১২ জন বন্দী জেল-অফিসারদের দ্বারা সংঘটিত আঘাতের ফলেই মারা

গেছেন।" ১৯৭১ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখের আসানসোল জেলের ঘটনা সম্পর্কে ষ্টেটসম্যান লিখেছিলো, "বৃহস্পতিবারের আসানসোল জেলের ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে যে, নিহত ৭ জন বন্দীকেই পিটিয়ে মারা হয়েছে।"

এসব রিপোর্ট "জেল থেকে পালিয়ে যাবার সময় বন্দীদেরকে গুলি করা হয়েছে"— জাতীয় সাধারণ সরকারী ব্যাখ্যার সত্যতা সম্পর্কেই প্রচণ্ড প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।

আইনগত সাহায্য ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ২২(ক) ধারা প্রত্যেক নাগরিককে তাকে গ্রেপ্তারের সম্ভাব্য কারণ জানবার এবং আইনজীবীর সাহায্য নেবার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু কলকাতার রাজনৈতিক বন্দীদেরকে সাহায্য করার জন্য গঠিত 'লিগাল এইড কমিটি' অভিযোগ করেছেন যে, তাদের সদস্য আইনজীবীদের পর্যন্ত তাদের মক্কেলদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বন্দীরা এই কমিটিকে যেসব চিঠিপত্র দেন, তার অধিকাংশই তাদের হাতে পৌঁছোয় না। বন্দীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, কোর্টে তাদেরকে নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত তারা তাদের উকীলদের সঙ্গে দেখা করবারই সুযোগ পান না। হাইকোর্টে এই কমিটির কাজ বেশ সন্তোষজনক। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে এই কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবংগে কমিটি ২০০টি জামিনের আবেদন করেছিলো— তার মধ্যে ১৩৫টি বিচারাধীন বন্দীদের ও ৫২টি মিসার মোকদ্দমা। ৬ জন বিচারাধীন ও ৪৬ জন মিসায় বন্দী জামিন পেয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মাত্র ৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।" পশ্চিমবংগের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মতো তাদেরকেও কোর্টের রায় অনুসারে মুক্তি দেবার সংগে সংগেই বিভিন্ন অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অ্যাম্‌নেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের অনুরোধ

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৭৩ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু অনুরোধ পাঠিয়েছিলো। তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। অ্যাম্‌নেষ্টি অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে,

ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ভারত সরকার শুধু তাদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করুন।

ফৌজদারী অভিযোগে যাদের বন্দী করা হয়েছে, বিনা বিলম্বে তাদের বিচার শুরু করা হোক এবং অন্যথায় যেসব বন্দীকে তিন মাসের বেশি বিনা বিচারে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে, তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক।

অ্যাম্‌নেষ্টি মনে করে যে, এরকমভাবে বিচারের নীতি গ্রহণ করলে বিনা বিচারে আটক বিপুল সংখ্যক বন্দী মুক্তি পাবেন এবং তার ফলে জেলে নিয়মের চেয়েও বেশি বন্দীকে আটক রাখার সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে।

বন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ ন্যূনতম নিয়মনীতির ভিত্তিতে অ্যামনেস্টি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রস্তাব দিচ্ছে এবং সেগুলির দ্রুত বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে :

বিচারাধীন বন্দীকে নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং সেই অনুসারে ব্যবহার করা উচিত।[১]

জেলে ডাণ্ডাবেড়ী জাতীয় কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না।[২]

বন্দীদের উপযুক্ত থাকবার জায়গা, স্বাস্থ্য ও খাবারের এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।[৩]

বিচারাধীন বন্দীদের পারিবারিক সাক্ষাৎকার, পাঠ্যবিষয় ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করা উচিত।[৪]

বন্দীদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠলেই সরকারের সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত, ভবিষ্যতে অত্যাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং অত্যাচারের ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

জেলের বিভিন্ন ঘটনায় এবং তাতে বন্দীদের মৃত্যু ঘটায় অ্যাম্‌নেস্টি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে, এবং এসব ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে সরকারীভাবে তদন্ত করবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরণের ঘটনা না ঘটে তা দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

সবশেষে, বন্দীদেরকে আইনগত সাহায্য গ্রহণের ও তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়া হোক, এবং পুলিশের চোখের সামনে হলেও শ্রবণ-সীমার বাইরে এসব সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হোক।[৫]

১। জেলের বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নির্দেশিত সাধারণ ন্যূনতম নিয়ম-বিধির (SMR) ৮২(২) নং ধারা অনুসারে, "সাজা হয় নি এমন সমস্ত বন্দীকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।"

২। SMR-এর ৩৩নং ধারা অনুসারে, "শাস্তি হিসেবে হাতকড়ি, চেন, লোহার বর্ম প্রভৃতি আটকে রাখার যন্ত্র কখনও ব্যবহার করা চলবে না।"

৩। SMR-এর ১০ নং ধারা অনুসারে, "বন্দীদের থাকার, বিশেষতঃ শোবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে, আবহাওয়াগত পরিস্থিতির প্রতি, বিশেষতঃ ন্যূনতম হাওয়া বাতাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, আলো, উত্তাপ ও বায়ু সঞ্চালনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

১১নং ধারা অনুসারে, "জেলের জানালাগুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে বন্দীরা বাইরের আলোয় পড়াশুনা বা অন্যান্য কাজ করতে পারে এবং ঘরে মুক্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। দৃষ্টিশক্তির হানি না ঘটিয়ে পড়াশুনা বা কাজ করার মতো কৃত্রিম আলোরও ব্যবস্থা করতে হবে।"

১২ নং ধারা অনুসারে, "পায়খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে প্রতিটি বন্দী প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুসারে যখন দরকার তখনই এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।"

২০ নং ধারা অনুসারে, "প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক বন্দীকে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষার্থে ভালো

মানের খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। যখন দরকার তখনই পানীয় জল যাতে তারা পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

১২ নং ধারা অনুসারে, প্রত্যেক জেলে মানসিক রোগের জ্ঞান-সহ একজন চিকিৎসক রাখতে হবে এবং তাকে বন্দীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে জেলের ভেতরে বা বাইরে অসুস্থ বন্দীদের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯০ নং ধারা অনুসারে, বিচার হয়নি এমন বন্দী নিজের বা অন্যের খরচে বই, পত্র-পত্রিকা, লিখবার সরঞ্জাম প্রভৃতি পাবার অধিকারী থাকবে।

৪। ৯২ নং ধারা অনুসারে বিচার হয় নি এমন বন্দী গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারকে গ্রেপ্তারের সংবাদ জানাতে এবং পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। ৯৩ নং ধারা অনুসারে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো বন্দী আইনগত সাহায্য নিতে এবং এই উদ্দেশ্যে তার আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বা গোপনে পরামর্শ করতে (সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে কিন্তু শ্রবণ-সীমার বাইরে) পারবে।

● অ্যাম্‌নেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের উপরোক্ত রিপোর্ট ও অনুরোধ ১৯৭৩ জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রিপোর্ট আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবার পর ভারত সরকার, পশ্চিমবংগ সরকার এবং তাদের সরকারী ও বেসরকারী মুখপত্রগুলিসহ বৃহৎ পত্র-পত্রিকাগুলিও এই রিপোর্টকে তারস্বরে মিথ্যে ও অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছে।

অথচ মজার কথা, সরকারী বক্তব্য যেটুকু পাওয়া গেছে এবং এইসব পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি কোরেই অ্যাম্‌নেষ্টির রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। উদাহারণস্বরূপ, পশ্চিমবংগ বিধানসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবংগে ১৭,৭৮৭ জন 'নকশালপন্থী' বন্দী আছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ১৭ই মার্চ সে খবর ছেপেছে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী ২০০০ মিসা-বন্দী ও ১৭,৮০০ বিচারাধীন বন্দীর কথা বলেছে এবং পরবর্তীকালে আরও ১৩০০ নকশালপন্থী গ্রেপ্তার হবার খবর দিয়েছে। অথচ অ্যাম্‌নেষ্টি যখন ঠিক এই সংখ্যাগুলিকেই উদ্ধৃত করেছে, তখন তারা একে 'অতিরঞ্জিত' বলে অভিহিত করেছে। জেলে বন্দীদের দুরবস্থা, জেলে বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় বন্দীদের ওপর নির্যাতন জেলে বন্দীদের পিটিয়ে মারা ইত্যাদি খবর এসব কাগজেই বিভিন্ন সময়ে খুব সীমিতভাবে হলেও, প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাম্‌নেষ্টি তার রিপোর্টে এসব প্রকাশিত খবর এবং বিভিন্ন দায়িত্বশীল বিবৃতিকেই ভিত্তি করেছে। অথচ আজ এসব কথা নাকি 'মিথ্যে' হয়ে গেলো। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত।

সবচেয়ে হাস্যকর বিবৃতি দিয়েছে পশ্চিমবংগ সরকার— "পশ্চিমবংগে কোনো রাজনৈতিক বন্দী নেই।" যুক্তিটা এরকম— 'নকশালপন্থী'-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দী যেহেতু 'উগ্রপন্থী' বা 'সমাজবিরোধী' (সরকারী ভাষায়), অতএব তারা রাজনৈতিক বন্দী নয়। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

আমরা মনে করি, অ্যাম্‌নেষ্টির রিপোর্ট মূলতঃ সঠিক, তাদের অনুরোধগুলিও যুক্তিসঙ্গত। জনগণ-বিরোধী সরকার এসব অবশ্যই মেনে নিতে চাইবে না, কিন্তু পশ্চিমবংগের তথা ভারতের ব্যাপক মেহনতী জনগণ কি তাদের গর্বোদ্ধত মাথা নুইয়ে দেবার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলবেন না?

অনীক, জানুয়ারি ১৯৭৫

সবাই হাত লাগালে

দীপক চট্টোপাধ্যায়

সবাই হাত লাগালে পাথরটা যাবে সরে,
এ বন সে বন কোরে অনেক পথ ঘুরে
ঝুর্‌ঝুর্‌ ঝরণার মিঠে পানি
মায়ের আঁচল ভিজিয়ে দেবে খুশীতে।

সবাই হাত লাগালে পাথুরে জমিতে
ফলবে সোনালী ফসল,
বুক-উঁচু ধানের শীষে মায়ের হাসি
বাতাসে শব্দ তুলে বাজাবে মাদল।

সবাই হাত লাগালে অঞ্জলিভরে ঝরণার মিঠে পানি পাবে।
সবাই হাত লাগালে আঁচল ভরে সোনালী ফসল পাবে।
সবাই হাত রাখলে বন্দুকের ট্রিগারে
ভবিষ্যৎ হেঁটে যাবে বুকের গভীরে,
পাহাড়, ঝরণা, ফসলের ক্ষেত, মানুষের ঘর
একদিন সোনালী প্রাতে থেকে যাবে সব মানুষেরই হাতে।

বুলেটের মুখর শব্দে শুরু হবে, দেয়ালীর উৎসব
বসন্ত ব্যাকুল চোখে পাঠ করে বিদ্রোহের স্তব
তখন, গভীর অরণ্যে গিয়ে নির্ভয়ে তুলে নিও ফুল
আকাশের পায়ের কাছে রেখে দিও পলাশ শিমূল।

জননী ও শিশুদের মতো আপন সৌন্দর্যে দুলেছে পাতায় পাতায় দোপাটির দুল
তখনও বন্দুকের ট্রিগারে রয়ে যাবে আমাদের সবার আঙুল।।

সোভিয়েত অর্থনীতির 'দ্রুত ও সুসংবদ্ধ বিকাশ'-এর মূল স্বরূপ

তরুণ রায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকবর্গ এবং ভারত সহ দেশ বিদেশে তাদের চেলা-চামুণ্ডারা প্রায়ই ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে যে, সোভিয়েত অর্থনীতি নাকি "খুব দ্রুত ও সুসংবদ্ধ বিকাশের পথে" এগিয়ে চলেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে "নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রায় উৎপাদন বা এমনকি তার চেয়েও বেশি উৎপাদন" নাকি নিতান্তই একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ কোরে দেয় যে, রুশ নয়া জারদের এই বহু ঢক্কা-নিনাদিত প্রচার নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বাজে কথা মাত্র।

"দ্রুত ও সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক বিকাশ"

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সোভিয়েত দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে ১৯২৮ সাল থেকে, মহান স্তালিনের নেতৃত্বে তখন এর সূচনা হয়েছিলো। আজ পর্যন্ত আটটি পরিকল্পনা সেদেশে রূপায়িত হয়েছে, এবং নবমটি বর্তমানে চলছে। পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৫৫) পর্যন্ত সোভিয়েতের মোট শিল্প উৎপাদন মূল্যের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিলো ১৩%। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনার শুরু থেকেই, অর্থাৎ সেদেশে সংশোধনবাদী চক্র ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই, এই বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে শুরু করেছে। নীচের তথ্য থেকেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে।

টেব্‌ল ঃ ১

বছর	মোট শিল্প-উৎপাদন মূল্যের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি
১৯২৮-৫৫	১৩%
১৯৫৬-৫৮	১০.৩%
১৯৫৯-৬৫	৯.১%
১৯৬৬-৭০	৮.৫%
১৯৭১	৭.৮%
১৯৭২	৬.৫%

সংশোধনবাদী চক্র ক্ষমতা দখল করার পর থেকে মোট কৃষি-উৎপাদন মূল্যের বৃদ্ধির হারও ক্রমশঃই কমে আসছে। নীচের তথ্য থেকেই তা ধরা পড়বে।

টেব্‌ল ঃ ২

বছর	মোট কৃষি-উৎপাদন মূল্যের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি
১৯৫৬-৬০	৬%
১৯৬১-৬৫	২.৬%
১৯৬৭-৭০	৩.৭%
১৯৭১	–২.৯%
১৯৭২	–৭.২%

সূত্র : Soviet Central Statistical Board.

রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ সংস্থা FAO-র হিসেব অনুসারে, ১৯৭২ সালে সোভিয়েতের মোট গম-উৎপাদন ১৩% হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে কৃষি-উৎপাদনে যে প্রচণ্ড সংকট উপস্থিত হয়েছে, তার ফলে সোভিয়েত শাসকচক্রকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৫৪ বছর পরেও, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার ৪০ বছর পরেও, বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে, ১৯৭২ সালে সোভিয়েত শাসকচক্রকে ২.৫ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এই পরিমাণ ৪ কোটি মেট্রিক টনে পৌছে গেছে।

এই হচ্ছে সোভিয়েত শাসকচক্রের বহু ঢক্কা-নিনাদিত "দ্রুত ও সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক বিকাশের" প্রকৃত চেহারা।

"নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় বা তার চেয়েও বেশি উৎপাদন"

"নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় বা তার চেয়েও বেশি উৎপাদন" সম্পর্কেও তাদের প্রচার একটা নির্লজ্জ ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটকে আড়াল করার জন্য সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা বেশি বেশি কোরে হিসেবের কারচুপির আশ্রয় নিয়ে চলেছে। তাদের একটা সাধারণ পন্থা হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রাকে শুধরে নেবার নাম কোরে কমিয়ে দেওয়া। এবং এইভাবে কমিয়ে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো বা তাকে অতিক্রম কোরে যাওয়াটা স্বভাবতঃই সহজ ব্যাপার। সোভিয়েত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান পরিষদ ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, তাদের বিগত অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৬৬-৭০) বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মূল লক্ষ্যমাত্রায় বা কমিয়ে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রাতেও পৌছোনো সম্ভব হয় নি। এ সময়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা, কমিয়ে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত উৎপাদনের তুলনামূলক ছবিটা নীচের সারণী থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দ্রব্য (ইউনিট)	মূল লক্ষ্যমাত্রা	কমিয়ে-দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
বিদ্যুৎ (শত কোটি কিলোওয়াট)	৮৫০	৮০৭	৭৪০
প্রাকৃতিক গ্যাস (শত কোটি ঘন মিটার)	২৪০	২১৫	২০০
কয়লা (লক্ষ টন)	৬৭৫০	—	৬২৪০
ইস্পাত (লক্ষ টন)	১২৯০	১২৪০	১১৬০
রোল্ড্ ইস্পাত (লক্ষ টন)	৯৯০	৯৬০	৯২০
রাসায়নিক সার (লক্ষ টন)	৬৫০	৬২০	৫৫৪
কৃত্রিম তন্তু (হাজার টন)	৮৩০	৭০৭	৬২৩
কৃষি-যন্ত্রপাতি (কোটি রুবল)	২৫০	—	২১০
সিমেন্ট (লক্ষ টন)	১০৫০	—	৯৫২
কাগজ (লক্ষ টন)	৫৩	৫০	৪২
সূতি বস্ত্র (কোটি বর্গমিটার)	৯৮০	—	৮৬০
কৃত্রিম রেসিন ও প্লাষ্টিক (লক্ষ টন)	২৩	১৮	১৭

অষ্টম পরিকল্পনার এই সর্বাত্মক ব্যর্থতার পর নবম পরিকল্পনাকালে সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা আরো স্থূল কায়দায় তাদের উৎপাদনের মূল লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। নীচের টেব্‌লে তার পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ

বছর	মোট শিল্প-উৎপাদন মূল্যের শতকরা গড় বৃদ্ধি	ক বিভাগে * শতকরা গড় বৃদ্ধি	খ বিভাগে ** শতকরা গড় বৃদ্ধি
	লক্ষ্যমাত্রা / প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা / প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা / প্রকৃত
১৯৭১	৮ / ৭.৮	৭.৯ / ৭.৭	৮.৩ / ৭.৯
১৯৭২	৮ / ৬.৫	৭.৯ / ৬.৮	৮.৩ / ৬
১৯৭৩	৮ / ৭.৪	৭.৯ / ৮.২	৮.৩ / ৫.৯

* ক বিভাগ— উৎপাদনের উপকরণ তৈরীর শিল্পসমূহ (প্রতিরক্ষা উৎপাদন সহ)

** খ বিভাগ— ভোগ্যদ্রব্য তৈরীর শিল্পসমূহ

১৯৭৩ সালের প্রথমে সংশোধনবাদীরা যখন দেখলো যে, কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃত বৃদ্ধির হার তাদের লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছোতে পারেনি, তখন তারা মুখ বাঁচাবার জন্য চটপট মোট শিল্প-উৎপাদন, ক বিভাগ ও খ বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৮% থেকে ৫.৮%-এ, ৭.৯% থেকে ৬.৩%-এ এবং ৮.৩% থেকে ৪.৫%-এ নামিয়ে আনলো, এবং ফলতঃ হিসেবের এই কারচুপিতে তাদের প্রচারিত হিসেবটা দাঁড়ালো এরকম ঃ

১৯৭৩ ৫.৮ / ৭.৪ ৬.৩ / ৮.২ ৪.৫ / ৫.৯

—এবং মহা আনন্দে তারা তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো ঃ "আমরা উৎপাদনের সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম কোরে ফেলেছি।" নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

কিন্তু না, এখানেই তাদের 'কৃতিত্ব' শেষ হলো না। তাদের নির্ধারিত মূল লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নবম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট শিল্প-উৎপাদনের মূল্য ৪০% বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিলো— যা সোভিয়েত অর্থনীতির ইতিহাসে সর্ব নিম্ন লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু প্রথম তিন বছরে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ২৩%, অতএব বাকী দু'বছরে অন্ততঃ ৮.৫% হারে বৃদ্ধি হওয়া দরকার— মূল লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে গেলে। কিন্তু সোভিয়েত শাসকচক্র বোকা নয়, তারা ভালোই বোঝে যে মূল লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম সোভিয়েতের এক সভায় তারা পাঁচ বছরের মোট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০% থেকে (অর্থাৎ বার্ষিক ৮% থেকে) কমিয়ে ৩৪%-এ (অর্থাৎ বার্ষিক ৬.৮%-এ) নামিয়ে এনেছে। কাজেই তাদের নবম পরিকল্পনা যে সব "লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম কোরে" "বিরাট সাফল্য" অর্জন করবে— এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও তার থাকছে না!

সোভিয়েতের রুগ্ন অর্থনীতি

সোভিয়েত সংশোধনবাদের প্রবক্তারা প্রায়শঃই প্রচুর পরিমাণ দম্ভোক্তি ও মিথ্যের বান ছোটালেও, মাঝে মাঝেই তারা নিজেদের অজান্তেই কিছু দুঃসংবাদও প্রকাশ করে ফেলে। সোভিয়েত "নিউ টাইমস্" পত্রিকার ১৯৭৩ সালের ৩১ নং সংখ্যায় জনৈক প্রাবন্ধিক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, সোভিয়েত অর্থনীতিতে প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। যেমন, অনেক উৎপাদন সংস্থাই উৎপন্নের বিক্রি এবং উৎপাদনী শক্তি ও সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছে না। তাছাড়া উৎপন্ন দ্রব্যের মানও সব সময় খুব উঁচু নয়। উপরন্তু নূতন উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারেও প্রায়শঃই বিলম্ব ঘটছে। সোভিয়েত প্রকাশনেরই এই স্বীকৃতি সোভিয়েত অর্থনীতির "দ্রুত ও সুসংবদ্ধ বিকাশের" স্বরূপই শুধু উদ্‌ঘাটিত কোরে দিচ্ছে না, উপরন্তু সোভিয়েত অর্থনীতির অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতির কিছু কারণের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েত অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনোর ব্যাপারে পরিমাণের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানের ওপর নয়। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে এনামেলের ডিস প্রস্তুতকারকরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর ব্যাপারে একটি সর্ট-কাট আবিষ্কার কোরে ফেলেছে। উৎপাদনের পরিমান যেহেতু ওজনের অংশে পরিমাপ করা হয়, অতএব তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে খুব ভারী ভারী পাত্র তৈরী করতে। তার ফলে যদিও পাঁচ বছরে এই সব পাত্রের উৎপাদন বেড়েছে ১৮ হাজার টন, কিন্তু সংখ্যার বিচারে সেগুলো কমে গেছে ১৭ লক্ষ।

আরও যেটা খারাপ সেটা হচ্ছে এই যে, উঁচু লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উন্মত্ত তাড়নায় বহু কারখানা জনগণের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী না কোরে কোটি কোটি রুবল মূল্যের অপ্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করছে। উদাহারণ স্বরূপ, সোভিয়েত উৎপাদকরা মেয়েদের কমদামী কোট তৈরী করতে অস্বীকার কোরে বেশী দামী কোট তৈরীর ওপর

জোর দিচ্ছে। তারা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ কমিয়ে দিয়ে প্রমোদ-পুস্তক প্রকাশের ওপর জোর দিচ্ছে। কাপড় ধোয়ার যন্ত্র উৎপাদন এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দীর্ঘদিন ধরেই সোভিয়েত কারখানাগুলো ২০ বছর আগেকার ডিজাইন অনুসারে যে সব পুরোণো ধরনের কাপড় ধোয়ার যন্ত্র তৈরী কোরে আসছে, সেগুলির নিম্ন মান ও অকার্যকারিতার জন্য কোনো ক্রেতাই সেগুলি কিনতে চান না। ফলে প্রতি বছর কারখানার সদ্য প্রস্তুত প্রায় ১৫ লক্ষ কোরে কাপড় ধোয়ার যন্ত্র অকেজো হয়ে পড়ে থাকছে। প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ১৯৭০ সালে গুদাম-জাত এই সব যন্ত্রের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিলো ১৯৬৭ সালের সংখ্যার তুলনায় ৪ গুণ, এবং ১৯৭১ সালে ১৯৭০ সালের দ্বিগুণ। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে গুদাম জাত এই সব অকেজো যন্ত্রের মোট মূল্য প্রায় তিনশত আশি কোটি রুবল বলে হিসাব করা হয়েছিলো।

কৃষির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অনেকেরই মনে আছে যে, ১৯৭২ সালে কৃষি কাজের জরুরী প্রয়োজনে সেদেশে যখন বিপুল পরিমাণ হার্ভেস্টার ট্রাক ও ড্রায়ার যন্ত্র দরকার হয়ে পড়েছিলো, তখন যন্ত্রাংশের অভাবে অধিকাংশ যন্ত্রই অকেজো হয়ে পড়েছিলো। কারণটা আর কিছু নয়, সোভিয়েত কারখানাগুলো 'আবিষ্কার' করেছিলো যে, যন্ত্রাংশ তৈরী করার চেয়ে যন্ত্র তৈরী করাটাই বেশী মুনাফাজনক। ১৯৭৩ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিলো। প্রথমদিকে সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্র বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছিলো যে, সে বছর নাকি এক "অভূতপূর্ব বিরাট ফসল" উৎপন্ন হয়েছে এবং তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.২৫ কোটি টন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই সংশোধনবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ব্রেজনেভ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো যে, পরিবহন ও সংরক্ষনের উপযোগী যন্ত্রপাতির অভাবে বিপুল পরিমাণ শস্য মাঠেই নষ্ট হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে এই ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানানো হয়নি। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে, ব্যবহারযোগ্য শস্যের পরিমাণ ছিলো মাত্র ১৬.৫ কোটি টন।

পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপজ্জনক ফলশ্রুতি

সোভিয়েত অর্থনীতির অ-নিরাময় ব্যাধিকে যখন আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, তখন সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা কখনও প্রাকৃতিক অবস্থার দোহাই দিচ্ছে, কখনও বা একে অন্যের ওপর দোষারোপ করছে। কিন্তু অসংখ্য তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এই ব্যাধিগ্রস্ত সোভিয়েত অর্থনীতির মূল কারণ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাইরে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ।

ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, যে বছর সোভিয়েত অর্থনীতির অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়তে শুরু করে, সেই ১৯৫৬ সালটাই ছিলো ক্রুশ্চভচক্র কর্তৃক সংশোধনবাদের ক্লেদাক্ত পথে সর্বাত্মকভাবে পা বাড়ানোর বছর। তারপর ১৯৬৪ সালে ব্রেজনেভচক্র কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর পুঁজিবাদের সর্বাত্মক

পুনঃপ্রতিষ্ঠা পূর্ণাঙ্গতর রূপ পেয়েছে এবং সোভিয়েতের অর্থনীতির অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হয়ে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদন সম্পর্ক আজ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর কার্যতঃ নিয়ন্ত্রণ করছে বিশেষ সুবিধেভোগী বুর্জোয়ারা। শ্রমিকরা উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পরিণত হয়েছে মজুরী-দাসে; এবং ফলতঃ তাদের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেয়েছে। সোভিয়েতের সরকারী পরিসংখ্যানেই ধরা পড়ছে যে, বছর বছর শিল্পে বিনিয়োগের পরিমান বাড়ানো সত্বেও শ্রম উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে : ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত গড়ে তা ছিলো ৬.৫%; ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৮%।

সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে ব্যাপক দুর্নীতি আজ সোভিয়েত অর্থনীতিতে বাসা বেঁধেছে। হিসেবের কারচুপি বা অন্যান্য বিচিত্র উপায়ে "লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনোর" নানারকম ফন্দি ছাড়াও, উৎপাদন সংস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার কোরে দুর্নীতি ও জোচ্চুরির সাহায্যে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ, আর্মেনিয়ায় একটি ক্রীড়া-সরঞ্জাম তৈরীর কারখানার পরিচালক শ্রমিকদের ভূয়া তালিকা তৈরী কোরে তাদের 'মজুরী' বাবদ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা পকেটস্থ করেছে। জর্জিয়ায় এক কারখানার মালিক শ্রমিকদেরকে ছুটির দিনেও কাজ করিয়ে অতিরিক্ত উৎপন্ন নিজে আত্মসাৎ করেছে। আজেরবাইজানের একটি প্ল্যাস্টিক কারখানার পরিচালক কালোবাজারে কারখানার উৎপন্ন বিক্রি কোরে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা নিজের পকেটে পুরেছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা আজ সোভিয়েতে অহরহ দেখা যাচ্ছে। এবং এভাবে বিপুল পরিমানে সামাজিক সম্পদ অপচয়িত হচ্ছে বা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রুশ নয়া জারদের অনুসৃত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মনীতির ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করছে যে, উৎপাদনের নোতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও কার্যকরী করার চেয়ে দীর্ঘদিনের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করাই বেশি নিরাপদ ও মুনাফাজনক বলে মনে করা হচ্ছে; এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির নোতুন বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সোভিয়েত অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সংকটের আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, দেশে দেশে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে রুশ নয়া জাররা অস্ত্র উৎপাদনের বিপুল সম্প্রসারণ ও বিপুল যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, এবং তার ফলে উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, শ্রম-উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, শিল্পে ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমে আসছে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নিজেদেরই স্বীকৃতি অনুসারে, বিগত অষ্টম পরিকল্পনাকালে শিল্পের ক বিভাগের (প্রতিরক্ষা উৎপাদন সহ উৎপাদন উপকরণ তৈরীর শিল্পের) মোট উৎপাদন

মূল্য ছিলো সমগ্র শিল্প-উৎপাদন মূল্যের ৭৪%—১৯৪০ সালে যা ছিলো অনেক কম, ৬১.২%। একই সময়ে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের মাত্র ৭৬% এবং ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে মাত্র ৭০% রূপায়িত হয়েছে। সংশোধনবাদীদের ২৪ তম কংগ্রেসে কোসিগিন নিজেই স্বীকার করেছে যে, অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদনের বিশেষ প্রয়োজনে অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রচুর অর্থ ও বিষয় সরিয়ে আনতে হয়েছে। এসব কিছুই সোভিয়েত অর্থনীতির প্রচণ্ড ভারসাম্যহীনতাকে প্রকট এবং ফলতঃ অর্থনৈতিক সংকটকে ত্বরান্বিত কোরে তুলেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা সারা দুনিয়ায় তাদের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী নীতির প্রসার ঘটাচ্ছে এবং দুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার নিজের দেশের অর্থনীতিই আজ সংকটে পড়েছে, দিন দিন তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। সেকারণেই একদিকে তারা যেমন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রচণ্ড লুণ্ঠন চালাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে নিজেদের জাতীয় সম্পদ বিকিয়ে দিচ্ছে, ভিক্ষের ঝুলি পাতছে। এসব থেকে একটি সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে যে, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের এই অর্থনৈতিক সংকট একেবারেই অ-নিরাময়, এ থেকে তাদের আর পরিত্রাণ নেই।*

অনীক, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

* এই প্রবন্ধটির জন্য আফ্রো-এশীয় সাংবাদিক সংঘের মুখপত্র "The Afro-Asian Journalist" পত্রিকার ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ওয়েন গুনের একটি রচনা থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রধান মন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি

মহাশয়া, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিপীড়িত জনগণের মুক্তির জন্য যাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই দু'জন রাজনৈতিক বন্দী কমরেড কিস্তাগৌড় এবং কমরেড ভুমাইয়াকে আপনার ফ্যাসিষ্ট সরকার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। আমাদের প্রাণের প্রিয় এই দুই মহান কমরেডকে আপনার জালিম সরকার অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছে। আমরা আপনার সরকারের এই জঘন্যতম বর্বরতম পৈশাচিক আদেশের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আপনার জল্লাদ সরকারের এই হিংস্রতম আদেশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ করছি। আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আপনার সরকার ভারতবর্ষের বীর সন্তানদের এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভারতীয় জনগণের মুক্তির স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিতে পারবে না। আমাদের সংকল্পে অটল বীর সৈনিকদের প্রতিজ্ঞায় ফাটল ধরানোর হিম্মৎ আপনার সরকারের নেই। আমাদের মাতৃভূমির হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের মত এই দুজন দেশপ্রেমিক জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা। হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য তারা প্রস্তুত। তাদের সাথে রয়েছে ভারতবর্ষের মেহনতী জনগণের বুকভরা ভালোবাসা, তাদের জন্য রয়েছে বিশ্ব জনগণের গভীর শ্রদ্ধা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন।

আপনার সরকার নিজেকে বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে দাবী করে। আপনি দাবী করেন, ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক' দেশ কথাটা উচ্চারণ করতে আপনার লজ্জা হয় না? আপনার সরকার ভারতবর্ষের মেহনতী জনগণকে শোষণের নির্মম যাঁতাকলে পিষে মারছে। স্বদেশের কোটি কোটি জনগণের উপর বল্গাহীন লুণ্ঠন চালাচ্ছে। তাঁদের উপর অত্যাচারের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আজকের ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ একমুঠো ভাত আর দুটো রুটির অভাবে তিলে তিলে কষ্ট পাচ্ছেন, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধুঁকছেন, মরণের দিন গুণছেন। গ্রামে শহরে হাজার হাজার মানুষ একমুঠো খাদ্যের প্রতীক্ষায় অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার ভারতবর্ষের সন্তান এক ঢোক ফ্যানের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজকের ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, কর্মহীন অবস্থায় জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। এমতাবস্থায় আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি, মহাশয়া, এর

নামই কি গণতন্ত্র? এই কি আপনার 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক' দেশ? মহাশয়া কি উত্তর দেবেন? নাকি আপনার উত্তর দেবার ফুরসৎ নেই? তা নাও থাকতে পারে, জনগণের রক্তপান করে যারা বেহেড উন্মাদ, এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার হিম্মৎ তাদের থাকে না।

আপনার সরকার একান্ত বশংবদ নেড়ী কুত্তার মত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করছে আর তাদের প্রসাদপুষ্ট হয়ে লেজ নাড়ছে। আপনার সরকার এদেশের কোটি কোটি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার পরিবর্তে দুই অতি বৃহৎ শক্তির এবং এ দেশের বৃহৎ সামন্ত প্রভু ও মুৎসুদ্ধি বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এই সরকার একটি সম্প্রসারণবাদী সরকার। সে তার বিদেশী প্রভুদের সহায়তায় ক্রমাগত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলিকে দখল করার চেষ্টা করছে। এই সরকার বলপ্রয়োগে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, সিকিমকে অধিকার করেছে এবং ভুটান, নেপাল, সিংহল ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বকে গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত করছে। অথচ প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য জনসভায় আপনার 'দরদ' উথলে ওঠে। শ্রীমতী গান্ধী আপনার 'দরদ' আমাদেরকে রূপকথার রাক্ষসীর 'দরদের' কথা মনে করিয়ে দেয়।

শ্রীমতী গান্ধী, আপনার পিতার "বৃহৎ এশীয় সাম্রাজ্যের" রঙীন স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার হীনতম অপচেষ্টায় আপনি বুঁদ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ ধারা হচ্ছে, "দেশগুলি চায় স্বাধীনতা, জাতিগুলি চায় মুক্তি এবং জনগণ চান বিপ্লব"। এবং এই অপ্রতিরোধ্য ধারাকে স্তব্ধ করার জঘন্যতম চক্রান্ত করেছিলেন আপনার পিতা। তাই জনগণ আপনার পিতাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। এবং আপনার ভাগ্যেও আস্তাকুঁড় ছাড়া আর কিছু জুটবে না।

যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য মনেপ্রাণে আগ্রহী, সেখানে আপনার সরকার চীন সম্পর্কে 'স্বাভাবিকীরণের' নোংরা ভঙ্গীর আড়ালে কার্যতঃ চীনের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে জঘন্যতম কুৎসা অভিযান চালাচ্ছে এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে অন্তর্ঘাত করছে। মহাশয়া, আপনাকে স্মরণ করিতে দিতে চাই— চীনের বিরুদ্ধ কুৎসা ছড়িয়ে, হীন চক্রান্ত এবং নোংরা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে বিশ্ব এবং ভারতীয় জনগণের বুকের গভীর থেকে মহান চীনকে মুছে ফেলা যায় না, যাবে না। এবং চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের চক্রান্ত মহান চীনা জনগণের সাথে মহান ভারতীয় জনগণের মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধন বিন্দুমাত্র শিথিল করতে পারবে না। আমরা সুখী, কারণ দুই বিদেশী প্রভুর নির্দেশে আপনার সরকার চীনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার করলেও ইতিহাসকে মিথ্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয় এবং ইতিহাসের চাকা নির্মমভাবে আপনাদের সমস্ত অপচেষ্টাকে মাড়িয়ে বিজয় গৌরবে শোষণহীন, শৃঙ্খলহীন এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবে।

আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছি : ভারতবর্ষ আমাদের। এদেশ আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়ালে লাঞ্ছিত আমাদের কোটি কোটি ভুখা

জনসাধারণের। আমরা কোনো মতেই সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী শৃংখলে আবদ্ধ থাকব না। এই শৃংখলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। এদেশের জনগণের স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। পৃথিবীর কোন শয়তান কোন সাম্রাজ্যবাদী দুষমন এ অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না, পারবে না ভারতবর্ষের জনগণের মুক্তির স্বপ্নকে স্তব্ধ করে দিতে।

যাঁরা আজ মুক্তিসংগ্রামের লাল মশালকে উর্ধে তুলে ধরেছেন, ভারতীয় জনগণের স্বার্থে যাঁরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আপনার ফ্যাসিষ্ট সরকার তার রক্তে ভেজা খুনীর হাত নিয়ে বর্বরের মত তাঁদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পৈশাচিক হিংস্রতায় আপনার জল্লাদ সরকার তাঁদের হত্যা করছে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে, অন্যায়ভাবে কয়েদখানায় রুদ্ধ করে রেখেছে। হাজার হাজার বিপ্লবী আজ কারান্তরালে আপনার সরকারের নিষ্ঠুর মধ্যযুগীয় নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য যে দেশপ্রেমিকরা সংগ্রাম করছেন, আপনার সরকার তাঁদের উপরও পশুর মত লাঠি, গুলি, বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কারান্তরালের শত শত নিরস্ত্র বন্দীদের হত্যা করে এই সরকার রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের বাক্ স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি করার অধিকারটুকু পর্যন্তও আপনার সরকার রাইফেলের নল দেখিয়ে কেড়ে নিচ্ছে। এমনকি আপনাদের নোংরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই সরকার বিচার বিভাগকে পর্যন্ত অধীনস্থ করে নিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বুলির আড়ালে এই সরকার দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের রক্তে ভেজা হাতে তার সমস্ত গণতান্ত্রিক মুখোশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। প্রধানমন্ত্রী, এই আপনার "বৃহত্তম গণতন্ত্র"। আপনার বৃহত্তম গণতন্ত্রের মাথায় আমরা পদাঘাত করি। বিশ্বের জনগণ এই মেকী গণতন্ত্রকে ঘৃণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী, আপনার পিতার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, যিনি ইংরাজদের পুরানো জুতো পায়ে গলিয়ে দিল্লীর শাহী তক্তে বসে উন্মাদের মত ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ল্যাম্পপোষ্টে চোরাকারবারীদের ঝুলিয়ে দেব।" কিন্তু আপনার পিতার জীবৎকালে কোনো চোরাকারবারীকেই ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলতে হয় নি। অবশ্য আমরা এতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হই না, কারণ চোরাকারবারীরা আপনার পিতার পরম বন্ধু। তাই তাদের ঝোলাতে ব্যর্থ হলেও হাজার হাজার বীর সন্তানকে আপনার পিতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন এবং আপনিও মুখে সমাজতন্ত্রের ভড়ং নিয়ে আপনার পিতার পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে প্রশ্ন করি, কোন্ অধিকারে আপনার সরকার কমরেড কিস্তাগৌড় ও কমরেড ভুমাইয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে? যারা আমাদের সুন্দর দেশকে বিদেশী শয়তানদের হাতে তুলে দিচ্ছে, যারা মাতৃভূমির ষাট কোটি জনসাধারণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই মদের নেশায় উন্মত্ত, সেই জন্তুগুলোর কি অধিকার আছে কমরেড কিস্তাগৌড় ও কমরেড ভুমাইয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেবার? ফুটন্ত গোলাপের মত নিটোল অন্তর যাঁদের জনগণের প্রতি মমতায় ভালবাসায় দীপ্ত উদ্ভাসিত, সেই হাজার

হাজার বিপ্লবী এবং গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিককে কোন্ অধিকারে আপনার সরকার কয়েদখানায় আটকে রেখেছে? এটা চূড়ান্ত অন্যায়। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারতীয় জনগণ এই অপরাধ ক্ষমা করবেনা। তাঁরা অবশ্যই এ ধরণের মৃত্যুদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গণ-আন্দোলনের এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার জন্ম দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, আপনাকে আবার জানিয়ে দিচ্ছি, শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে বিপ্লবের গতি রোধ করা যাবে না। হাজার হাজার বিপ্লবীকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখে মুক্তিসংগ্রামের লাল মশালকে নিভিয়ে দেওয়া যাবে না। পৃথিবীর চারদেয়ালে বিপ্লবীদের কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে— শোষণহীন পৃথিবীর আশ্চর্য সংগীত।

জীর্ণ পাতা ঝরে গেলে সবুজে শ্যামলে পল্লবিত হয়ে ওঠে বনভূমি। সারা দুনিয়ার বিপ্লবীরা নবোদ্গত কিশলয়ের মত সুবজ, প্রাণবন্ত। তবুও কিশলয়ের বিনাশ আছে, কিন্তু বিপ্লবীদের বিনাশ নেই। জনগণের স্বার্থে যাঁরা প্রাণবলি দিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যু হিমালয় পর্বতের চেয়েও ভারী। তাঁদের একের মৃত্যু লক্ষ কোটি সন্তানকে লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে আসে, তাদের একের মৃত্যু লক্ষ কোটি মরণজয়ী যোদ্ধার জন্ম দেয়। তাই সংগ্রাম কোনো দিন নিভবে না এবং সংগ্রামের আগুনেই আপনাদের পুড়ে মরতে হবে।

আমরা আবার ঘোষণা করছি, ভারতবর্ষের জনগণ আপনাদের কোন অপরাধই ক্ষমা করবেন না, এবং কোনো অপরাধই বিনা শাস্তিতে পেরিয়ে যাবে না। কারণ, আপনাদের যদি ঘর-জ্বালানোর অধিকার থাকে, তাহলে ভারতীয় জনগণের নিশ্চয়ই, তাঁদের আপন কুটিরে প্রদীপ জ্বালানোর অধিকার রয়েছে। এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষের জনগণ তাঁদের চার শত্রু সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের কবর খোঁড়ার জন্য নিজেদের কাঁধে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, তারা গণলাইন প্রয়োগ করে দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

আমরা আপনার সরকারের কাছে কমরেড কিস্তাগৌড় ও কমরেড ভূমাইয়ার জন্য নতমস্তকে প্রাণভিক্ষা করছি না। আমরা উচ্চশিরে দৃপ্ত বিপ্লবী সাহসিকতায় দাবী করছে— আমাদের দুই প্রিয় কমরেডের উপর বর্বরভাবে আরোপিত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে তাদের সসম্মানে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। আমরা আরও দাবী করছি যে, এদেশের কারাগারে ও বন্দীশিবিরে অন্যায়ভাবে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

১১.১.৭৫ **মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক কিছু রাজনৈতিক বন্দী**

অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

তরুণ অপেরার মাও সেতুং

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে শিল্প-মাধ্যম হিসেবে যাত্রাপালা নোতুন কোরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবং এর সুযোগ নিয়ে অপ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা যাত্রা ব্যবসাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ কোরে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার বেশ জোর কদমেই চালিয়ে যাচ্ছে। অপ-সংস্কৃতির এই কুৎসিৎ বন্যার মধ্যেও যারা নানারকম সীমাবদ্ধতা সত্বেও যাত্রা-পালার মাধ্যমে জনগণের সামনে কিছু প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে তরুণ অপেরা তাঁদের 'লেনিন', 'কার্ল মার্কস' প্রভৃতি যাত্রার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান কোরে নিয়েছেন। তাদের এই অভিনন্দনযোগ্য প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতার মধ্যেই আমরা এবার পেয়েছি একটি নোতুন প্রচেষ্টা— 'মাও সেতুং'। গত এক দশকেরওবেশি সময় ধরে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী তথা মস্কোর নয়া জাররা যখন সুপরিকল্পিতাভাবে সমাজতান্ত্রিক চীন এবং চীনা জনগণের মহান নেতা মাও সেতুঙের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তরুণ অপেরা যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে মাও সেতুংকে যাত্রাপালায় হাজির করার সাহস দেখিয়েছেন, আর কিছু না হোক, শুধুমাত্র একারণেই তারা অভিনন্দন দাবী করতে পারেন।

মাও সেতুঙের জীবনকাহিনী মানেই কর্যতঃ চীন বিপ্লবের ও চীনা জনগণের মহান বিজয় অর্জনের ইতিহাস। সাড়ে তিন ঘন্টার একটি যাত্রাপালার মধ্যে এই বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা মোটেই খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তা সত্বেও যাত্রাপালায় তিনি প্রথমেই তুলে ধরেছেন বিদেশীদের করায়ত্ত চীনকে, যারা কোটি কোটি মানুষকে আফিং-এর নেশায় বুঁদ কোরে রেখে সাম্রাজ্যবাদ মুৎসুদ্ধি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদ চালিয়ে গেছে অমানুষিক শোষণ ও নিপীড়ন, যে শোষণের বিরুদ্ধে বারবার জেগে উঠেছে জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ। চীনে এই পটভূমিকায় শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে পোড় খেয়েই জন্ম নিয়েছেন মাও সেতুং। সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হুনানের কৃষকের ঘরের এই ছেলেটি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করে যে, চীনের মতো কৃষি-প্রধান একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশে শহর নয় গ্রামই হবে বিপ্লবের মূল কেন্দ্র,এবং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকরাই হবেন এখানে বিপ্লবের প্রধান শক্তি। তাই "কৃষকদের হাতে জমি চাই" — স্লোগানকে সামনে রেখে কৃষি বিপ্লব গড়ে তোলার

কর্মসূচী নিয়ে, পার্টির নেতৃত্বে গণফৌজ ও যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে, এবং ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে মাও সেতুং এগিয়ে নিয়ে যেতে চান চীন বিপ্লবকে, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যের দিকে। এদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শে চিয়াং কাই শেক কমিউনিষ্টদের ওপর শুরু করে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়ন। মাও সেতুং পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই কোরে নেতৃত্ব দেন চিংকাঙের লাল ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার সংগ্রামে, চিয়াং এর সমস্ত ঘেরাও ও দমন অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের পটভূমিকায় মাও সেতুং জাপ-বিরোধী ব্যাপক দেশপ্রেমিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার কর্মসূচী উপস্থাপিত করেন, কিন্তু চিয়াং-এর আক্রমণ চলতেই থাকে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে শুরু হয় লালফৌজের ঐতিহাসিক 'লং মার্চ', এবং তার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তিতে ইয়েনানে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবী লাল ঘাঁটি। এদিকে চিয়াংও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে যোগ দিতে। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতা চলতেই থাকে, কিন্তু লালফৌজের অসমসাহসিক বীরত্বে জাপান পরাজিত হয়, এবং তারপর চিয়াং এর বিরুদ্ধে শুরু হয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ। অবশেষে চিয়াং পরাজিত হয়ে দেশত্যাগ করে, মাও সেতুং-এর পরিচালনাধীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি অর্জন করে চীন জনগণ।

যাত্রাপালার মাধ্যমে এই কাহিনীই মূলতঃ সফলভাবে তুলে ধরেছেন উৎপল দত্ত। এবং ভারতের মাটিতে বসে এ যাত্রা দেখতে দেখতে দর্শকরা চীন বিপ্লবের কাহিনীর মধ্যেও খুঁজে পান ভারতের সমকালীন বাস্তবকে, এবং ফলতঃ সহজেই তারা যাত্রাপালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এ যাত্রাপালা দেখাটাই একটা অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্যই উৎপল দত্ত অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যাত্রাপালার মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। যেমন, (এক) চীন বিপ্লবের নেতৃত্ব অবশ্যই মাওসেতুঙের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু মাওসেতুং আজ যে মাওসেতুং হতে পেরেছেন দুনিয়ার বিপ্লবী ও জনগণের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসন নিতে পেরেছেন, সে ব্যাপারে তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া, এবং এভাবেই তিনি সার্থকভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ কোরে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিকাশে গৌরবময় অবদান রেখেছেন। কিন্তু এই যাত্রাপালায় চীন বিপ্লবের বিজয় অর্জনের পর মাওসেতুঙের জীবনীকে বিস্তৃত না করায় রাজনৈতিকভাবে এ যাত্রাপালাটি মাওসেতুঙের সামগ্রিক রূপায়ণ হয়ে উঠতে পারেনি, হয়েছে আংশিক রূপায়ণ। (দুই) এই যাত্রাপালায় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক চেন তু-শিউর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে দেখানো হলেও, শেষ পর্যন্ত তাকে একজন নির্ভীক বিপ্লবী এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাওসেতুঙের সমর্থক হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মাওসেতুং নিজে চেনকে একজন 'অসচেতন বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বর্ণনা কোরে বলেছেন, "আসলে চেন শ্রমিকদেরকে, এবং

বিশেষতঃ সশস্ত্র কৃষকদেরকে, ভয় করতেন। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি সংলগ্নতা হারিয়ে ছিলেন, কী ঘটছে তা বুঝবার ক্ষমতাই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, এবং তার পেটি বুর্জোয়া সত্তাই তাকে ভীত সন্ত্রস্ত ও পরাজয়বাদী কোরে তোলে" (এডগার স্নো ঃ 'The Red Star Over China/1963 Edn)। স্পষ্টতঃই চেনের রূপায়ণে উৎপল দত্ত বাস্তব সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। (তিন) মাওসেতুংকে এগোতে হয়েছিলো একই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই কোরে। এই যাত্রাপালায় লি লি-সানের 'বাম' বিচ্যুতির বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মাও'র কিছু বক্তব্য পাওয়া গেলেও, ওয়াংমিঙের 'বামপন্থী' বিরুদ্ধে লড়াই স্থান পায়নি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, বিশেষতঃ ওয়াংমিঙের লাইনকে চীনের পার্টি যখন সে সময়কার সবচেয়ে জঘন্য বিচ্যুতি বলে চিহ্নিত করেছে, এবং ভারতীয় বিপ্লবের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পেছনকার 'বাম' বিচ্যুতির সঙ্গে ওয়াংমিঙের লাইনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (চার) তাছাড়া, চীনের পার্টির সাম্প্রতিক মূল্যায়ন এবং লিন পিয়াও'র বিশ্বাসঘাতক অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উৎপলবাবু এই যাত্রাপালায় লিন-পিয়াও'র উল্লেখ না করলেই সেটা শোভন হতো (ঠিক যেমন হয়েছে লি ও শাও-চি'র উল্লেখ না করাটা)।

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। সেটা হচ্ছে এই যে, এই যাত্রাপালায় চিয়াং কাই-শেককে প্রায় একটি ভাঁড়ের চরিত্রে পর্যবসিত করা হয়েছে। জনগণের এই শত্রুর প্রতি দর্শকদের ঘৃণা জাগিয়ে তোলাটাই যেখানে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিলো, সেখানে দর্শকদের মনের গভীরে পর্যন্ত নাড়া-দেওয়া চরম মুহূর্তেও চিয়াঙের ভাঁড়ামি সমস্ত অনুভূতিকে খেলো কোরে দিয়েছে, চিয়াং-এর প্রতি শ্রেণী ঘৃণা জাগরিত হতে পারেনি। চরম মুহূর্ত হাস্যরসের আমদানি কোরে সমস্ত ব্যাপারটিকে হালকা কোরে দেবার এই মানসিকতা উৎপল দত্তের বহু নাটকেই অতীতে দেখা গেছে, এবং তার এই শিল্পগত ত্রুটি এ যাত্রাপালায় অত্যন্ত বাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, এই যাত্রাপালায় মাওসেতুঙের তুলনায় চিয়াং-এর চরিত্র অনেক বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য অর্জন করেছে, এবং ফলতঃ সর্বহারা নায়ক চরিত্র মঞ্চের ওপর উজ্জ্বলতম চরিত্র হিসেবে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় 'লাল লণ্ঠন' নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে সর্বহারা নায়ক লি য়ু-হো'র চরিত্রের তুলনায় প্রতিবিপ্লবী হাতোইয়ামার চরিত্র বেশি প্রাধান্য পেয়ে যাওয়ার লাইনগত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে চিয়াং-চিনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা যে মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবেই সর্বহারা নায়ক চরিত্রকে পাণ্ডুলিপি পাল্টে উজ্জ্বলতর চরিত্র হিসেবে প্রাধান্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ তথ্য উৎপলবাবুর অজানা থাকার কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই একই ভুলের পুরাবৃত্তি তাঁর মতাদর্শগত বিচ্যুতিকেই প্রতিফলিত করেছে, এবং ভারতের সর্বাগ্রগণ্য নাট্যকারের কাছে এ বিচ্যুতি অবশ্যই দুঃখজনক।

কিন্তু এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূলতঃ ''মাওসেতুং' একটি ইতিবাচক যাত্রাপালা। এই যাত্রাপালা দর্শকদের সামনে মাওসেতুংকে একটি ইতিবাচক মহান চরিত্র হিসেবেই,

জনগণের একজন মহান নেতা হিসেবেই তুলে ধরেছে, এবং তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসাকেই বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। উপস্থাপনাকে আমরা আগেই অভিনন্দন জানিয়েছি, সামগ্রিক পরিচালনা, সঙ্গীত, টিম-ওয়ার্ক প্রভৃতিও তরুণ অপেরার মর্যাদা রক্ষা করেছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে 'মাওসেতুং' সাম্প্রতিক যাত্রাপালার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উৎপল দত্ত এবং তরুণ অপেরা এ যাত্রাপালাটির বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ত্রুটি বিচ্যুতিকে সমালোচনামূলকভাবে পুনর্মূল্যায়ন কোরে শুধরে নিলে যাত্রাপালাটি স্বভাবতঃই আরও বেশি উজ্জ্বল ও অভিনন্দনযোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রতীক মৈত্র

অনীক, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

প্রবহমান

সব্যসাচী দেব

সবুজ প্রান্তরের ওপর দৌড়ে আসে হাওয়া,
শ্মশানের নিভন্ত চিতার পাশ থেকে উঠে
জনপদের দিকে চলে যায় মানুষ।
এখন যে কোনো দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায়
কালো গাড়ি,
হঠাৎ শান-বাঁধানো রাস্তায় পড়ে থাকে
গুলিবেঁধা শরীর।
রাস্তার ফাটলে জমে থাকা বৃষ্টির জলে
মাঝে মাঝে লাগে লালচে ছিট্।
তারপর ধূসর রাত্রিকে ছিঁড়ে স্কাইস্ক্র্যাপারের পেছনে
উড়ে যায় বোয়িং সেভেন টু-সেভেন,
রাত্রির মধ্যযামে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস উঠে আসে
মহাকাশ পর্যন্ত,
অপরিচিত প্রিয় মুখ ফিরে আসে পরিচিত নিখোঁজ বন্ধুর জায়গায়,
একমাত্র সন্তানের লাশ চিতায় তুলে
অচেনা শিশুর হাসিতে খুঁজে ফেরে রোদসী মাতা।
ধানের মঞ্জরীতে জমে ওঠে দুধ;
পাহাড়চূড়ায় ভেসে যায় মেঘ;
উষ্ণ হৃদয় খুঁজে নেয় হৃদয়।
প্রিয়তম শব্দাবলীর বুকে কান রাখলে
স্রোতস্বিনীর স্পষ্ট শব্দ— ছলাৎচ্ছল্।।

অনীক, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

কাশ্মীর ! কাশ্মীর!

ভূস্বর্গ কাশ্মীর আবার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের দাবার ঘুঁটি হিসেবে ফিরে এসেছে এবং বাংলাদেশের 'জন্মদাতা' তথা সিকিমে 'গণতন্ত্রের পরিত্রাতা' ভারতীয় শাসকচক্র তাদের সম্প্রসারণবাদী থাবাটাকে নোতুন কায়দায় কাশ্মীরের ওপর বিস্তৃত করেছে।

কাশ্মীরের ইতিহাসই হচ্ছে সেখানকার জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার এক ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কাশ্মীরে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে, এবং ১৯৪৭ সালে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের সময় কাশ্মীরকে তারা ভারত বা পাকিস্তান-কোনো অংশেই অন্তর্ভুক্ত না কোরে 'স্বাধীন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণ-এশিয়ায় কাশ্মীরের অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে, বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক চীনকে ঘিরে ফেলার চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে, সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি কাশ্মীরের ওপর এসে পড়ে— এবং তারই ফলশ্রুতিতে সেখানকার জনগণের অভিমতকে গুরুত্ব না দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরকে নিয়ে লড়াই শুরু কোরে দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতি প্রতিষ্ঠিত হয়, 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার সিদ্ধান্ত অনুসারে কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশ ভারতের ও ক্ষুদ্রতর অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, এবং ঠিক হয়— কাশ্মীরের জনগণের গণ-ভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। ভারত পাকিস্তান সহ মার্কিণ সোভিয়েত প্রভৃতি সবাই-ই তখন এ ব্যাপারে একমত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কাশ্মীরের জনগণের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্তকে পদদলিত কোরে ভারত সরকার গায়ের জোরে এবং কলমের খোঁচায় (সংবিধান সংশোধন কোরে) কাশ্মীরকে ভারতের 'অবিচ্ছদ্য' অঙ্গ কোরে নেয়— এবং কাশ্মীরের জনগণ তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আন্দোলন চালাতে থাকেন। কিন্তু কাশ্মীরের সঠিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে ১৯৫৩ সালে পদচ্যুত কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা চক্র সেখানকার জনগণের স্ব-ঘোষিত নেতা সেজে ভারত সরকারের সংগে দর-কষাকষি চালাতে থাকে। তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে তাদের গণভোটের মৌলিক দাবী বিসর্জন দিয়ে শেখ আবদুল্লা এখন ভারতীয় শাসকচক্রের সঙ্গে সমঝোতা কোরে এক অভিনব পদ্ধতিতে কাশ্মীরের নোতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গদিতে বসে গেলেন। এবং ভারত শাসকচক্র এভাবে রুশ নয়া জারদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে কিস্তি মাৎ কোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কিন্তু ইতিহাস কি থেমে থাকবে? বাংলাদেশের জনগণ আজ ভারতীয় শাসকচক্রের

স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, সিকিমের সচেতন যুবসম্প্রদায়ের বিরাট অংশ আজ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন (সম্প্রতি ভারত-বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করার জন্য কয়েকজন যুবকের গ্রেপ্তার স্মরণীয়)— কাশ্মীরের জনগণও কি ঠিক সেই একইভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে আসবেন না? শেখ আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতা কি কাশ্মীরের জনগণের ন্যায্য দাবী ভুলিয়ে দিতে পারবে? ইতিমধ্যেই শাসকশ্রেণীর প্রচণ্ড নির্যাতন সত্ত্বেও কাশ্মীরের জনগণের বিক্ষোভ কি ফেটে পড়ছে না? সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় শাসকচক্র একের পর এক পাথর তুলে নিচ্ছে নিজেদের পায়েই ফেলবার জন্য। বাংলাদেশ, সিকিম প্রভৃতি তার ব্যতিক্রম হয় নি— কাশ্মীরও হবে না। "দেশগুলি স্বাধীনতা চায়, জাতিগুলি মুক্তি চায়, আর জনগণ চান বিপ্লব"— কাশ্মীরও ইতিহাসের এই অপ্রতিরোধ্য ধারাকেই নোতুন কোরে প্রমাণিত করবে।

অনীক, মার্চ, ১৯৭৫

ভারত-চীন মৈত্রী প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বিশ্ব-টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম একটি চীনা প্রতিনিধি দল ভারত এসেছিলেন, এবং তাদের আগমনকে কেন্দ্র কোরে এদেশের জনগণের মনে ভারত-চীন মৈত্রীর সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল।

চীনের দিক থেকেও চীনা প্রতিনিধি দলের ভারত আগমনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাদের দলটি শুধু সংখ্যার বিচারেই বৃহত্তম ছিলো না, উপরন্তু ক্রীড়া বিভাগীয় একজন উপমন্ত্রী পর্যন্ত এই দলের নেতা হিসেবে সঙ্গে এসেছিলেন। আগমনের প্রথম দিন থেকেই চীনা প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বারবার ভারতীয় জনগণের প্রতি তাদের অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, সুযোগ পেলেই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, এবং সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন— প্রতিযোগিতা তাঁদের কাছে প্রধান ব্যাপার নয়, তাদের কাছে প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান ব্যাপার হচ্ছে বন্ধুত্ব, ভারতীয় জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রসার ঘটাতেই তাঁরা এদেশে এসেছেন। এ-সব কিছুই হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারত-চীন মৈত্রীকে স্বাভাবিক ও জোরদার কোরে তুলবার ব্যাপারে তাদের আন্তরিক আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছে। অবশ্য চীনা প্রতিনিধিরা যাতে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে না পারেন, ভারত সরকার সেজন্য 'নিরাপত্তার' অজুহাতে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলো, এমন কি চীনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী ভারতীয়দের পেছনে সাদা পোষাকের পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে একটা ভীতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পর্যন্ত পিছু-পা হয় নি। কিন্তু তবুও চীনা প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে দমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আর চীন যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ভারত-চীন সম্পর্ককে স্বাভাবিক কোরে তুলতে চায়, ঘটনাক্রমে তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে গেছে। চীনের অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী চেন শি-লিয়েন নেপাল থেকে ফেরার পথে দমদম বিমানবন্দরে রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন : "দু'দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক কোরে তুলবার ব্যাপারে ভারত সরকার উদ্যোগ নিলে চীন তাতে সাড়া দেবে। সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যাপারে চীন সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী আছে কিনা— রিপোর্টারদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন— 'হ্যাঁ'।" (ষ্টেটসম্যান : ২৭.২.৭৫)। আমাদের দেশে শাসকশ্রেণীর ধারাবাহিক গোয়েব্‌ল্‌সীয় প্রচারের ফলে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যাপারে চীনের মনোভাব সম্পর্কে যাদের মনে, অসচেতনভাবে হলেও, কিছু সংশয় ছিলো, এই

সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলে তাদের সে সব সংশয়ও নিঃসন্দেহেই দূর হয়ে যাবে। অবশ্য তাই বলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, চীন তার বিপ্লবী নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন কোরে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসবে। পৃথিবীর বহুদেশের সঙ্গে সিকিম বা কাশ্মীর জাতীয় বহু বিষয়ে মত-বিরোধ সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে যদি ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে, তবে এসব প্রশ্নে চীনের ভিন্ন মতই বা কেন স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হবে?

কিন্তু যারা সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে ভারত চীন-বিরোধকে জিইয়ে রেখে আখের গুছিয়ে নিতে চায়, তাদের 'সংশয়' কোনোদিনই দূর হবে না। সেকারণেই এদেশে মস্কোপন্থী সংশোধনবাদীদের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাই চীনা দলের ভারত আগমনকে কেন্দ্র কোরে চীনের বিরুদ্ধে নানা আজগুবি কুৎসার বান ডাকিয়েছে এবং ভারত-চীন মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথে হাজাররকম বাধা সৃষ্টির চক্রান্ত চালিয়ে গেছে। গত বছর ডাঃ কোটনীস স্মৃতিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিদলের চীন ভ্রমণকে উপলক্ষ্য কোরে 'নিউ এজ' পত্রিকার কুৎসিৎ ভারত চীন-মৈত্রী বিরোধী জেহাদকেও ছাড়িয়ে গেছে মস্কোপন্থীদের এই সাম্প্রতিক কার্যকলাপ, এবং এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়েছে মস্কোর নিজস্ব কণ্ঠস্বর 'সপ্তাহ' পত্রিকা। অবশ্য এদের গাত্রদাহের কারণটা উপলব্ধি করাটা খুব কঠিন নয়। সাম্প্রতিককালে দেশে দেশে, এবং বিশেষতঃ ভারতে, রুশ নয়া জারদের নগ্ন সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ ভারতীয় জনগণের সামনে সমাজতন্ত্রের ভেকধারী এই শয়তানদের নোংরা চরিত্রটাকে ক্রমশঃই উদঘাটিত কোরে দিচ্ছে, এবং তার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক চীনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ও বিপ্লবী অগ্রগতি জনগণের মনে নোতুন আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। এমতাবস্থায় সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলে চালিয়ে দেবার চক্রান্ত ছাড়া রুশ নয়া জারদের ভারতীয় সেবাদাসদের সামনে কোনো পথই আর খোলা নেই।

কিন্তু ভারত সরকারই বা সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যাপারে চীনের এসব সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি সম্পর্কে কী মনোভাব দেখাচ্ছে? এতোদিন ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর মুখে আমরা প্রায়শঃই এই গালগপ্পো শুনে এসেছি যে— ভারত সরকার নাকি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক কোরে তোলার জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা নিয়ে চলেছে, কিন্তু চীনই সাড়া দিচ্ছে না! তাই গত অক্টোবরে কলকাতার এক বেচাল সাংবাদিক যখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভারত দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কী কী উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নিয়েছে সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, তখন বিব্রত প্রধানমন্ত্রী এধরণের 'এম্ব্যারাসিং' প্রশ্ন না করার জন্য প্রকাশ্যেই তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং এভাবে পরোক্ষভাবে প্রমাণ কোরে দিয়েছিলেন যে, কার্যতঃ এ ব্যাপারে কোনো সক্রিয় উদ্যোগই আজ পর্যন্ত ভারত গ্রহণ করে নি। কিন্তু আজ যখন চীনা খেলোয়াড়দের সঙ্গে সঙ্গে চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভারতীয় উদ্যোগে সাড়া দেবার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছেন, তখন সেই সব বস্তাপচা গাল গপ্পো আর ধোপে টিকবে না। ১৯৬২-তে ভারত

সরকারই প্রথমে চীন থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার কোরে নিয়ে দু'দেশের সম্পর্ককে অস্বাভাবিক কোরে তুলবার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। কাজেই আজ যদি ভারত সরকার সত্যি সত্যিই চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক কোরে তুলতে চায়, তবে তাকেই প্রথমে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে চীনে পাঠিয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে, এবং সীমান্ত-বিরোধ-সহ চীনের সঙ্গে যে যে ব্যাপারে বিরোধ রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিরোধকেই শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেবার সদিচ্ছার প্রমাণ ও সক্রিয় উদ্যোগ দেখাতে হবে।

ভারতীয় জনগণ চাইলেই ভারত সরকার সুবোধ বালকের মতো চীনের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেবার প্রচেষ্টা শুরু করবে, এমন ভাবাটা অবশ্যই মুর্খতা হবে। ১৯৫৯ সালে ভারত-চীন বিরোধের পেছনে যেমন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিলো, আজ ঠিক তেমনি আছে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য উস্কানি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, ব্যাপক ভারতীয় জনতা ভারত-চীন মৈত্রী প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্রমশঃই বেশি বেশি সোচ্চার হয়ে উঠছেন, এমনকি শাসক দলের অনেক সমর্থক পর্যন্ত আজ চীনের সঙ্গে মৈত্রী কামনা করছেন। কাজেই এমন অবস্থায় বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ছে তাঁদের ওপর, যারা ভারত-চীন মৈত্রীর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এটা খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পশ্চিমবাংলার দু-তিনটে জেলা বা অঞ্চলে এ ব্যাপারে কিছু অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা চালালেও, এবং বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগগ্রহণকারীদের নিয়ে পশ্চিমবংগ স্তরে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হলেও, এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে বিকশিত ও সংগঠিত করে তোলা যায় নি। তাই, যাঁরা প্রকৃতই ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে চান— এবং এ ব্যাপারে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বা 'বামপন্থী' সংকীর্ণতাবাদী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে চান না— তাঁদের সবার কাছে আমাদের আবেদন : ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও গভীরতর কোরে তুলুন, ভারত-চীন মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পক্ষে গত দেড় দশকের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার আজকের জনমতকে জনগণের স্বার্থে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত কোরে তুলুন— ভারত চীন মৈত্রীর আন্দোলনকে জোরদার কোরে তুলুন।

অনীক, মার্চ, ১৯৭৫

বাংলাদেশ, আবার বাংলাদেশ!

আমরা পারছি না, তাল রাখতে পারছি না! বাংলাদেশের কথা বলছি। গত কয়েক বছর ধরে সেখানে যেভাবে দ্রুত তালে বিপ্লবী অগ্রগতি ঘটছে, তার সঙ্গে আমরা তাল রাখতে পারছি না। একবার ভেবে দেখুন তো, কী বিস্ময়করভাবে, কী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সে দেশের বিপ্লব! ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হলো সেদেশের মুক্তি সংগ্রাম— এবং মাত্র ন'মাসের মধ্যেই তা মহাগৌরবের বিজয় অর্জন কোরে ফেললো। তারপরই শুরু হলো সমাজতান্ত্রিক পথে তার অগ্রগতি— এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে ব্যাপক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের হদ্দোমুদ্দো সেখানে কোরে দেওয়া হলো! তারপর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই মহান বিপ্লবী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার অসারতা অনুধাবন কোরে ফেললেন, এবং কলমের এক খোঁচায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে দেশের দ্বিতীয় বিপ্লব তথা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা কোরে ফেললেন! পাঠক বন্ধুগণ, আপনারাই বিচার করুন, দুনিয়ার ইতিহাসে তুলনাবিহীন এই বিপ্লবী অগ্রগতির সংগে তাল রাখা কারও পক্ষে সম্ভব কি না!

কিন্তু না, বাংলাদেশের জনগণ অতো মূর্খ নন, অন্যান্য দেশের জনগণও নন। তাই শেখ মুজিবের কর্কশ কণ্ঠস্বরও তার অন্তঃসারশূন্যতাকে, তার ভাঁড়ামিকে, তার জঘন্য প্রতিবিপ্লবী চরিত্রকে ঢেকে রাখতে পারছে না। পাকিস্তানী সামরিক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে শেখ মুজিবচক্র তাদের বিদেশী মুরুব্বিদের প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র সমর্থনে সেদেশের ক্ষমতা দখল করেছিলো। ইতিহাসের করুণ ট্র্যাজেডিতে সেই প্রত্যক্ষ একনাকত্বের পথই তাকে আজ গ্রহণ করতে হলো। রুশ মার্কিন দুই আধিপত্যবাদী বৃহৎ শক্তি, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং বাংলাদেশীয় দালাল ফড়ে-জোতদার-মহাজনের দল মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সেদেশের অর্থনীতিকে এমন একটা চরম সংকটের মধ্যে এনে ফেলেছে এবং এই সংকট এড়াবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সেদেশের শাসকশ্রেণী এমন এক রাজনৈতিক সংকট পাকিয়ে তুলেছে যে, অনাহারে দুর্ভিক্ষে মৃত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের দামে সে দেশের জনতা তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরে পুরোনো কায়দায় আর বাঁচতে চাইছিলেন না। তাই সেদেশের ভেঙে পড়া শাসনযন্ত্র তথা অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে কোনক্রমে খাড়া কোরে রাখবার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত কোরে ফ্যাসিষ্ট শোষণ ও নিপীড়নের ষ্টিম-রোলার চালিয়ে সমস্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেবার জন্যই শেখ

মুজিব চক্রের দরকার হয়ে পড়েছিলো ক্ষমতা, আরও ক্ষমতা— একচ্ছত্র ক্ষমতা। গত ডিসেম্বর মাসে প্রবর্তিত জরুরী অবস্থাটা ছিলো তার প্রথম পদক্ষেপ, আর ২৫শে জানুয়ারীর প্রত্যক্ষ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তারই চরম পদক্ষেপ। এছাড়া শেখ মুজিবের ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পথই আর খোলা ছিলো না।

হিটলারের জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের প্রধান স্লোগানটিকে শেখ মুজিবের দল অনেক আগেই মুখস্থ কোরে নিয়েছিলো, এবার আরও প্রত্যক্ষভাবে, আরও নির্মমভাবে, আরো উদ্ধতভাবে তাকে কার্যকরী করা হবে। উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসেই জন্ম নিয়েছিলো বাংলাদেশ, গভীর পরিকল্পনার মাধ্যমে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছিলো একচ্ছত্র নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি, এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের ধাক্কায় অন্য সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে শুধুমাত্র শেখ মুজিবের দলকেই টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থাটা পাকা কোরে ফেলা হলো। কাজেই শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবতঃ "এক জাতি, এক দল, এক পিতা-র" ফ্যাসিষ্ট কর্মসূচীকে কার্যকরী করার বিপ্লব— প্রতিবিপ্লবের মধ্যে প্রতিবিপ্লব। দুনিয়ার দেশে দেশে প্রতিবিপ্লবীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের অনুরাগ লক্ষ্য কোরে বহুদিন থেকেই নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপকে "সমাজতন্ত্র"-এর সাইনবোর্ডের আড়ালে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশের মতো এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রকৃত বিপ্লবীরা যখন নিজ নিজ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে চীনে অনুসৃত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকেই প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন জনগণকে বিভ্রান্ত করার তথা এই পথ থেকে সরিয়ে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় শেখ মুজিব তার প্রতিবিপ্লবী দ্বিতীয় পদক্ষেপটির গায়ে সেই "নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই" লেবেল সাঁটিয়ে দিয়েছে। তার "প্রথম বিপ্লব" অর্থাৎ বাংলাদেশের তথাকথিত স্বাধীনতার মর্মবস্তুটা সেদেশের জনগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন, এবং তার ফলে তার এই 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সম্পর্কে তাদের বিশেষ মোহ থাকার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের 'নয়া বিপ্লব' সম্পর্কে সে দেশের জনগণের উৎসাহের অভাব তারই প্রমাণ বহন করছে।

বাস্তবতঃ প্রত্যক্ষ একনায়কত্বের পথে শেখ মুজিবের এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীকে আরও বেশি সংকটগ্রস্তই কোরে তুলছে, তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হাতে রাখবার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেও পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বজায় রেখে দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তথা তস্য অনুচরবৃন্দকে কিছু কোরে খাবার সুযোগ দিয়েই রেখেছে। কিন্তু তা সত্বেও আওয়ামী লীগের সমস্ত মাতব্বররা শেখ মুজিবের এই নোতুন বিপ্লব সম্পর্কে একমত হতে পারছেনা, কর্ণেল ওসমানি তো পদত্যাগই কোরে বসেছেন। কাজেই, বাংলাদেশকে কেন্দ্র কোরে মার্কিণ রুশ দুই বৃহৎ শক্তি এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কুকুর কামড়াকামড়ির পরিপ্রেক্ষিতে শাসকদলের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যে অদূর

ভবিষ্যতেই আরো তীব্র হয়ে উঠবে, তাতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। আর শুধু শাসক দলই বা কেন, কার্যতঃ পার্লামেন্টারী পথের যাত্রী সেদেশের বিভিন্ন সংশোধনবাদী ও সমাজ-গণতন্ত্রীদল, যারা প্রকাশ্যেই কাজকারবার চালাতো, তারা সবাই নোতুন ব্যবস্থায় একটিমাত্র দল থাকার শর্তটি কার্যকরী হতে শুরু করলেই নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত কোরে দিতে বাধ্য হবে— এবং এই প্রক্রিয়াটি স্বাভাবতঃই সেদেশের শাসকশ্রেণীর খেয়োখেয়িকে আরো তীব্রতর কোরে তুলবে।

এই খেয়োখেয়ির ব্যাপারটা মুজিববাদী নয়া বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেশ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের 'জন্মের' ব্যাপারে সশস্ত্র সেনাবাহিনী পাঠিয়ে যিনি প্রত্যক্ষভাবে ধাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে তড়িঘড়ি কোরে শেখ মুজিবের একনায়কত্বকে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, তা অনেক ইন্দিরা-ভক্তর কাছেও বেশ দৃষ্টিকটু লেগেছে— বিশেষতঃ ইন্দিরাজী যখন প্রায়শঃই কীর্তনের ধুয়োর মতো ভারতের পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন! রুশ নয়া জাররা এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো অভিমত প্রকাশ না করলেও, বাংলাদেশে মস্কোর সবচেয়ে সুসংবদ্ধ দালালের দল মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক মহাম্মদ ফরহাদ প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং এই মুজিব-মার্কা বিপ্লবকে 'বাংলাদেশে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান এবং প্রকৃত গণতন্ত্র তথা শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছে— এবং তার এই নির্লজ্জ বিবৃতির মধ্যে দিয়ে মুজিবী বিপ্লবের পেছনে রুশ নয়া জারদের হিংস্র থাবাটা খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

শেখ মুজিবের পেছনে রুশ ভালুকের এই নেপথ্য ছায়ার অস্তিত্ব দেখে মার্কিণ ঈগল স্বভাবতই খুশি হতে পারেনি— দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের সর্বজনবিদিত দীর্ঘ রেকর্ড সত্ত্বেও না। তাই আমাদের দেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে শুরু কোরে জনসংঘ লোকদল-সোসালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সুপরিচিত মার্কিণ-প্রেমিকরা শেখ মুজিবের এই নয়া বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। শুধু এরাই নয়, সি.পি.আই.এম-সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলও একে 'একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা' বলে নিন্দা করেছে। অথচ ১৯৭১ সালে এরা সবাই-ই শেখ মুজিবের প্রথম বিপ্লবের জঙ্গী প্রবক্তা হিসেবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকচক্রের বাংলাদেশ অভিযানকে সমর্থন করেছে, সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের যৌথ পরিকল্পনার ফসল বাংলাদেশের জন্মকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে (সিপিআইএম তো "জয় হোক নবজাতকের" বলেই অভিনন্দন জানিয়েছিলো!)। প্রথম বিপ্লবের নায়ক 'গণতন্ত্রের পূজারী' শেখ মুজিবের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই একনায়ক শেখ মুজিবের মিঃ জেকিল-ডঃ হাইড মার্কা রূপান্তরীকরণের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিয়েই নির্লজ্জভাবে রাজনৈতিক ডিগবাজীটা এরা

খেয়েছে— এবং স্বভাবতঃই তা বামপন্থী সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অনেক ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে।

শেখ মুজিবের এই নয়া বিপ্লব দু'টি তাৎপর্যকে বিশেষভাবে সোচ্চার কোরে তুলেছে। প্রথম তাৎপর্যটি সেদেশের জনগণ তথা বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেদেশের জনগণ শেখ মুজিবের এই নোতুন মোড়কে আবৃত পুরোনো বস্তাপচা মালটিকে যে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে গ্রহণ করছেন না, এটা সুস্পষ্ট। আর সে দেশের বিপ্লবীরা তো আগে থেকেই এই নয়া চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন কোরে দিয়েছেন। তাছাড়া যেহেতু বিপ্লবী শক্তিগুলি আগে থেকেই গোপনভাবে রয়েছেন, অতএব শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন তাদের মূলতঃ কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, উপরন্তু এই নোতুন পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নিয়ে এগোতে পারলে তাঁরা বাংলাদেশের বিপ্লবকেই দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্যটি প্রযোজ্য ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এদেশেও ফ্যাসিষ্ট কায়দার প্রতি শাসকশ্রেণীর যে অনুরাগ ক্রমবর্ধমান হারে প্রকট হয়ে উঠছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গবেষণাগারের ফ্যাসিবাদের এই নোতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা এদেশের শাসকশ্রেণীকেও যে বিশেষ উৎসাহী কোরে তুলবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলশ্রুতিতে ভারতীয় রাজনীতিতে শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদীকরণ এখন কোন্‌দিকে মোড় নেবে, তা সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছেই চিন্তার বিষয়। এদেশের বিপ্লবীদের তাই এ মুহূর্তে দায়িত্ব সে সম্পর্কে সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ কোরে শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী মদমত্ত পদসঞ্চারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে সমবেত করার ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ, ও কার্যকরী করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এটা আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার যে, সময় কারও জন্য অপেক্ষা কোরে বসে থাকবে না, বিপ্লবীরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে উদ্যোগ চলে যাবে প্রতিবিপ্লবীদেরই হাতে— এবং শেষ বিচারে তা ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রগতিকেই ব্যাহত করবে।

অনীক, মার্চ, ১৯৭৫

অনন্তদা স্মরণে

দীপংকর চক্রবর্তী

মাঝেমাঝেই সকালবেলা হয়তো বসে কাজ করছি, কিংবা অন্য কিছু, হঠাৎ কানে আসতো সস্নেহ সে ডাক— "দীপু, আছো তো?" অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতাম, "আছি, আছি অনন্তদা!" তারপর নানা কথা, উপদেশ, আলোচনা— জেলে আটক রাজবন্দীদের জন্য কী করা যায়, 'অনীক'-এ কী কী থাকলে ভালো হয়, কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলন। এবং সব কথা, সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে বারবার বিভিন্নভাবে বিকীরিত হয়ে পড়তো বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ কোরে তোলার জন্য তাঁর উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা, ভারতীয় বিপ্লবের সুনিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে তাঁর দীপ্যমান বিপ্লবী আশাবাদ।

অনন্তদা, অনন্তদা, অনন্তদা! ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি তাঁর কথা— যৌবনের প্রথম প্রহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়া অগ্নি-কিশোর অনন্তদা, আন্দামানের উঁচু প্রাচীরের আড়ালে শৃঙ্খলিত ফুঁসে ওঠা অনন্তদা, সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের চির উজ্জ্বল পথের পথিক উন্নত-শির অনন্তদা! ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন বারবার এগোবার পথে হোঁচট খেয়েছে, অনন্তদা কিন্তু চিরকালই আগুয়ানদের দলে। বাষট্টিতে উদ্যত খড়্গের সামনে দাঁড়িয়েও অকুতোভয়, চৌষট্টিতে সংশোধনবাদের পিচ্ছিল পথ ছেড়ে অগ্রসর বৃদ্ধ বয়সেও নেতৃত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে, তারপর নকশালবাড়ীর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রজ্জ্বলিত বিপ্লবী দাবানলে ঝাঁপিয়ে পড়া নেতৃত্বের মোহ ছুঁড়ে ফেলে। ষাট বছরের বৃদ্ধ তরুণও তাই ভীতিকর শাসকশ্রেণীর চোখে, ফলশ্রুতি বারবার রুদ্ধ কারার অন্ধকার। অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্যে জেল থেকে মুক্ত বটে, কিন্তু তবু কর্মব্যস্ত প্রতিদিন, সংশোধনবাদের অক্লান্ত বিরোধী, জনগণ-নির্ভরতার পথ থেকে বিচ্যুতির নিঃশঙ্ক সমালোচক, সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের অবিচল সমর্থক, পরিপূরক গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টায় অগ্রবর্তী, বিপ্লবী আশাবাদের জীবন্ত প্রকাশের প্রতি 'বিশেষজ্ঞ' বিদ্রূপে ভ্রূক্ষেপহীন, অর্বাচীন কুৎসাতেও দ্বিধাহীন আবালবৃদ্ধবনিতার সামনে বিপ্লবের জীবন্ত প্রেরণা অনন্তদা— প্রতিক্ষণ নিয়োজিত জনগণের সেবায়।

জনগণের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ অনন্তদা বিলিয়ে দিয়েছেন সব কিছুই, নিজে নেননি কিছু, অজস্র সুযোগ সত্ত্বেও না। সরকারী তাম্রপত্র, পেন্সন, পুরস্কার, খেতাব—

কোনো কিছুর প্রলোভনই বাঁধতে পারেনি তাঁকে, শত শহীদের রক্তে রাঙানো শাসকশ্রেণীর হাতের সমস্ত পুরস্কারকেই ঘৃণা ভরে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র একটি বা দু'টি মাত্র ভালো কাজ নয়, সমস্ত জীবন ধরে ভালো কাজ করার, আজীবন ধারাবাহিকভাবে আত্মত্যাগের, বিপ্লবের স্বার্থে জনগণের সেবা কোরে যাবার উজ্জ্বলতম জীবন্ত দৃষ্টান্ত বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনন্তদার ছবি। পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোতে অনন্তদার সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে অনেক, প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু অনন্তদার ওপর রাগ কোরে থাকতে পারি নি, হাজার মত-বিরোধ সত্ত্বেও টলে নি হৃদয়ের কোণে তাঁর জন্য পেতে রাখা শ্রদ্ধার আসনটি। এবং তাঁর শেষ জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজের প্রতিটি চিন্তার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথী হতে পেরে গৌরব অনুভব করেছি, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত করার প্রচেষ্টায় ধন্য মনে করেছি নিজেকে।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিলো যখন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছ'-সাত ঘন্টা আগে, কলকাতায় লিগাল এইড্ কমিটির অফিসে, তখনও তিনি বলেছেন, "পাঁচ তারিখে বাড়ী থেকো কিন্তু, আমি যাবো, অনেক কথা আছে, অনেক কাজ।" পাঁচ তারিখ পেরিয়ে যাবে, অনেক পাঁচ তারিখ চলে যাবে, কিন্তু অনন্তদা আসবেন না, অনন্তদা ডাকবেন না, আমাদের জীবন্ত প্রেরণা অনন্তদার দেখা কোনোদিনই আর পাবো না।

কিন্তু তবুও মাঝে মাঝেই সকালবেলায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কোরে কানে কি বেজে উঠবে না সেই সস্নেহ ডাক— "দীপু, আছো তো?" জানি, কেউ শুনবে না, তবুও হয়তো মনে মনে, কিংবা হয়তো নিজের অজান্তে সত্যিসত্যিই চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হবে— আকাশ ফাটিয়ে বাতাস কাঁপিয়ে চেতনার সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে— "আছি, আছি অনন্তদা, আছি এবং থাকবো, চিরকাল চিরদিন— যতোদিন মনে গাঁথা থাকবে আপনার স্মৃতি, আপনার জীবন, আপনার প্রেরণা— ততোদিন, ততোদিন আপনার প্রদর্শিত পথেই আছি এবং থাকবো, থাকতেই হবে— অনন্তদা, অনন্তদা, অনন্তদা!"

অনীক, মার্চ ১৯৭৫

সমকালীন যাত্রাপালা ঃ অপ-সংস্কৃতির আর এক ফ্রন্ট

পরেশ ধর

অপসংস্কৃতি বলতে লোকেরা সাধারণতঃ যৌন আবেদনপূর্ণ শিল্প সাহিত্যকেই বোঝে। মঞ্চে নারীর প্রায়-নগ্ন নৃত্য, গল্পে উপন্যাসে যুবক যুবতীর অশালীন দৈহিক আচরণ— এগুলিই যেন অপসংস্কৃতির একমাত্র রূপ। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অপসংস্কৃতির রয়েছে বিভিন্ন দিক— বহুমুখী তার কার্যক্রম। ধর্মীয় অন্ধতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও তার বিপুল অধিষ্ঠান। তাইতো দেখি দেশের পুঁজিপতি আর মন্ত্রীরা ব্যাপকভাবে বিবিধ বারোয়ারী পূজোয় কেমন মদত যোগায়। দূর্গা-কালী-শীতলা-সরস্বতী পূজোর আগে পাড়ার মস্তানরা হৈ হৈ কোরে চাঁদা আদায়ের কাজে নামে। টাকা ওঠে হাজার হাজার। দুর্গাপুজো আর কালী-পূজোয় কয়েকটি ক্লাবে লক্ষাধিক টাকাও উঠে থাকে। সে এক এলাহি কারবার! সারা দেশের মনে যেন ধর্ম-আফিঙের ঘোর লাগে। মন্ত্রীরা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা উদ্বোধন কোরে বেড়ায়। প্রকৃত সমাজ-সত্য থেকে যুবকদের দৃষ্টি এই ভাবে দূরে সরিয়ে রাখে।

শোষণ-ক্লিষ্ট সমাজে বড়ো বড়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোও অপসংস্কৃতির বাহন হয়ে ওঠে। বিগত ভারত-ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেছে। ঘরে-বাইরে ট্রামে-বাসে স্কুলে-কলেজে অফিসে-আদালতে সে কি উন্মাদনা! ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যেন ক্ষেপে গিয়েছিলো। সকাল থেকে রাত অবধি শুধু ক্রিকেট-ক্রিকেট আর ক্রিকেটের কথা। যেন এটাই জাতীয় জীবনমরণ সমস্যা। অথচ অধিকাংশ লোকই খেলাটা দেখতে পাচ্ছে না। সমাজের প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের মনোযোগ অবান্তর বিষয়ে ঠেলে দেওয়া অপসংস্কৃতির কাজ।

অপসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিচরণভূমি জীবন-বিমুখ শিল্প সাহিত্য— যেখানে সমাজের প্রকৃত বাস্তব সত্যকে আড়াল কোরে একটা মনগড়া কাল্পনিক আজগুবি ছবি খাড়া করা হয়। আমাদের দেশের ছায়াছবির মধ্যে এই অপসংস্কৃতি বিশেষ ভাবে প্রবল। এখানে কোটিপতির ছেলে বস্তির মেয়েকে ভালবাসতে পারে, আবার কোটিপতির মেয়ে অনায়াসেই বস্তির বেকার ছেলের প্রেমে পড়ে যায়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অবাস্তবতার এই অপসংস্কৃতি আমাদের সমকালীন যাত্রাপালাগুলিকেও গ্রাস করেছে। এদিকে যাত্রার জনপ্রিয়তা বেড়েছে অসম্ভব। সুদূর গ্রামে-গঞ্জে তো বটেই, বড়ো বড়ো শহরগুলিতে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাত্রা-উৎসব। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন থেকে চিৎপুরের প্রায় ৫০টা দল বেরিয়ে পড়ে মুজরো খাটতে।

মোটামুটি নামকরা দলগুলি টানা ৯ মাস প্রতিদিন অভিনয় করে। প্রথম সারির দলগুলি প্রত্যেক অভিনয়ের জন্য ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত পায়। ৯ মাসে ৮/১০ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে। মোটা মুনাফা। কয়েক কোটি টাকা যাত্রা শিল্পে খাট্‌ছে। যাত্রার দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। বড় বড় এক একটা যাত্রার আসরে ৫ থেকে ১০ হাজার আসনের ব্যবস্থা থাকে। যাত্রাভিনয় আজ পৌঁছে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে। অবস্থাটা তাই বেশ উদ্বেগজনক।

যাত্রায় আজকাল সবচেয়ে বেশি চলে সামাজিক পালা। এই সব পালার খান-কয়েক আলোচনা করলে বোঝা যাবে কি নিদারুণ বিকৃত বাস্তবতা ছড়িয়ে এগুলি দেশের জনমানস কলুষিত করছে! শিল্পীতীর্থের 'মাদার ইণ্ডিয়া' বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে খুব চলেছে। প্রধানত গ্রাম্য পটভূমিকায় এই পালার কাহিনীর বিস্তার। সাগর নামে এক চাষীর দুই ছেলে— মানিক আর সোনা। জমি সংক্রান্ত কোনো একটা গণ্ডগোলে জমিদার ধনপতি চৌধুরী সাগরকে গুলী কোরে হত্যা করে। তখন মানিক আর সোনা কিশোর বালক। ধীরে ধীরে ছেলে দুটি যৌবনে পদার্পণ কোরে চাষের কাজে হাত দেয়। মাঝে মাঝে তারা জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলে। এদিকে মজা দেখুন, জমিদারের যুবতী মেয়ে সুমতি সোনার প্রেমে পড়ে যায়। (হিন্দী ছায়াছবিও লজ্জায় মুখ লুকোবে না কি?) সুমতি বলে, সে সোনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। যখন-তখন সে সোনাদের ঘরে আসে এবং সোমার মাকে 'চাষীমা' বলে ডাকে। কিন্তু হঠাৎ সোনার যে কি হলো! গ্রামে থাকতে তার আর ভাল লাগলো না। ভাগ্যান্বেষণে সে চলে এলো কলকাতায়। সেখানে তার এক মাতাল বন্ধু এক বারবণিতার গৃহে তার থাকার বন্দোবস্ত কোরে দেয়। মেয়েটির নাম ঝুম্‌কো। সে সোনাকে ভালবেসে ফেলে। এক রাত্রে সোনা ঝুম্‌কোর বহু সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে জেল হয়। সোনাকে যখন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে একজন পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। হঠাৎ জমিদারের ওপর তার প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জাগে। রাইফেল হাতে সোজা চলে যায় নিজের গ্রামে। জমিদারের ঘরে ঢুকে তার চোখ উপড়ে নেয়। (সচেতন পাঠক পাঠিকা, এখনও হাসবেন না, ক্লাইম্যাক্সে এখনও যায় নি!) তারপর সোনা চলে যায় নিজের বাড়ির ঘরে। গিয়ে দেখে সে ঘরে রয়েছে সুমতি। সুমতির হাতে একটা সোনার বালা। বালাটা সোনার মায়ের। সোনার বাবা সুমতির বাবার কাছে একবার বন্ধক দিয়েছিল। রাইফেলটা মাটিতে রেখে সোনা সুমতির হাত থেকে বালাটা জোর কোরে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সুমতি 'চাষী মা' 'চাষী মা' বলে চিৎকার সুরু করে দেয়। ঘরে ঢোকে সোনার মা। সে বলে, ডাকাত ছেলেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মা হয়েও রাইফেল তুলে নিয়ে সোনাকে সে গুলী কোরে মেরে ফেলে।

নট্ট কোম্পানীর এ বছরের আড়ম্বরপূর্ণ পালা 'মা মাটি মানুষ'। 'বিবিধ ভারতী'তে প্রতি সপ্তাহে এর অভিনয়াংশ ও সংগীতাংশের বিজ্ঞাপন থাকে। এই পালার প্যাটার্ণ এবার দেখুন ঃ শিবনাথ এক গ্রাম্য চাষী। অবিবাহিতা সে তার ছোটো ভাই ইন্দ্রনাথকে প্রাণ দিয়ে

ভালবাসে। অনেক কষ্ট কোরে ছোট ভাইকে বি.এ. পাশ করায়। তার বিয়ে দেয়। স্ত্রী সাবিত্রী নেহাৎ গ্রাম্য ও মূর্খ। অবশ্য সুন্দরী। কিন্তু বিয়ের পর ইন্দ্রনাথ দাদা ও মায়ের মনে নিদারুণ আঘাত হেনে সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চাকরি করতে আসে। সে চাষী হলেও অসীম নামে তার এক বিরাট ধনী ব্যবসায়ী বন্ধু আছে, আশ্চর্য! অসীম ইন্দ্রনাথকে নিজের অফিসে নিয়োগ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর থাকার জন্য বাড়ি ঠিক কোরে দেয়। নিজের চাকরির উন্নতির জন্য ইন্দ্রনাথ জোর করে সাবিত্রীকে অসীমের সঙ্গে নানারকম পার্টিতে পাঠায়। সাবিত্রীকে ভদ্রসমাজের যোগ্য করে তুলবার জন্য অসীম তাকে নাচ-গান শেখায়, ইংরেজি শেখায়, মদ খেতে শেখায়। ধীরে ধীরে সাবিত্রী চৌকোশ হয়ে ওঠে। এক রাত্রে অসীম জোর কোরে সাবিত্রীর দেহভোগ করতে উদ্যত হয়। তখন ইন্দ্রনাথ হঠাৎ ঘুরে ঢুকে সেখান থেকে অসীমকে বিতাড়িত করে। সবই আজগুবি। ইন্দ্রনাথের শুভবুদ্ধি জাগে। সে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়। গ্রামে আবার দুজন আদর্শবান লোক আছে। একজন সরকারী বি.ডি.ও. এবং আর একজন যুবক কামাল। তারা সব সময় বলে যে, গ্রামের লোকেরা শহরে চলে যাচ্ছে বলেই দেশের এতো দুঃখ দুর্দশা। শহরের লোকেরা যদি গ্রামে আসতে শুরু করে, তবে সমস্যার সমাধান হবে। এমন প্রলাপ কোনো সুস্থ লেখকের কলম থেকে বেরোতে পারে? গত ৮/১০ বছরে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে গ্রামে বহু লোক না খেয়ে (সরকারী মতে, "অপুষ্টির ফলে") মৃত্যুবরণ করেছে। বহু ভূমিহীন চাষী সপরিবারে কলকাতায় এসে ভিক্ষুকে পরিণত হচ্ছে। এই অবস্থায় শহরের লোকেরা গ্রামে গিয়ে কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে?

সত্যম্বর অপেরার 'রাত্রি ও রমণী" গত বছর থেকে আসর জমাচ্ছে। এর কাহিনীটা এবার একটু শুনুন ঃ ধনীর ব্যারিস্টার-কন্যা সুদীপ্তা তার দরিদ্র স্বামী মণিময়কে ভালবাসে না। তাই সে বাপের বাড়ি থাকে, নাইট ক্লাবে যায়, একটা মাতাল লম্পটের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। ঘটনাচক্রে সুদীপ্তার হৃদয় পরিবর্তন হয়। সে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। আর ঠিক সেই সময়েই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মণিময় গলা দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এর উপ-কাহিনীটিও না বললে চলে না। মদ্যপ স্বামী বটুক তার স্ত্রী শ্রীমতীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েটিকে আশ্রয় দেয় কুলদাচরণ নামে এক অতি মহৎ ঘটক। পাড়ার রোয়াকবাজ ছেলে অচিন্ত্য শ্রীমতীকে দিদি বলে ডেকে তার গান শেখার ব্যবস্থা করে। শ্রীমতী গায়িকা হিসেবে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ইন্দর ও হাবুল নামে দুই গুণ্ডা একদিন অর্থের লোভে শ্রীমতীকে ভিলেন পিনাকী রায়ের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ গুণ্ডাদের বিবেক জেগে ওঠে। শ্রীমতীকে 'দিদি' সম্বোধন কোরে তারা তাকে পিনাকীর কবল থেকে রক্ষা করে। ব্যাপারগুলো ঘটে যায় ঠিক ম্যাজিকের মতো। এই সব কাহিনীর কোন সামাজিক ভিত্তি আছে কি?

এবারে আলোচনা করবো ভোলানাথ অপেরার 'সুপার-হিট' পালা "সিঁদুর নিও না মুছে।" শুনেছি গত বছর কোনো কোনো দিন এই পালাখানির ২৪ ঘন্টায় তিনবার পর্যন্ত

অভিনয় হয়েছে— বেলা ১২ টায়. সন্ধ্যে ৬ টায় এবং রাত ১২টায়। কি অসাধারণ চাহিদা তাহলে বুঝে দেখুন! কাহিনীটায় একটু চোখ বোলানো যাক ঃ তিন ভাই পঙ্কজ, পলাশ আর প্রণয়। গ্রামে থাকে। পঙ্কজ কলকাতায় ভাল মাইনের চাকরি করে। পঙ্কজের বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। তিন ভাইয়ের এক অন্ধ যুবতী বোন আছে। নাম চৈতালী। পঙ্কজের একার রোজগারে এতো বড় সংসার চলছে বলে তার স্ত্রী কুন্তলিকা মনে মনে অসুখী। সে চায় আলাদা হয়ে যেতে। কিন্তু পঙ্কজের ভাই-অন্ত প্রাণ। পলাশ কলেজে পড়ে, প্রণয় পড়ে ইস্কুলে। এদের মানুষ কোরে তুলতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির কোন উপায় না দেখে, পলাশ বৌদির দেহ-লোলুপ— এই রকম একটা মিথ্যে ব্যাপার কুন্তলিকা চক্রান্তের মাধ্যমে স্বামীর কাছে প্রমাণ কোরে দেয়। পঙ্কজ তখন স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় চলে যায়। গ্রামের মেয়ে নপুরের সংগে পলাশের বিয়ের কথা ছিলো। হাস্যকর ভাবে সে বিয়ে ভেঙে যায়। নুপুরকে বিয়ে করে নিয়ে যায় পলাশের বন্ধু বিনয়। পলাশ কলকাতায় গিয়ে হোটেলে একটা ছোটো চাকরি করতে থাকে। মা, চৈতালী, প্রণয় কলকাতার একটা বস্তিতে বাস করে। আসে চরম দারিদ্র্য। চৈতালী আর প্রণয় ভিক্ষেয় বেরোয়। শেষ পর্যন্ত অনুপম নামে এক মহৎ যুবক চৈতালীকে বিয়ে করে। বিয়ের আগে চোখের ডাক্তার পলাশের একটা চোখ অপারেশন কোরে তুলে নিয়ে চৈতালীর একটা চোখে বসিয়ে দেয়। পৃথিবীর কোথাও এ ধরণের চোখ অপারেশন না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের যাত্রাপালায় অনায়াসে তা হয়ে যায়। ভাই বোন দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠে দিব্বি এক চোখে দেখার কাজ সারে। ওদিকে পঙ্কজ নিজের ভুল বুঝতে পারে। কুন্তলিকাও মহৎ হয়ে যায়। তারপর আর কি, সকলে গ্রমের ফেরার পর মধুরেণ সমাপয়েৎ। নুপুর বিধবা হয়ে ফিরে আসে। বিয়ে হয় পলাশের সঙ্গে।

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, পালাগুলির মূলতঃ একই ভঙ্গি। এইসব পালাগুলি যারা লেখে, তারা হয় অশিক্ষিত, নয় অর্ধ-শিক্ষিত। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-চেতনা এদের নেই। এরা জানে না, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্ব কি, তার দুর্বলতা কোথায়, সবলতা কোথায়, সামাজিক শক্তিগুলি কিভাবে ক্রিয়া করে, কোন্ শক্তি বর্ধিষ্ণু, কোন্‌টা ক্ষয়িষ্ণু। সমাজের সত্যরূপ আবৃত-কোরে-রাখা মাটির সম্পর্কচ্যুত এইসব যাত্রাপালা গ্রামে-গঞ্জের লক্ষ লক্ষ মানুষের রুচিবিকার ঘটাচ্ছে। এইসব নাটক পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল। প্রায় নাটকেই গুণ্ডা আছে, বদমাইশ আছে, মস্তান আছে, ক্যাবারে গার্ল আছে। আছে অবাস্তব শ্রেণী সমঝোতার কথা, হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তনের কথা, ভিত্তিহীন ন্যায়ধর্ম ও মানবতার কথা। আর একটা যা আছে তা বাহ্যতঃ বেশ গুরু-গম্ভীর, কিন্তু আসলে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। অনেক নাটকের শেষ দৃশ্যে গুণ্ডা-বদমাইশদের অকস্মাৎ বোধোদয় হয়। তারা চিৎকার কোরে বলে তারা সুস্থ ভাবে বাঁচতে চেয়েছিলো— মানুষ হতে চেয়েছিলো— কিন্তু এই সমাজ তাদের মানুষ হতে দেয়নি— এই সমাজই অপরাধী। কিন্তু গোটা সমাজটাই কি অপরাধী? তাদের মানুষ হবার পথের প্রতিবন্ধক কি গোটা সমাজটাই? এই সব নাটকে সমাজের মূল গলদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় না,

প্রগতির আসল শত্রুদের চিনিয়ে দেওয়া হয় না। কেবল প্রগতিশীল ছাপের লোভে নাটকের শেষ দৃশ্যে ঐসব বড়ো বড়ো বুলি আওড়নো হয়। এ এক মস্ত ফাঁকিবাজি। শুধু একটি মাত্র দল সুস্থ নাটক করে। দলটির নাম তরুণ অপেরা। যদিও এদের বৈপ্লবিক পালাগুলিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষণীয়, তথাপি যাত্রার সুবিস্তৃত অপসংস্কৃতির সমুদ্রে এদের প্রচেষ্টা কয়েক বিন্দু মিঠে জলের স্বাদ এনেছে। এই কারণে এরা জনগণের ধন্যবাদার্হ।

তরুণ অপেরার শান্তিগোপাল "হিটলার" প্রযোজনার পর থেকে যাত্রা জগতে একটি নতুন, সুস্থ ও বলিষ্ঠ ধারার প্রবর্তন করেন সন্দেহ নেই। "হিটলার", "লেনিন", "কার্লমার্কস", "মাও সে তুঙ" প্রভৃতি পালাগুলি তিনি যাত্রার আসরে নামিয়েছেন। যাত্রাজগতের তথাকথিত সামাজিক পালার মতো এই সব পালাগুলি সমাজ-বিরোধী নয়। তবে পালাকারের সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবে এই পালাগুলি হয়েছে অনেকাংশই নিষ্প্রভ। সমাজে ফ্যাসিবাদ কেন আসে, কখন আসে, ফ্যাসিবাদের স্বরূপ কি, এটা কেন ক্ষয়িষ্ণু— "হিটলার" নাটকে এসব বিষয়গুলির ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হয়নি। হিটলার হয়ে গেছে একটা হিংস্র, অত্যাচারী উন্মাদের চিৎকার ও লম্ফঝম্প। "কার্ল মার্কস" পালাখানিও একই ভাবে ত্রুটিপূর্ণ। যে কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও গতি-প্রকৃতির রহস্য উদঘাটিত কোরে মানবেতিহাসের গতি পরিবর্তন কোরে দিয়েছেন, আমরা কি পালাখানিতে সেই কার্ল মার্কসকে পাই? মার্কস বিচার বিশ্লেষণ কোরে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার দুর্বলতা কোথায়, তার ধ্বংসের বীজ কোথায় নিহিত, বিপ্লব ছাড়া কেন সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যায় না, বিপ্লব করতে হলে কেন প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর সাচ্চা পার্টির। এই জন্যই কার্ল মার্কস স্বয়ং পার্টি গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেই পার্টি গড়ার ব্যাপারে তিনি এবং তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস্ যে Communist Manifesto রচনা করেছিলেন, তা আজও শ্রমিক শ্রেণীর জীবনবেদ হয়ে রয়েছে। অথচ আশ্চর্য, কার্ল মার্কস্ সম্বন্ধে এই সব মূল কথাগুলি যাত্রাপালায় নেই। এই পালায় আমরা যাঁকে দেখি তিনি হলেন দারিদ্র্য-জর্জরিত একজন অসহায় বৃদ্ধ— যাঁর পারিবারিক জীবন দুঃখে বিষময়। তাঁর রুটি কেনার সামর্থ নেই, কাগজ সংগ্রহের পয়সা নেই, শীতের কোট নেই। তাঁর যুবতী মেয়ে অভিনেত্রী হয়ে গেছে বলে তিনি বেদনায় মুহ্যমান। বিপ্লবী কার্ল মার্কসের মধ্যে ফুটে উঠেছে দরিদ্র অসহায় এক বাঙালী মধ্যবিত্তের ছাপ। বিক্ষিপ্তভাবে বিপ্লবের দু'একটা কথা বা প্যারী কমিউনের দু'একটা দৃশ্যের অবতারণা থাকলেও তাতে নাটকের মূল পরিবেশের কোন হেরফের হয়নি। কার্ল মার্কসের সত্যকার ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র আগাগোড়া চাপা পড়ে গেছে। নিজের ভূমিকাটিকে মুখ্য রেখে পালাগুলিকে "one man show"-তে পরিণত করার একটা ক্ষতিকর ঝোঁক শান্তিগোপালের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এই ঝোঁকের জন্য গত বছর থেকেই তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে। নতুন ধরনের পালা নামাতে না পারলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়বেন।

আসল কথা, যাত্রাজগতের পালাকারদের মধ্যে একমাত্র উৎপল দত্ত ছাড়া, আর কারোর রাজনৈতিক জ্ঞান নেই। ফলে তারা কেউ সমাজ বিশ্লেষণ করতে পারে না। তারা কতগুলি বস্তাপচা, গতানুগতিক, পান্‌সে গল্প বানায়, যেগুলির সঙ্গে সমাজের নাড়ির যোগ নেই। এই সব যাত্রাপালায় গ্রামগঞ্জের সরল অশিক্ষিত লোকদের কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে থাকে। আর থাকে কতগুলি মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়ে তাদের চোখের জলে ভাসাবার একাধিক মামুলী প্যাঁচ। খুব বড়ো গলা কোরে বলা হয় যে, একশত বছর ধরে আমাদের যাত্রাপালাগুলি ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় দেখিয়ে দেশবাসীর নৈতিক মান উন্নত রেখেছে। ব্রিটিশ আমলে কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা ছিল। অনেক যাত্রাপালায় তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুর ধ্বনিত হয়েছে, জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু বর্তমানে কথাটা পুরোপুরি ধাপ্পা। দেশের নৈতিক মান আজ যে রসাতলে ডুবে গেছে, সে কথাটা বোঝার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না। আজ চতুর্দিকে শঠতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, কদর্যতা, গ্লানি আর দুর্নীতি। পালাকারদের যদি রাজনৈতিক জ্ঞান থাকতো, তবে তারা বুঝত যে, অধর্মকে পরাজিত কোরে ধর্মের জয় আপনা আপনি হয় না। তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণকে কংস বধ করতে হয়েছিল, অর্জুনকে কৌরব ধ্বংস করতে হয়েছিল, লেনিনকে জার এবং মাও সে তুংকে চিয়াং-চক্র নির্মূল করতে হয়েছিলো। দেব-দানবের বিরোধ সমাজে আজও চলেছে। এই দুই শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পালাকারকে বুঝে নিতে হবে, সমাজে দেবতা কারা এবং দানব কারা। সেটা বুঝে লেখনী চালনা করতে হবে। তা না হলে সবটাই হবে পণ্ডশ্রম। তা না হলে পালা রচনা হবে লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানোর নামান্তর। রাজনীতি বাদ দিয়ে আজকের যুগে কারও পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব নয়।

যাত্রাজগতে যে এমন ব্যাপক হারে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তার প্রধান কারণই হলো পালাকার ও প্রযোজকদের ঐ রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব। কায়েমী স্বার্থ এটাই চায়। কায়েমী স্বার্থ চায় না, যাত্রাপালা দেখে দেশের লোকের রুচি উন্নত হোক, তারা নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠুক, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়ুক, তারা সমাজের-স্বরূপ বুঝতে শিখুক, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাক। কায়েমী স্বার্থ চায় জনসাধারণ মোহগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারে থাকুক; যাত্রাপালা দেখে তারা অলস হাসি হাসুক, অলস কান্না কাঁদুক। তাইতো দেখি কোন এক বুর্জোয়া কাগজের জনৈক ধুরন্ধর যাত্রাজগতের পাণ্ডা হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে, "সাবধান! যাত্রায় রাজনীতি এনো না। রাজনীতি ঢুকলেই পবিত্র যাত্রাপালা অপবিত্র হয়ে যাবে। যাত্রায় যারা রাজনীতি ঢোকাতে চাইছে, তারা চক্রান্তকারী।" এ কণ্ঠস্বর খুব চেনা। দেশে দেশে যুগে যুগে এ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আজ জনগণকেই বুঝে নিতে হবে, চক্রান্তকারী আসলে কারা।

যাত্রাজগতের অপসংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে আজ আমাদের সরকার বাহাদুরও বদ্ধপরিকর। মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই রাতারাতি যাত্রা-প্রেমিক বনে গেছেন। সকলেই যাত্রার

পৃষ্ঠপোষক। রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীদের সঙ্গে যাত্রা-মালিকদের গাল-ভরা আলোচনা সভাও মাঝে মাঝে বসে। সরকারী উদ্যোগে বড়ো বড়ো যাত্রা-উৎসবও হয়— রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে, রবীন্দ্র সদনে। আর বশম্বদ সাংবাদিকেরা তখন প্রায় প্রতিটি অর্থহীন পালার গগন-স্পর্শী প্রশংসা প্রকাশ করে বুর্জোয়া পত্রিকার পাতায়। মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধি শাসকবর্গের শ্রেণীস্বার্থবোধ বেশ প্রখর। জনগণের বিপ্লবী চেতনা ভোঁতা কোরে তাকে বিপথে চালিত করবার সব বন্দোবস্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে এরা কখনও কুণ্ঠিত হয় না। সরকার এবং বুর্জোয়া পত্রিকা— এরা উভয়েই অন্তঃসারশূন্য যাত্রাপালার পৃষ্ঠপোষকতা কোরে চলেছে। যাত্রাপালার বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই আজ এতো দেউলিয়াপনা। তাই তাদের এক একটি বিজ্ঞাপনও এই দেউলিয়াপনার চরম নিদর্শন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সত্যম্বর অপরোর "আঁধারে আলো" পালাখানির বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। সেখানে বলা হয়েছে— মঞ্চের ওপর চক্ষু অপারেশনের দৃশ্য যাত্রাপালায় প্রথম; এটা যেন এক বিরাট কৃতিত্ব। শিল্পকলা উপভোগের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জীবনবোধ প্রখরতর করে। যাত্রাপালায় চক্ষু অপারেশন দেখতে শুধু বোকারাই ছুটতে পারে। পেশাদার যাত্রা-মালিকরা এই ভাবে দেশের লোককে বোকা বানাচ্ছে।

চমক আরো আছে। আনন্দবাজারের যাত্রা সংবাদের স্তম্ভে একদিন দেখা গেলো একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। মফস্বল শহরের কোনো এক যাত্রার আসরে 'আঁধারে আলো'র চক্ষু অপারেশন দৃশ্যটি দেখার সময় জনৈক দর্শক উত্তেজনায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে। তার নাম ধামও গোপন রাখা হয় নি। জ্ঞান ফিরে পাবার পর ডাক্তার তাকে আসরে যেতে বারণ করে। কিন্তু সে ডাক্তারের নিষেধ শোনে নি। এমন যাত্রাপালা না দেখে থাকা যায়? আমাদের দেশের শিক্ষাদীক্ষার মান যে কতো অনুন্নত, সাংস্কৃতিক রুচি কতো স্থূল, এই বিজ্ঞাপন-ধর্মী সংবাদটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বুর্জোয়া কাগজের এই ধরণের প্রচারের পিছনে যে গূঢ় শ্রেণীস্বার্থ কাজ করছে, সাধারণ মানুষ তা বোঝে না বলেই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ এতো গলদ।

যাত্রা জগতের এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাহলে কি সংগ্রামের কোনো উপায় নেই? আছে। এবং খুব ভালো উপায়। পশ্চিমবঙ্গে কম কোরে অন্তত চার হাজার গ্রুপ থিয়েটার নাটক নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এক বছরে সারা রাজ্য জুড়ে শত শত নাট্যকারের শত শত নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। একটা বিপুল আশার কথা এই যে, যাত্রাজগতকে অপসংস্কৃতি কব্জা কোরে ফেললেও থিয়েটার জগতে অপসংস্কৃতি পরাস্ত। এখানকার অনেক নাটকই জীনমুখী, প্রগতিবাদী। এসব নাটকে সমকালীন জীবনকে বিশ্লেষণ কোরে দেখানো হয়। তাই এখানে শুনতে পাই সংগ্রামের সুর, পচা-গলা সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টাবার সুর, মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থানের সুর। থিয়েটার জগতে শতকরা একজন নাট্যকার "বারবধূ"র মত নোংরা নাটক লেখে এবং শতকরা একটি দল সে নাটক অভিনয় করে। এটা বিশেষ একটা সমস্যা নয়, কেননা শত শত দলের নাট্যাভিনয়ে রয়েছে সুস্থ জীবনের জয়গান। এইসব দলগুলিকে আজ সংঘবদ্ধভাবে যাত্রাপালার

প্রযোজনায় হাত লাগাতে হবে। নাট্যকারদের লিখতে হবে যাত্রাপালা। গ্রুপ থিয়েটারগুলি সর্বদাই সংকটের মধ্যে দিন কাটায়। শহরাঞ্চলে মঞ্চ ভাড়া কোরে বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিনয় করা অত্যাধিক ব্যয়সাপেক্ষ। বছরে অতিকষ্টে দুটোর বেশি অনুষ্ঠান তারা কোরে উঠতে পারে না। টিকিট বিক্রী হয় না, অনুষ্ঠানের খরচ ওঠে না, দেনা হয়ে যায়। গ্রামে-গঞ্জের লোকেরা থিয়েটারের প্রতি উদাসীন, তাই থিয়েটারের বায়না হয় না। মঞ্চ তৈরীর অনেক হাঙ্গামা, আর তাছাড়া উন্মুক্ত যাত্রামঞ্চের চারদিকে ব'সে চড়া পর্দায় বাঁধা যাত্রাভিনয় দেখে সাধারণ মানুষ যতোটা মুগ্ধ হয়, থিয়েটার দেখে তার সিকি ভাগও মুগ্ধ হয় না। তাই গ্রুপ থিয়েটারগুলি যদি যাত্রার সাধনায় লেগে যায়, তাহলে একটা বিরাট কাজ হবে। তারা বায়না পাবে প্রচুর। তাদের আর্থিক সংকট অনেকাংশে দূর হবে। টিকিট পুশ কোরে অভিনয় করতে হবে না। পর পর তিনখানা যাত্রানাটক কোনো দল যদি প্রযোজনা করে, তবে একটা লেগে যাবেই। তখন লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তারা তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারবে। পেশাদার যাত্রাদলের চেয়ে গ্রুপ থিয়েটারের যাত্রাদল অনেক কম টাকায় অনুষ্ঠান করতে পারবে বলে তার চাহিদা হবে অসাধারণ। ফলে প্রত্যেক শিল্পীকে কিছু কিছু হাত খরচও দেওয়া যাবে। এতে দলের স্থায়িত্ব বাড়বে। এটা কল্পনাবিলাস নয়, পরীক্ষিত সত্য। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের যাত্রাপালা "রাহুমুক্ত" একদা যাত্রাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। গ্রামে গঞ্জের লোকেরা সে পালায় পেয়েছিলো নতুন স্বাদ। নামকরা হাটে বাজারে যেখানে চিরকাল কলকাতার পেশাদার যাত্রাদলের যাত্রা হতো, সেখানে স্থান করে নিয়েছিলো গণনাট্য সংঘ।

অথচ যাত্রার বাজার তখন এতো ভালো ছিলো না। জনসাধারণের সুস্থ চেতনা কখনো মরে যায় না। নানা প্রতিকূল অবস্থায় তা সুপ্ত থাকে মাত্র। বলিষ্ঠ রসোত্তীর্ণ পালা পরিবেশন করতে পারলে, সেই সুপ্ত চেতনা জাগ্রত করা যায়। ছিন্ন করা যায় অপসংস্কৃতির কুৎসিৎ ঘেরাটোপ। এর জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, জোরদার সংগঠন। আশাকরি বিষয়টি সম্পর্কে গ্রুপ থিয়েটারগুলি গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন।

অনীক, মার্চ, ১৯৭৫

উত্তর

সব্যসাচী দেব

মনে আছে?
কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ ঝুঁকে পড়েছিলো জঙ্গলের ওপর,
গোড়ালিতে স্রোতের কামড়,
দীর্ঘ বালুচর ঝক্‌ঝক্‌ করছিলো বল্লমের মতো।
সুবর্ণরেখা পেরিয়ে
হাট-ফেরৎ দেহাতী জনের পাশে পাশে
হেঁটে এসেছিলো তারা;
ঘর গৃহস্থালী, প্রিয় পদাবলী ফেলে রেখে,
ফেলে রেখে গার্হস্থ্য সংসারের টুকিটাকি,
আর খরার নীচে জ্বলে যাওয়া সময়।

তারা এসেছিলো।

শুকনো পাতার আগুন জ্বালিয়ে ডেকেছিলো— কমরেড!

এখন আপাত-শ্মশান স্তব্ধতায় পড়ে আছে
গ্রাম, জনপদ, অরণ্যের সীমা;
হাইওয়ের বুক চিরে দৌড়োয় মিলিটারী কনভয়।

কার্তিকের হিম সন্ধ্যায় কেঁপে ওঠে আকাশপ্রদীপ।

তিন মানুষ উঁচু পাঁচিলের পেছন থেকে তারা এখন
দেখে নেয়
প্রিয় আকাশ,
আর জেলখানার অন্ধকার থেকে
প্রিয়তর মানুষকে ছুঁড়ে দেয় প্রশ্ন—
মনে আছে?

ক্রমশঃ আঙুল জড়িয়ে ধরে রোদ আর বিষাদ—
মনে আছে।।

অনীক, মার্চ, ১৯৭৫

সম্পাদকীয়

কাম্বোদিয়ার মুক্তিসূর্য

সমগ্র দুনিয়ার জনগণ আজ চেয়ে আছেন কাম্বোদিয়ার দিকে। সেদেশের বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে আর দেশপ্রেমিক ব্যাপক জনতার মনে মনে আজ মুক্তিসূর্যের রক্তিম দীপ্তি, আকাশে আকাশে উড়ছে স্বাধীনতার রক্তলাল নিশান। পাঁচ বছরের অবিচল জনযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে প্রবল-পরাক্রম মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালাল শাসকচক্র আজ বিধ্বস্ত, পর্যুদস্ত, পলাতক। নোতুন ইতিহাসের মূর্ছনা আজ সেদেশের কোণে কোণে, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তরে তার অনুরণন। হাজার হাজার মাইল দূরের দেশ এই ভারতের বুকে বসে মুক্তির রক্তিম স্বপ্ন হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে আমরাও জানাই রক্তিম অভিনন্দন বিজয়ী কাম্বোদিয়াকে, জানাই লাল সেলাম।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ১৯৭০ সালের বিশে মে কাম্বোদিয়ার জনগণের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে মহান নেতা মাও সেতুং পরম আস্থা নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে বাইরে থেকে দেখে বিরাট দৈত্য বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এটা একটা কাগুজে বাঘ, মৃত্যুশয্যায় কোনোরকমে বাঁচবার তাড়নায় লড়াই চালাচ্ছে। আজকের দুনিয়ার কে আসলে কাকে ভয় করছে? মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনামের জনগণ ভয় পান না, লাওসের জনগণ পান না, কাম্বোদিয়ার জনগণ পান না, প্যালেস্টাইনের জনগণ পান না; আরবের জনগণ পান না— পৃথিবীর কোনো দেশের জনগণই তাদের ভয় পান না। বরং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদই দুনিয়ার জনগণকে ভয় পায়, বাতাসে পাতা নড়ার শব্দেই সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অসংখ্য বাস্তব ঘটনা এটাই প্রমাণ করেছে যে, যে কোনো ন্যায়সঙ্গত কাজই ব্যাপক সমর্থন লাভ করে, এবং যে কোনো অন্যায় কাজ পেয়ে থাকে সামান্যতম সমর্থন। একটি ছোটো দেশও একটি বড়ো দেশকে হারিয়ে দিতে পারে। একটি ছোট্টো দেশের জনগণও যদি সাহসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য রুখে দাঁড়ান, এবং অস্ত্র তুলে নেন, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতেই তুলে নেন, তবে একটি বৃহৎ দেশের আক্রমণকেও তারা প্রতিহত করতে পারেন।" কাম্বোদিয়ার বিজয়ী জনতা চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের এই ভবিষ্যৎবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ কোরে দিয়েছেন, দুনিয়ার জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন সঠিক লাইন, সঠিক রণনীতি ও সঠিক রণকৌশলের ভিত্তিতে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কোরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজয় অর্জনের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

কাম্বোদিয়ার দুনিয়ার জনগণের সাধারণ শত্রু দুই বৃহৎ শক্তির অন্যতম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই শুধু পর্যুদস্ত হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে উদঘাটিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়ানো অপর বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদেরও কুৎসিৎ দু'মুখো প্রতিবিপ্লবী চরিত্র। আবার একই সঙ্গে কাম্বোদিয়ার মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসেবে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের ভূমিকাটিও। এক কথায়, কাম্বোদিয়ার কষ্টিপাথরে দুনিয়ার জনগণ আজ প্রকৃত শত্রু ও প্রকৃত মিত্রের ব্যবধান রেখাটি আরও বেশি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, সুস্পষ্টভাবে চিনে নিতে পারছেন আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্বটিকে— অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির দ্বন্দ্বটিকে।

ভারতের কোটি কোটি জনতা আজ নির্মম ও নিপীড়নের এক দুঃস্বপ্নের রজনীর মধ্যে সময় কাটাতে কাটাতে বিপুল আবেগে আর গভীর উচ্ছ্বাসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কাম্বোদিয়ার জীবনে উদিত মুক্তিসূর্যকে, আকাশে আকাশে উড্ডীয়মান রক্তলাল নিশানকে, ভারতের বুকেও কাম্বোদিয়া গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন তারা মনে মনে। প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্ত ছলা কলা চক্রান্তকে বিধ্বস্ত কোরে দিয়ে নম্‌পেনের পতন ঘটেছে, ভিয়েতনামের দুর্ভেদ্য দুর্গ সায়গনও আজ কেঁপে উঠছে মুক্তিযোদ্ধাদের আগ্নেয় আঘাতে। ভারতের কোটি কোটি জনতার কাঁধের ওপর সিন্দবাদ নাবিকের মতো চেপে থাকা শোষণ ও বঞ্চনার জগদ্দল পাথরটিকে যদি উপড়ে ফেলতে হয়, তবে ভারতীয় জনগণকেও আজ যথোপযুক্ত শিক্ষা নিতে হবে কাম্বোদিয়া-ভিয়েতনামের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে, তার সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে হবে ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিকে মনে রেখে। একমাত্র এভাবেই চূড়ান্ত মুক্তির পথে অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন ভারতের কোটি কোটি জনতা — এবং সেটাই হবে কাম্বোদিয়ার বিপ্লবী জনতার প্রতি ভারতের জনতার সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারক-উপহার।

অনীক, এপ্রিল-মে, ১৯৭৫

ভারতের সিকিম গ্রাস

অবশেষে যা প্রত্যাশিত ছিলো, ঠিক সেটাই ঘটলো। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকচক্র 'আশ্রিত রাজ্য', 'সহযোগী রাজ্য' ইত্যাদির সাইনবোর্ডগুলিকে খুলে নিয়ে সিকিমের গলায় এবার ঝুলিয়ে দিলো 'অবিচ্ছেদ্য অংশ''-শীর্ষক সাইনবোর্ডটি— আপাততঃ সাঙ্গ হলো ভারতের সিকিম-গ্রাস পালা!

হিমালয়ের বুকে ছোট্ট একটি দেশ সিকিম। গত শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সেটা ছিলো একটা স্বাধীন দেশ। গত শতকের মাঝামাঝি থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাণিজ্যিক তথা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সিকিমকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চক্রান্ত শুরু করে, এবং অবশেষে ১৮৯০ সালে এক অসম চুক্তির ফাঁস গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সিকিমকে নিজেদের 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারতের রাজনৈতিক শাসনের ভার ছেড়ে চলে যাবার পর 'সদ্য স্বাধীন দেশ' ভারত কিন্তু সিকিমকে স্বাধীনতা দেয় নি, বরং নেহরুর বিশাল ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে কার্যকরী করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'স্থিতাবস্থা' বজায় রেখে সিকিমকে 'আশ্রিত রাজ্য' হিসেবেই রেখে দেয়। তারপর ১৯৫০ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়েও বেশি অসম এক চুক্তিতে সিকিমকে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে। ১৯৭৫ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিলো, এবং সিকিমের সামন্ততান্ত্রিক শাসক চোগিয়াল থেকে শুরু কোরে দেশপ্রেমিক ছাত্র যুবক ও সচেতন মানুষেরা ক্রমশঃই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাচ্ছিলো। স্বভাবতঃই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তাতে প্রমাদ গুণেছিলো এবং নোতুনতর চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করেছিলো। তারই পরিণতিতে ভিয়েতনামের দিয়েম-থিউর মতো, কাম্বোদিয়ার লন নল সিরিক মাতাকের মতো, বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমানের মতো সিকিমেও গজিয়ে উঠেছিলো 'জনগণের প্রতিনিধি' কাজী লোণ্ডুপ দর্জি— ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নির্লজ্জ দালাল চক্র। নয়া দিল্লী-মার্কা মহান গণতান্ত্রিক দর্জি সম্পূর্ণ 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে নিজের দেশকে, দেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে ও স্বাধীনতাকে ভারতীয় প্রভুদের পায়ের তলায় সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিয়ে তার দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালো— এবং সিকিমের 'জনগণের প্রতিনিধি' দর্জির অনুরোধে ভারত সরকার 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও' সিকিমকে আজ ভারতের 'অঙ্গরাজ্যে' পরিণত করতে চলেছে। পূর্বসূরী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যা পারে নি, পিতা জওহরলাল নেহরু যা পারে নি, ইন্দিরা গান্ধী আজ সেটাই সম্ভব করলো— ভারত সিকিমকে

পুরোপুরি গ্রাস কোরে ফেললো। ধন্য ইন্দিরা গান্ধী— ধন্য এশিয়ার মুক্তিসূর্য! দাবী উঠেছে, সিকিম নাকি চিরকালই ভারতের 'অংশ' ছিলো, তার নাকি কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিলো না কোনোদিন। ইতিহাস ধর্ষণের এমন নজির হিটলার ডালেস-ব্রেজনেভরাও সম্ভবতঃ দিতে পারে নি। আর সিকিম বৃটিশ-ভারতের নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিলো— এই জলদস্যুসুলভ যুক্তিকেই যদি মেনে নিতে হয়, তবে বার্মা-সিংহল-আফগানিস্থানকেও (পাকিস্তান-বাংলাদেশ তো বটেই!) কি ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে দাবী করতে হয় না? অবশ্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এই যুক্তিতে ওইসব দেশগুলিকেও 'অবিচ্ছদ্য অংশ' বানাবার চেষ্টা করলে অবাক হবার সত্যিই কিছু থাকবে না!

দাবী করা হচ্ছে, সিকিমের জনগণ 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' ভারত ভুক্তির পক্ষে 'ব্যাপক সমর্থন' জানিয়েছে। ভারতবর্ষের গত কয়েকটি নির্বাচনে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি'র যথেষ্ট প্রমাণ কি আমরা পাই নি? থিউ-র ভিয়েতনামে, লন নলের কাম্বোদিয়ায়, শেখ মুজিবের বাংলাদেশে কীভাবে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' কাজ করে, তা কি আমরা দেখি নি? সিকিমে সাড়ে তিন ব্যাটেলিয়ান সিআরপি মজুত রেখে, ভারতীয় চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কোরে, সিকিমের দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকদের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী সমস্ত প্রচার ও বিক্ষোভের কণ্ঠরোধ কোরে গণতন্ত্রের যে হদ্দোমুদ্দো সেখানে দেখানো হয়েছে, তথাকথিত গণ ভোটের তিনদিন আগে থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ কোরে দিয়ে ভারতীয় গোয়েবলস্‌দের প্রচারের মহিমায় চারদিক আচ্ছন্ন কোরে দিয়ে যে খেল্‌টা খেলানো হলো— ন্যূনতম চেতনাসম্পন্ন মানুষ কি সুস্থ মস্তিষ্কে তা মেনে নিতে পারবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, অতোটুকু দেশ সিকিম দখল কোরে ভারতের কী লাভটা হবে? এ প্রশ্নেরও উত্তর মিলে যাবে ভারতের সিকিম-গ্রাসের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক তথা মদৎদার রুশ নয়া জারদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের কথা মনে রাখলেই। আজকের দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের মহান দুর্গ সমাজতান্ত্রিক চীনকে ঘিরে ফেলার একটা চক্রান্ত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। আজ দুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিণীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ নয়া জাররা একই উদ্দেশ্যে মার্কিণীদের চীন-বিরোধী চক্রান্তের ব্লু-প্রিন্টটাকেই কার্যকরী করতে চাইছে। সেকারণেই চীনের চারদিকের সমস্ত দেশগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে বা এই চীন-বিরোধী চক্রান্তে তাদের প্রধান ঘাঁটি ভারতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে চাইছে। আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, সিকিম প্রভৃতি চীনকে ঘিরে ফেলার সেই জঘন্য চক্রান্তেরই এক একটা দাবার ঘুঁটি। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা রুশ নয়া জারদের প্রসাদপুষ্ট হয়ে সেই কুৎসিৎ চক্রান্তকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মাত্র।

কিন্তু ইতিহাস বড়ো নির্মম। এই মুহূর্তে কাম্বোদিয়ার আকাশে আকাশে উড়ছে মুক্তির

উজ্জ্বল পতাকা, সায়গনের সুরক্ষিত দূর্গগুলি মুক্তিযোদ্ধাদের কামানের গোলার ঘায়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লন নল থিউরা পরিত্রাণ পায়নি, কাজী দর্জিরাও পাবেনা— মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ তথা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদও চোখের সামনে দেখতে পাবে— ভারত-সহ দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট হয়ে সিকিমের দেশপ্রেমিক জনগণ বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের আগ্নেয় আঘাতে তাদের সমস্ত ছলাকলা, ক্ষমতার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত আগ্রাসী স্বপ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ কোরে দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন। সেদিনের বেশি দেরী নেই, থাকতে পারে না। প্রতিটি প্রগতিশীল ভারতীয়েরই আজ তাই দায়িত্ব হবে ভারতের সিকিম-গ্রাসের বিরুদ্ধে জমায়েত হওয়া, সিকিমের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দুই জনগণের সাধারণ শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পথে এগিয়ে যাবার বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সিকিম কি ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' ?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া জুতোটা পায়ে গলিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকচক্র আজ দাবী করছে যে, সিকিম নাকি চিরকালই ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' ছিলো। তাদের মতে ১৮৯০ সালে সম্পাদিত চীন সরকার ও ভারতের বৃটিশ সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে, সিকিম নাকি ভারতেরই 'অংশ' ছিলো। বাস্তব তথ্য কিন্তু মোটেই সেকথা প্রমাণ করে না।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সিকিম ছিলো একটি স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিলো সেই দেশের ওপর। এ-সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'Bengal under the Lieutenant-Governors'-এ বলা হয়েছে ঃ ভারতের "**সীমান্তের বাইরের** পাহাড়ী জাতিগুলির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই অবলম্বিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাদের ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার পর **ভেতর থেকে** তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার কর্মনীতি গৃহীত হয়েছিলো।" (পৃঃ ৯০৬)। গ্রন্থটির আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতের 'সীমান্তের বাইরের' (অর্থাৎ ভারতের বহির্ভূত) এই সব দেশগুলির মধ্যে সিকিম ছিলো অন্যতম, বাইরে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরেই 'ভেতর থেকে' তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্ত শুরু হয়।

ওই গ্রন্থের ৬৫০ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে ঃ "১৮৭৩-৭৪ সালের শীতকালে স্যার জে. এডগ্যার সিকিম থেকে ঘুরে এসে **সেই দেশ** সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহদীপ্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি রিপোর্ট পেশ করেন।" তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের একটা ভালো রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে ঠিক হয় : তিব্বত পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরী হবে ভারতের সংগে "বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিশিষ্ট ও সাহায্য করতে ইচ্ছুক" সিকিমের মধ্যে দিয়ে। বৃটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যেখানে সিকিমকে 'সেই দেশ' বলে অভিহিত

করছেন, সেখানে কীভাবে তাকে 'ভারতের অংশ' বলা যায়? আর সিকিম ভারতের অংশ হলে তাকে **"বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কবিশিষ্ট ও সাহায্য করতে ইচ্ছুক"** একটি দেশ হিসেবেই বা কীভাবে অভিহিত করা চলে?

ওই একই গ্রন্থের ৮৪৪-৮৪৫ পৃষ্ঠায় ১৮৯৪ সালের সিকিম গেজেট থেকে উদ্ধৃত কোরে বলা হয়েছে যে, সিকিমের রাজাকে যখন বৃটিশরা ১৮৮৭ সালে আলোচনার জন্য দার্জিলিঙে আসার আহ্বান জানিয়েছিলো, তখন তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন : "তিনি ও তার দেশের লোকেরা ১৮৮৬ সালে সম্পাদিত একটি চুক্তি অনুসারে চীন ও তিব্বতের অধীন। কাজেই তিব্বত সরকারের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া তিনি দার্জিলিঙে আসতে পারছেন না।" এ থেকেও ধরা পড়ছে যে, সিকিম মোটেই ভারতের অংশ ছিলো না, এমনকি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিতেও সে বাধ্য ছিলো না।

ওই গ্রন্থের ৮৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এভাবে বৃটিশরা যখন সিকিমকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজ আদায় করতে পারলো না, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, "হয় সিকিমকে চিরকালের মতো তিব্বতের একটি প্রদেশ হিসেবে মেনে নিতে হবে, অথবা আমরা যদি সেটা মেনে নিতে রাজি না থাকি, তবে **স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সিকিম দখল করতে হবে।**"

ওপরের তথ্যগুলি থেকে যে সিদ্ধান্তটি সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে, তা হচ্ছে এই যে, সিকিম ভারতের 'অংশ' ছিলো না; নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে এবং সিকিমে তিব্বতের তথা চীনের প্রভাব ঠেকাবার অজুহাতে বৃটিশরা সিকিম দখল করতে এগিয়ে গিয়েছিলো, এবং তৎকালীন চীন, নেপাল ও সিকিম তাদের দুর্বলতার জন্য বৃটিশকে বাধা দিতে পারে নি; এবং এভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সিকিম দখল করেছিলো এবং চাপিয়ে দিয়েছিলো ১৮৯০ সালের অসম চুক্তি, যার ফলে সিকিম ভারতের 'একটি অংশে' পরিণত হয়েছিলো।

অনীক, এপ্রিল-মে, ১৯৭৫

জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সম্পর্কে

গত ২রা এপ্রিল কলকাতায় শাসকদল কংগ্রেসের ঝটিকাবাহিনী ছাত্র পরিষদ কর্তৃক 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে জয়প্রকাশজীর সভা বানচাল করার ঘটনা এবং এর বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ জয়প্রকাশজীর আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক মানুষের একেবারে সামনাসামনি এনে দিয়েছে। জয়প্রকাশজীর পশ্চিমবঙ্গীয় অনুগামীরা এতদিন পর্যন্ত জয়প্রকাশজীর নির্দেশিত পন্থায় পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন হালে পানি পাচ্ছিলেন না, তখন ২রা এপ্রিলের ঘটনা তাদের সামনে শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এ রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতেই জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের বিস্তৃতির সম্ভাবনাকে বেশ উজ্জ্বল কোরে তুলেছে। স্বভাবতঃই এমতাবস্থায় জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সম্পর্কে নোতুন কোরে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করছে। এ রাজ্যের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের সামনেও এ আন্দোলন সম্পর্কে একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ধরা পড়বে, ইন্দিরা সরকারের 'গরীবী হটাও' স্লোগানের ভাঁওতাটা এদেশের ব্যাপক মেহনতী মানুষের কাছে আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনাহারে-অর্ধাহারে শোষিত এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের ও দমনের নির্মম পেষণে নিপীড়িত জনগণ আজ বিক্ষোভে গুমরে গুমরে উঠছেন, বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছেন, কিন্তু সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আর জনতার এই ব্যাপক ও গভীর বিক্ষোভকেই কাজে লাগিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে চাইছে জনগণের শত্রুরা। দুনিয়ার দেশে দেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের সঙ্গে যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতের বুকেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ধরা পড়ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় প্রায় তিন দশক জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন চালাতে গিয়ে দুনিয়াজোড়া যে ব্যাপক ঘৃণা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে ও হচ্ছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে, তার ফলে সে আজ প্রচণ্ড সংকটে জর্জরিত ও বিধ্বস্ত, ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকেও তাকে আজ সাময়িক ও আংশিকভাবে পিছু হটতে হয়েছে, এবং অনেকাংশেই তার স্থান দখল কোরে নিয়েছে এবং নিচ্ছে রুশ নয়া জাররা, ভারতের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অংশের ওপর এ মুহূর্তে তাই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও

নিয়ন্ত্রণই অনেক বেশি। তাদের এই নিয়ন্ত্রণ আজ প্রতিফলিত হচ্ছে শাসক কংগ্রেস দলের তথাকথিত 'প্রগতিশীল' অংশ এবং এদেশে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ট সি-পি-আই-এর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও তার হারানো স্থান পুনর্দখল করার জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে, প্রধানতঃ কংগ্রেসের তথাকথিত 'প্রতিক্রিয়াশীল' অংশ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী শক্তির সহায়তায়। জনগণকে বিভ্রান্ত কোরে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলার যে মডেল রুশ নয়া জাররা ভারতীয় শাসকচক্রের সহায়তায় অতি সম্প্রতি কার্যকরী করেছে বাংলাদেশে ও সিকিমে, ভারতে আজ ঠিক সেই একই মডেল অনুসরণ করতে চাইছে মার্কিণী প্রভাবপুষ্ট রাজনৈতিক শক্তিগুলি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এগিয়ে এসেছেন জয়প্রকাশজী, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীকে সামনে রেখে এবং আন্দোলনের বর্শামুখ সোভিয়েত শাসকচক্রের দিকে নিবদ্ধ কোরে তিনি চাইছেন জনগণের সরকার-বিরোধী বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে, শাসকশ্রেণীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রুশ প্রভাবিত অংশকে গদিচ্যুত কোরে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত মার্কিণ প্রভাবিত অংশকে ক্ষমতার গদিতে অধিষ্ঠিত করতে। কাজেই বাস্তবতঃ জয়প্রকাশজীর আন্দোলন ভারতের বুকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রুশ-মার্কিণ দুই বৃহৎ শক্তির তীব্র থেকে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই প্রতিফলিত করছে।

আবার একই সংগে এটাও ঘটনা যে, জয়প্রকাশজী সক্রিয়ভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে থেকেই বিহারের প্রগতিশীল যুব-ছাত্ররা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, এবং জয়প্রকাশজী তার খ্যাতি তথা ভাবমূর্তি নিয়ে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেও, শেষ পর্যন্ত বিহারের ব্যাপক গণ-আন্দোলনকে শুধুমাত্র জয়প্রকাশজীর আন্দোলন বলে চিহ্নিত কোরে দেবার যুক্তিসংগত কারণ নেই। অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির নির্মম পেষণে নিষ্পেষিত বিক্ষোভের বারুদের স্তূপে জয়প্রকাশজী আগুনের একটি স্ফূলিঙ্গ ছুঁড়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু শাসক শ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, হিটলারী কায়দায় গণ-আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার হিংস্র প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনতা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তা এই গণ-আন্দোলনের ব্যাপক গণভিত্তির প্রমাণই সবার সামনে তুলে ধরেছে। পশ্চিমবংগ তথা অন্যান্য রাজ্যে এই আন্দোলন সেই পরিমাণ ব্যাপকতা বা গভীরতা না পেলেও, জয়প্রকাশজীর আন্দোলন ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসেবে বিপ্লবী গণআন্দোলনের উৎসমুখ খুলে দেবার ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে শুরু করেছে।

এমতাবস্থায় জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সম্পর্কে একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতঃই খুব বেড়ে গেছে। কেউ কেউ বলছেন : ইন্দিরা সরকার বনাম জয়প্রকাশজীর লড়াই হচ্ছে দুই বৃহৎ শক্তির লড়াইয়েরই বিস্তৃতি, এবং আমরা যেহেতু মার্কিণ-রুশ দুই বৃহৎ শক্তিরই বিরোধী, অতএব জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের বিরোধিতা করাটাই আমাদের কর্তব্য। এই বক্তব্য আর যা-ই হোক,

মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক মোটেই নয়। কারণ, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী লড়াই থেকে, বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিক প্রয়োগ থেকে এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, সমস্ত শত্রুর সংগে একই সংগে লড়াই চালানোর চিন্তাটা একটি 'বামপন্থী' সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা, সব সময়েই প্রয়োজন মতো ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে শত্রুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও খেয়োখেয়িকে বিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয় এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের বর্শামুখ নিবদ্ধ করতে হয়। আজকের ভারতে শোষণ ও নিপীড়নের প্রতিভূ হিসেবে রুশ-প্রভাবিত ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠিই যদি জনগণের মূল শত্রু হয়, তবে তাদের সঙ্গে মার্কিণ প্রভাবাধীন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত শাসকগোষ্ঠির দ্বন্দ্বকেও আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং লড়াইয়ের বর্শামুখ মূল শত্রুর দিকে অবশ্যই নিবদ্ধ করতে হবে। এই সঠিক পথ অনুসরণ করতে গেলে এক কথায় জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের বিরোধিতা কোরে প্রগতিশীল কর্মীরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন না, এ জাতীয় গণআন্দোলন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে ওই আন্দোলনের ভুল ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সারগর্ভ জ্ঞানদান প্রক্রিয়া শেষ বিচারে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকেই ডেকে আনবে এবং জনগণকে প্রতিক্রিয়াশীলদের কামানের খোরাক কোরে তুলতেই সাহায্য করবে। কাজেই এ থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে যে, এই গণ-আন্দোলনে প্রগতিশীল কর্মীদের অবশ্যই সচেতন ও বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে হবে ও তীব্রতর কোরে তুলতে হবে, এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু সেটা করতে গিয়ে অন্য একটি বিচ্যুতির জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। জয়প্রকাশজীর আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে প্রগতিশীল কর্মীরা যদি আবার জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নবনির্মাণ সমিতির মতো সংগঠনগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে যান, তবে সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা আত্ম-সমর্পণবাদী দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি। কেননা এই নবনির্মাণ সমিতিগুলির মূল দাবীগুলির মধ্যে যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ভারতরক্ষা আইন ও আটক আইনের বিলুপ্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার প্রভৃতি সঠিক দাবী রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে নির্বাচনমুখী বিভিন্ন সংস্কারবাদী দাবী, যা নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল লাইনকেই জোরদার করে। নবনির্মাণ সমিতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ঢুকে পড়ার অর্থই দাঁড়াবে (গোপন ফ্র্যাক্‌শনাল কাজের কথা বলা হচ্ছে না) এই সমিতির নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া, প্রগতিশীল দাবীগুলির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল দাবীগুলোকেও মেনে নিতে বাধ্য হওয়া— অর্থাৎ এককথায়, নিজেদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ হারিয়ে ফেলা। স্বভাবতঃই কোনো প্রগতিশীল কর্মী সচেতনভাবে এরকম আত্মসমর্পণবাদী গ্রহণ করতে পারে না।

কাজেই প্রগতিশীল কর্মীরা যদি 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী এই দু'রকম বিচ্যুতি

সম্পর্কেই সচেতন থেকে বিপ্লবের স্বার্থে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনে অংশ নিতে চান, তবে সে কাজটা তাদের অবশ্যই করতে হবে নিজেদের হাতে উদ্যোগ ও স্বাধীনতা বজায় রেখে— ঐক্য ও স্বাধীনতা দুটোকেই যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে। ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই আন্দোলনে যেমন তাদের সক্রিয় ও অগ্রণী হয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে, এর প্রগতিশীল দাবীগুলোর সমর্থনে যেমন সোচ্চার হতে হবে, ঠিক তেমনি এর নেতিবাচক দিকগুলিকেও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে— জয়প্রকাশজীর তথাকথিত 'শ্রেণীহীন গণতন্ত্র' তথা 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর আজগুবি তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হবে; নির্বাচনের মাধ্যমে যে জনতার মুক্তি আসবে না, সেকথা তুলে ধরতে হবে; শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে; রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার সংগে সংগে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধিতা করতে হবে; আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে জনগণকে সচেতন কোরে যেতে হবে; এবং সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর কোরে তোলার এবং জনতাকে সে সম্পর্কে সচেতন কোরে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, শোষণমুক্তির চূড়ান্ত লড়াইয়ের পরিপূরক হিসেবে এই আন্দোলনকে জনগণের স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে শেষ বিচারে শাসকশ্রেণীর এক বা অপর অংশই এ থেকে ফসল কুড়োবে— এবং প্রগতিশীল কর্মীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই কেবল এই আন্দোলনকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের পথে পরিচালিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারবে।

অনীক, এপ্রিল-মে ১৯৭৫

সাংস্কৃতিক কর্মীরা রুখে দাঁড়ান

বর্তমান ভারতবর্ষে জনসাধারণের জীবনের ওপর নগ্ন ফ্যাসিবাদী আক্রমণ কোনো নোতুন ঘটনা নয়। জীবনকে দুর্বিসহ ক'রে তোলার জন্য প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করার জন্য হিংস্র ফ্যাসীবাদ প্রত্যহ আক্রমণের নোতুন ফ্রন্ট খুলছে। ফ্যাসীবাদ সামান্যতম বিরোধিতাও সহ্য করতে পারে না, তাদের নানারকম কালাকানুন, সরকারী পুলিশ মিলিটারী ও বেসরকারী গুণ্ডাবাহিনী যত্রতত্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে।

সংস্কৃতির জগতে এরই সাম্প্রতিকতম প্রকাশ সমস্ত অপেশাদার নাট্যপ্রয়োজনার ক্ষেত্রে আরোপিত নোতুন পৌরকর, যা গত ১লা এপ্রিল থেকে কলকাতায় কার্যকরী হয়েছে। এই ট্যাক্সের আক্রমণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো এবং প্রভাবশালী মাধ্যম সিনেমা আজ মূলগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে। কোটি কোটি টাকার পুঁজি সাধারণ মানুষকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায়, যৌন উম্মাদনাগ্রস্ত, অবাস্তব, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং উৎকেন্দ্রিক জীবনদর্শন প্রচারের 'পবিত্র' কর্তব্যে লিপ্ত। যাত্রার মূল ধারাটিও এই একই বিষে দুষ্ট। পেশাদার থিয়েটারের দলগুলো এই মহাজন অনুসৃত পন্থায় উৎসাহিত হয়ে মঞ্চে বস্ত্রবিপ্লব ঘটাচ্ছে এবং 'সমাজ কো বদল ডালো'র নামে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারায় সুকৌশলে মানুষের মনকে কলুষিত করছে।

বাংলার কোণে কোণে হাজার অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটারগুলোর মূল ধারাটি কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনদর্শনকেই প্রতিফলিত করে চলেছে। সাধারণ মানুষের উৎসাহে ও আনুকূল্যে বেঁচে থাকা এই অসংখ্য দলগুলো জীবনবাদী নাটকের মাধ্যমে সীমিতভাবে হলেও শোষণের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে সংহত করতে চেষ্টা করছেন।

এই কারণেই এদের ওপর নেমে এসেছে ধারাবাহিক অত্যাচার ও আইনকানুনের ফাঁস। পুলিশের লাঠি শহীদ প্রবীর দত্তের রক্তপান করেছে, কলকাতায় ও বাইরে গ্রেপ্তার হয়েছেন নাট্যকর্মীরা, ১৪৪ ধারার ভয় দেখিয়ে নাটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং গুণ্ডা লেলিয়ে 'দেশনেত্রীর' ধ্বজা তুলে ধরা হয়েছে।

এই ধারাবাহিক আক্রমণের সঙ্গে এবার যোগ হলো এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পৌর-কর। যে কর্পোরেশন তথা সরকার অপেশাদার নাট্য প্রযোজনার উন্নতিকল্পে কোনোদিন একটি পয়সাও ব্যয় করে নি, উপরন্তু নানাভাবে এর ওপর বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে, কোন্

অধিকারে তারা আজ এই পৌর-কর দাবী করে? ১৯৬৬ সালে আর একবারও এরকম পৌর-কর বসাবার চক্রান্ত করেও তাদের পিছু হটতে হয়েছিলো সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে। আজও তাই ইতিমধ্যেই কলকাতার নাট্যকর্মীরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তারা এই অন্যায় পৌর-কর কিছুতেই মেনে নেবেন না— দরকার হলে তারা হল বয়কট করবেন— কলকাতার বিভিন্ন হলের সামনে, পথে-ঘাটে-পার্কে নাটক করে প্রতিবাদ জানাবেন। এই প্রতিবাদের কণ্ঠকে ও প্রতিরোধের আহ্বানকে সুসংহত ও সুসংগঠিত করে তুলবার জন্য তারা সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছেন।

আমরা নাট্যকর্মীদের এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে দেশজোড়া লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

অনীক, এপ্রিল-মে, ১৯৭৫

মার্কসবাদ ও নির্বাচন

একটি বিতর্ক

গত বছর (১৯৭৪) এপ্রিল মাসে "মার্কসবাদ ও পার্লামেন্টারী নির্বাচন"— শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'অনীক'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্প্রতি সে সম্পর্কে একটি প্রতিবাদ আমরা পেয়েছি। বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা কোরে, দেরীতে হলেও, বর্তমান সংখ্যায় এই প্রতিবাদ-পত্রটি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মূল প্রবন্ধটির লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করা হলো।

একটি প্রতিবাদ

অনীকের এপ্রিল (১৯৭৪) সংখ্যায় 'মার্কসবাদ ও পার্লামেন্টারী নির্বাচন' নামে তরুণ রায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নেবার বা বয়কট করার প্রশ্নটি বিপ্লবের স্তর ও পদ্ধতির প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে না এসে নির্বাচন বয়কট করার প্রশ্নটি সঠিকভাবে আলোচনা করা যায় না। যেহেতু লেখক ভারতকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা উপনিবেশিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু ধরে নেওয়া যায় বিপ্লবের স্তর হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার মূল কাজ কৃষি বিপ্লব। যদিও এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয়।

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে দীর্ঘদিন ধরে যে দুই লাইনের লড়াই চলে আসছে, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল ঃ (ক) নিয়মতান্ত্রিক পথ, না সশস্ত্র সংগ্রামের পথ? এবং (খ) চীন বিপ্লবের পদ্ধতি, না রুশ বিপ্লবেব পদ্ধতি?

সশস্ত্র সংগ্রামের পথ, না নিয়মতান্ত্রিক পথ— এ নিয়ে বিতর্ক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও ছিল এবং মুৎসুদ্দীরাও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এই বিতর্ককে ব্যবহার করেছেন। মূলতঃ তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের সময় চীন বিপ্লবের পদ্ধতি, না রুশ বিপ্লবের পদ্ধতি— এই প্রশ্নটি তীব্র আকারে দেখা দেয়। এই সময়েই রুশ বিপ্লবের পথের উকীলরা তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নেহরু সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। সংশোধনবাদী পাণ্ডা রণদিভে তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা ছিল এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কর্মীদের ভারতের রাষ্ট্রচরিত্র, শত্রু মিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, কমিউনিষ্ট পার্টি থাকলেও তার গৃহীত কর্মসূচীই ছিল না।

চীন বিপ্লবের পদ্ধতি, না রুশ বিপ্লবের পদ্ধতি— এই প্রশ্নটির সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব— না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবের মূল বাহিনী কৃষক কিনা, কৃষক সমস্যাকে প্রাথমিক ও প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে কিনা, ভারতবর্ষ স্বাধীন না আধা উপনিবেশিক, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কিনা এসব প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। ২০ বছরেরও বেশী দু লাইনের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে কমিউনিষ্ট কর্মীদের একটি ব্যাপক অংশের মধ্যে এ সব প্রশ্নে কিছুটা সঠিক উপলব্ধি বিকাশ লাভ করে যার প্রতিক্রিয়ায় নক্‌শালবাড়ীর স্ফুলিঙ্গ সারা ভারতে একটি বিপ্লবী মশাল প্রজ্বলিত করে।

আজ তাই, নির্বাচন বয়কটের প্রশ্নটিকে বিচার করতে হলে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত ধরেই করতে হবে এবং মূলতঃ রণনীতির দাবী থেকেই এসব গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত ব্যাপারের নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে।

প্রথমতঃ তরুণ রায় তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট এবং ভারতের নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টের মৌলিক পার্থক্য (এক জায়গায় উল্লেখ ছাড়া) গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। এমনকি এই উল্লেখের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় ডুমার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যাতে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ও নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টের ধারণা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও চীন বিপ্লবের মডেলের রণকৌশলগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলোচনা না করার ফলে নির্বাচন বয়কটের ব্যাপারটা নিছকই একটা বর্তমান পরিস্থিতির রণকৌশলগত দাবিতে পরিণত হয়েছে। এ দাবি বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক হলেও করা যেত এবং রুশ বিপ্লবের কৌশল অনুসরণ করলেও করা যেত।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র আলোচনাটি ভারতের আধা উপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথের দৃষ্টিকোণ থেকে না করার ফলে এমন একটা ধারণাকেই শক্তিশালী করা হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাটাই দরকার, প্রাক-৪৬-এর কনষ্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলির নির্বাচন বা ১৯৫২ থেকে সবকটী নির্বাচনে অংশগ্রহণ হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে!!

পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে ভারতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার প্রশ্নটি একটি নিছক রণকৌশলগত প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলে এবং বিপ্লবের পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পদ্ধতি হলে এটা একটা রণকৌশলগত নীতির প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায়, যে নীতি বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী শক্তি ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে পরিবর্তিত হতে পারে না— মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে।

পরবর্তী অংশে র্নিবাচন বয়কটের প্রশ্নে যে দিকগুলো গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা উচিত বলে মনে হয়েছে, তা তুলে ধরা হলো। বলাই বাহুল্য, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, ভারত রাষ্ট্রের নয়া উপনিবেশিক চরিত্রের আধা উপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক

কাঠামো স্বীকার করলে যে কেউই বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক এবং চীন বিপ্লবের মডেলকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবেন। এবং এ ব্যাপারে তো বিপ্লবীদের সঙ্গে আধুনিক সংশোধনবাদীদের একটা সীমারেখা '৬৭ সালেই টানা হয়েছে।

নির্বাচন বয়কট—নীতিগত কৌশল, না রণকৌশলগত নীতি?

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো, না করবো না, এ প্রশ্নটি বিচার করতে গেলে কী কী ভাবা দরকার?

প্রথমতঃ, নীতিগতভাবে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করাটা কি মার্কসবাদ-বিরোধী?

দ্বিতীয়তঃ, নীতিগতভাবে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের ব্যাপারটা যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা।

প্রথম প্রশ্নটি বিচার করা সেই মার্কস-লেনিনের আমলেই প্রয়োজন হয়েছিল, যখন বিশেষ করে ইওরোপে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বিকাশলাভ করছিল। মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্তালিন, এঁরা যেভাবে প্রশ্নটি বিচার করেছেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী দলগুলি সমস্ত অবস্থাতেই অপরাজেয় থাকতে পারে, যদি তারা সংগ্রামের সমস্ত রীতি ও কৌশল— শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, প্রকাশ্য ও গোপন, আইনী ও বে-আইনী, পার্লামেন্টীয় সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম প্রভৃতি আয়ত্ত করতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে যখন আইনসম্মত পন্থায় আন্দোলন করা সম্ভব, তখন তা অবশ্যই করা উচিত। তা করতে অস্বীকার করা একান্তই অযৌক্তিক। কিন্তু যদি কোনো মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল আইনসর্বস্ব তথা পার্লামেন্ট-সর্বস্ব বিভ্রমের কবলে পতিত হয় এবং সংগ্রামকে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুমোদিত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চায়, তাহলে সেটা অবধারিতভাবেই সর্বহারা বিপ্লবকে ও সর্বহারার একনায়কত্বকে বর্জন করারই নামান্তর হবে। পার্লামেন্টারী সংগ্রামে ও পার্লামেন্টে কমিউনিষ্টরা অংশগ্রহণ করেন পার্লামেন্টের মঞ্চ থেকে বিপ্লবের পক্ষে প্রচার চালানোর এবং প্রচলিত ব্যবস্থার জীর্ণতা ও অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসের কথা প্রচার করার জন্যে। তাঁরা কখনোই মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য বা জনগণের কিছু কিছু সমস্যা সুরাহার জন্য বা সাময়িক রিলিফ দেবার জন্য পার্লামেন্টারী সংগ্রামে অংশ নেন না। লেনিন তো বুর্জোয়া মন্ত্রীসভার কমিউনিষ্ট মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীলদের 'হাতের পুতুল', 'ঢাকনার কাপড়' এবং শোষিত মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণা থেকে শোষকদের আড়াল করার যন্ত্র বলেই বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ নীতিগতভাবে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে কমিউনিষ্টরা ব্যবহার করবেন। এটা একটা গৃহীত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কৌশল। সংশোধনবাদীরা পার্লামেন্টের ব্যবহার্যতাকে বহুগণ বাড়িয়ে দেখে এবং আস্তে আস্তে নিজেদের ও নিজেদের দলগুলিকে বুর্জোয়া-ব্যবস্থার অঙ্গে পরিণত করে।

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দেশসমূহে নির্বাচনে অংশ নেওয়া না নেওয়া রণকৌশলের একটি প্রশ্ন মাত্র।

বুর্জোয়া পার্লামেন্ট এবং নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্ট

মার্কস্, এঙ্গেলস্ ও লেনিন পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নটা পুঁজিবাদী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন। কারণ তখনো পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলো ছাড়া অন্যত্র পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ছিল না এবং থাকতেও পারতো না। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে দুনিয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনের মূল কায়দা হয়ে দাঁড়ালো নয়া উপনিবেশিক শোষণ, পরোক্ষ শোষণ, লগ্নীপুঁজির শোষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের পর দুনিয়াজোড়া জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কতগুলি দেশে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করে। আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার সাইনবোর্ডের আড়ালে এইসব দেশে প্রধানতঃ আধা উপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। এইসব দেশে পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত দালালরা সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় ও নির্দেশে এক ধরণের তথাকথিত 'নির্বাচন ব্যবস্থা' 'আইনসভা' ও 'সার্বজনীন ভোটাধিকার' চালু করে। এইসব দেশগুলির পার্লামেন্ট বুর্জোয়া পার্লামেন্ট নয় এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্পর্কিত মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কিছুতেই এসব দেশগুলোর পার্লামেন্ট সম্পর্কে পুরোপুরি খাটতে পারেনা।

লেনিন দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের অন্যতম হল তার আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা। রাষ্ট্রের এই চারটি উপাদানই (যথা দমনপীড়নের জন্য সৈন্য ও পুলিশ-বাহিনী, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট এবং আমলাতন্ত্র) রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বুর্জোয়া পার্লামেন্টের অন্তর্বস্তু হল বুর্জোয়া, যা তুলনায় ঔপনিবেশিক বা সামন্ত অন্তর্বস্তু অপেক্ষা প্রগতিশীল। আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির তথাকথিত 'পার্লামেন্ট'গুলো হল নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্ট, যা তুলনায় বুর্জোয়া পার্লামেন্টের থেকে ঢের বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সীমিতভাবে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষে। কিন্তু উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে সামন্ততন্ত্র। তাই নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্ট সামন্ততন্ত্রের সমর্থক এবং সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশিক নীতির সহায়ক— চূড়ান্ত বিচারে, সব রকমের, এমন কি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদেরও বিরোধী।

নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টের খোলসটা (form) অনেকটা বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মত হলেও, তার অন্তর্বস্তু (content) হল সামন্তবাদ ও উপনিবেশিকতা।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যে প্রশ্নকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থায় যেটাকে বিপ্লবের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে সমর্থন করতে হয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিপ্লবের স্বার্থেই তার বিরোধিতা করতে হয়। যেমন, আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক দেশে (যেমন ভারত বা চীনে) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা অংশ বিপ্লবের বন্ধু। কিন্তু সেই

জাতীয় বুর্জোয়ারাও পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হন। এটা নীতিরই প্রশ্ন।

বিপ্লবের নীতি ও কৌশলগুলি রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র ও বিপ্লবের স্তরের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিপ্লবের স্তর না বদলালে রণনীতির প্রশ্নগুলি বদলাতে পারে না। কিন্তু রণকৌশলের বেশীর ভাগ প্রশ্নই একই রণনীতিগত লাইনের অধীনে পরিবর্তন হতে পারে। একই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে প্রধান দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ঘটলে রণকৌশলগত লাইনও পরিবর্তিত হয়। রণকৌশলগত লাইনের কয়েকটি প্রশ্ন আবার নীতিগতভাবেই গ্রহণ করা দরকার হয়, এগুলিকেই রণকৌশলগত নীতি বলা হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পুঁজিবাদী দেশসমূহে বুর্জোয়া পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করা না করাটা একটা নিছক কৌশলের প্রশ্ন— সুযোগ, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে (সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকতেও) অংশগ্রহণ না করাটা একটা রণকৌশলগত নীতি।

নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের প্রশ্ন ঃ
রুশ বিপ্লবের মডেল ও চীন বিপ্লবের মডেল

শ্রমিকশ্রেণী এ পর্যন্ত যতগুলি বিপ্লব করেছেন, সেগুলি মোটের উপর দুটি রণকৌশল অবলম্বন করে সফল হয়েছে। একটি হল সোভিয়েত বিপ্লবের কৌশল, আরেকটি হল চীন বিপ্লবের কৌশল। সোভিয়েত বিপ্লবের রণকৌশল হল— যে শহরাঞ্চল শত্রুর সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির সংহত নিয়ামক কেন্দ্র, প্রথমে সেই শহর কেন্দ্রের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানো— শত্রুর রাষ্ট্রযন্ত্রের হৃৎপিণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে দাও। শহরাঞ্চলে বিপ্লবী রাষ্ট্রের শাসন কেন্দ্র কায়েম করো, তারপর বিপ্লবকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দাও : আগে শহর দখল, শহরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম, তারপরে গ্রাম দখল, গ্রামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম।

সোভিয়েত বিপ্লবের সাফল্য উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে এক প্রবল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে।

এই অবস্থায় উপনিবেশগুলির কমিউনিষ্টদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলের প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হল, উপনিবেশসমূহে বিপ্লবীযুদ্ধ কি রুশ বিপ্লবের মডেল অনুসরণ করে সফল হতে পারবে? শহরগুলিই কি জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র হবে? রুশ বলশেভিকদের মতো উপনিবেশের কমিউনিষ্টরাও কি শহরের কাজের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেবেন? কম মাওয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি হাতে কলমে কাজ করে এ প্রশ্নের সমাধান করলেন। অনেক বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি ও ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে তাঁরা সর্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের আরেকটি রণকৌশল বিকশিত করলেন। চীন বিপ্লবের কৌশল হলো শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব সংগ্রামের দ্বারা সুবিধাজনক এলাকায় ও এলাকাসমূহে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন। সেইসব ঘাঁটি এলাকার সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটিয়ে, জনযুদ্ধের প্রসার ঘটিয়ে, শহরগুলোর কণ্ঠরোধ করা এবং

শেষ পর্যন্ত শহরে শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও ঘিরে থাকা মুক্ত অঞ্চল থেকে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে শহরের পতন ঘটানো।

সোভিয়েত বিপ্লবের মডেলে যেসব দেশে বিপ্লব হতে পারে, সেইসব পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক বিকাশ মোটামুটি সারাদেশে সমভাবে হয়। এসব ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের মঞ্চকে প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের ও দেশব্যাপী একই ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্লোগান তোলার একটা তাৎপর্য থাকতেও পারে। অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত প্রস্তুতির আগে পর্যন্ত দেশের সর্বত্রই প্রকাশ্য আন্দোলন, সংগঠন, এবং এমনকি প্রকাশ্য কমিউনিষ্ট আন্দোলনেরও সুযোগ থাকতে পারে। কিন্তু, চীন বিপ্লবের মডেলে গ্রাম দিয়ে শহরে ঘেরার পদ্ধতিতে যেসব আধা উপনিবেশ বা উপনিবেশে বিপ্লব হতে পারে, সেখানে সারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অসমভাবে বিকাশ হয়, তাই বিপ্লবের বিকাশও অসম হয়। এসব ক্ষেত্রে সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী অবস্থা একই রকমভাবে পরিপক্ক হয় না। তাই একই ধরণের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্লোগান সারা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না। এসব দেশে কমিউনিষ্টদের প্রথম থেকেই গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হয়। তাই কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশ নেওয়া বা প্রকাশ্য কার্যকলাপ চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। শুধু চীনের নয়, ভিয়েতমান-লাওস-কম্বোডিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ডে ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনও এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করে। অবশ্য কমিউনিষ্ট নাম সেঁটে যেসব সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বিপ্লবী যুদ্ধ থেকে নিরাপত দূরত্বে থেকে ঐ যুদ্ধের বিরোধিতা করে, তাদের পক্ষে আধা উপনিবেশে ভোটবাজী বা মন্ত্রীবাজী করা সম্ভব। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে থেকেই, সাচ্চা কমিউনিষ্টদের একটি অংশ ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে যখন কৃষিবিপ্লব গড়ে তোলার ও চীন বিপ্লবের রণকৌশল অনুসরণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন পুরো পার্টিকেই, এমনকি তার গণসংগঠনগুলি সমেতই বেআইনী করে দেওয়া হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা যখন ঐ কৃষিবিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি বেইমানী করল— তখনই কেবল তারা প্রকাশ্য কাজের ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু ১৯৬৭-৭১ সালে যাঁরা কৃষিবিপ্লবী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ও চীন বিপ্লবের মডেলে বিপ্লব করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা সিপিআই বা সিপিআই (এম) নামধারী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরা আলাদা আলাদা গ্রুপ ও দল তৈরী করেছিলেন। তাই সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুত দল ও গ্রুপগুলি বেআইনী হলেও সংশোধনবাদী সিপিআই বা সিপিআই (এম) হয়নি।

এ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, জনযুদ্ধের লাইন, সশস্ত্র বিপ্লবের লাইন এবং ভোটবাজী একসঙ্গে চলতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ যদি রণকৌশলগত নীতি এবং সামরিক লাইনের অন্তর্বস্তু হয়, তবে নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ না নেওয়ার নীতিও ঐ রণকৌশলগত নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের লাইন অনুসরণকারীদের সামনে মূল কাজ হল গ্রামাঞ্চলের কাজ, আর রুশ বিপ্লবের অভ্যুত্থানের লাইন

অনুসরণকারীদের সামনে মূল কাজ হল শহরে কাজ এবং শত্রুর রাষ্ট্রযন্ত্রের উপাদানগুলিকে ভেতর থেকে ভাঙার কাজ।

সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি প্রশ্ন

১) এবিষয়ে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হয়, তা হল : যদি নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ না করাটাই রণকৌশলগত নীতি হয়, তবে চীনে বিপ্লবের আগে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়া, অথবা বর্তমানে ভিয়েতনাম বা লাওসের কমিউনিষ্টরা যে নির্বাচনের দাবী তুলেছেন তা কি ভুল? এ বিষয়টিকেও মূলতঃ রুশ বিপ্লবের কৌশল না চীন বিপ্লবের কৌশল এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। চীনে যে সময় কমিউনিষ্টরা কোয়ালিশন সরকারে অংশ নিয়েছিলেন, তখন সারা দেশের অধিকাংশ জায়গায়, বিশেষ করে বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল সমূহে আধা উপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র চীনের পরিপ্রেক্ষিতে তখন বিপ্লবী চীনের জনগণের চীনের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় যে দেশজোড়া অভ্যুত্থানের প্রয়োজন ছিল, সেদিক থেকে এবং দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার রাষ্ট্রক্ষমতা মূলতঃ নিজেদের হাতে থাকায় কমিউনিষ্টদের পক্ষে ঐ সরকারে অংশ নেওয়াটা রণকৌশলগত নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও লাওসেও কমিউনিষ্টরা ও দেশপ্রেমিকরা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে এবং দেশের জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশকে বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে আনার পরই এমন প্রস্তাব তুলেছেন কতকগুলি শর্তাধীনে। এই শর্তগুলি কার্যকর হলে সে সব দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার আকার পরিবর্তন সম্ভব হবে, এবং সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোপুরি নয়া উপনিবেশিক বলা যাবে না, যদিও বিপ্লবী রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবেষ্টনে প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রক্ষমতা একটি বা কয়েকটি স্থানে দ্বীপের মত আবদ্ধ হয়ে এখনো কার্যকর রয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম এবং মূল উপাদান সমগ্র দেশের সেনাবাহিনীরও একটা বড় অংশের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব রয়েছে, মুক্ত এলাকাসমূহে নিজস্ব আইন-বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন যন্ত্র কার্যকরী রয়েছে। দুটো পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে এবং কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থাই তুলনায় শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রক। মূলতঃ সেটাই এই নির্বাচনী ব্যবস্থার শর্তসমূহ আরোপ করতে পারছে। সুতরাং এসব দেশেও কমিউনিষ্টরা যে নির্বাচনী ব্যবস্থায় অংশ নিচ্ছেন সেটাকে আর অন্তর্বস্তুর দিক থেকে নয়া উপনিবেশিক এবং আকারে বুর্জোয়া বলা যায় না। ১৯৫৬ সালে সমগ্র ভিয়েতনামে নির্বাচনের যে প্রস্তাব কমিউনিষ্টরা গ্রহণ করেছিল, তখনও সমগ্র ভিয়েতনামের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্র ক্ষমতাই কমিউনিষ্টদের হাতে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তর ভিয়েতনামকে বাদ দিয়ে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে নির্বাচনের যতগুলি প্রহসন হয়েছে, সব কটিকেই কমিউনিষ্টরা সক্রিয়ভাবে সঠিক কারণেই বর্জন করেছেন।

২) বুর্জোয়া পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ কৌশলের দিক থেকে কখনো কখনো প্রয়োজনীয়

হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করে যখন সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা পার্লামেন্টারী পথে 'সমাজতন্ত্রে' উত্তরণের আওয়াজ তুলেছে, যখন দুনিয়ার দেশে দেশে আধুনিক সংশোধনবাদীরা এই শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্ব নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন এমনকি পুঁজিবাদী দেশসমূহেও পার্লামেন্টারী নির্বাচন বর্জন করাটাই শ্রেয়ঃ। সংসদীয় পথ বিপ্লবের পথ নয়, বিপ্লবের পথে পদক্ষেপও নয়। প: ইউরোপের পুঁজিবাদী মন্ত্রীসভায় ও সংসদে অংশগ্রহণকারী 'কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট' নামধারী পার্টিগুলির অধঃপতন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য, আধুনিক সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে সীমারেখা টানার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নামে পুঁজিবাদ কায়েম রাখার ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বিকাশের অপচেষ্টা রোধ করার জন্যও এসব দেশের কমিউনিষ্টদের বর্তমানে পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বাদ দিয়ে অন্যান্য কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার, লিন পিয়াও এর রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ("জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক" প্রবন্ধে তিনি যেভাবে রেখেছেন) অনেকে যেভাবে সারা বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় দেশে নির্বাচন বয়কটকে প্রেসক্রিপশান হিসাবে হাজির করেন এবং রণনীতির দাবী বলে ব্যাখ্যা করেন, সেটাও ঠিক নয়। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখযোগ্য যে, সি-পি-সি-র বহু আলোচিত ১৪ই জুনের চিঠিতে এবং ১৪ই জুনের চিঠির ব্যাখ্যামূলক (আগে ও পরে প্রকাশিত) বিভিন্ন প্রবন্ধে ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীই রাখা হয়েছে। এইসব প্রবন্ধে, বিশেষ করে ১৪ই জুনের চিঠি, 'তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো কথা' 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভ' এই তিনটি প্রবন্ধে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই এবং সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ-গুলিতেই নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী পথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ভারতের মতো আধা উপনিবেশ, উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশগুলির আলোচনায় নয়।

৩) অনেকে আবার সংসদীয় নির্বাচন বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, কলেজ ইউনিয়ন ইত্যাদির নির্বাচনকেও গুলিয়ে ফেলে। সংসদীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি বিধানসভা-লোকসভা পর্যন্ত এ সবই হল নয়া উপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের চার উপাদানের অন্যতম। এখানে অংশগ্রহণ মূলতঃ করতে হয় রাজনৈতিক দলকে। কিন্তু সামাজিক পাড়াগত ক্লাব, ট্রেড-ইউনিয়ন, কলেজ ইউনিয়ন এগুলোকে সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের উপাদান বলা যায় না, যদিও এগুলিকে আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই কাজ করতে হয়। এগুলিতে অংশগ্রহণ সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে করে না। মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের গণসংগঠন এগুলিতে অংশ নেয়। গোপন রাজনৈতিক দল, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের লাইন অনুসরণকারী কমিউনিষ্ট পার্টিও তার অপ্রকাশ্য কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত গণসংগঠনগুলির সাহায্যে এগুলিতে অংশ নিতে পারেন, এবং এসব সংগঠন সীমিতভাবে বিপ্লবের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এগুলিতে অপ্রকাশ্য কমিউনিষ্ট কর্মীরা তাঁদের সংগঠনগুলির মাধ্যমে অংশ নেবেন কি নেবেন না, সেটা নির্ভর করে মূলতঃ প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও সামর্থ্যের

ওপরে। নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার সঙ্গে এগুলিকে এক করে দেখা অতিসরলীকরণের ফলেই ঘটতে পারে।

৪) কেউ কেউ ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার অংশগ্রহণের ব্যাপারটাকে নিতান্তই বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপার, নক্শালবাড়ীর পরবর্তীকালের পরিস্থিতির দাবী, গ্রামে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে... ইত্যাদি ভাবে বিচার করতে চান। এটা খুবই আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আধা উপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রকে বাদ দিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থার খোলসটা দেখে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতে যদি কোনো সাচ্চা কমিউনিষ্ট পার্টি থাকতো, তবে ব্রিটিশ ভারতের কনষ্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলীর নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৫২ থেকে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে সবগুলিই তাঁরা বর্জন করতেন, যেমন করেছেন বার্মার বিপ্লবী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

৫) পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়ারা নিজের স্বার্থে ভূমিসংস্কার করে, সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বার্থে সার্বজনীন শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আংশিকভাবে প্রসারিত করে। পুঁজিবাদী দেশের এই বুর্জোয়াশ্রেণীই আবার উপনিবেশ, আধা উপনিবেশগুলির সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয় এবং সামন্তশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য ভূমিসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার প্রসার রোধ করে। উপনিবেশ আধা উপনিবেশগুলির অধিকাংশই— ৭০-৭৫ শতাংশই— কৃষিজীবী এবং ভূমি সংস্কার না হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার বিস্তৃত হয় না। শিক্ষার অভাবে এমনকি সার্বজনীন ভোটাধিকারও সামন্তশ্রেণীর একটা নির্দেশ ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীর মোট নিরক্ষরের প্রায় ৯৫ শতাংশই হল উপনিবেশ-আধা উপনিবেশের জনগণ। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে এসব দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার, ভূমি সংস্কার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার একটা তামাসামাত্র এবং একটা সময়ান্তরিক প্রথামাত্র (a ritual at a regular internal)।

৬) এইসব দেশে কমিউনিষ্টরা যদি নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ নেন এবং আবার মুখে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলেন তবে তাতে প্রতিবিপ্লবের কতটা সুবিধা হতে পারে, ইন্দোনেশিয়া তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রথম থেকেই উপনিবেশ-আধা উপনিবেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সর্বহারার গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে কাজ করা উচিত। নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ কাজের মূল গতিধারার অভিমুখটাই বদলে দেয়। অপর দিকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রস্তুতির অভাবের ফলে অতি দ্রুত তারা প্রতিবিপ্লবী স্লোগানের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র ২/৩ দিনে যেভাবে ব্যাপক কমিউনিষ্টদের হত্যা করা সম্ভব হল তা বিস্ময়কর হলেও কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য নয়। অথচ জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ এভাবে ২/৩ দিনে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি— দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তা গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতের '৬২র ভারত-চীন যুদ্ধের সময় কমিউনিষ্টদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, সেটাও এত দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করেছিল একই কারণে। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট এবং নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্ট সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী এদিক থেকেও পৃথক হওয়া উচিত।

অন্বেষা মিত্র

লেখকের জবাবে

অন্বেষা মিত্র আমার "মার্কসবাদ ও পার্লামেন্টারী নির্বাচন" প্রবন্ধটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেজন্য প্রথমেই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমার প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম : পার্লামেন্টে অংগ্রহণ করা বা না করাটা কমিউনিষ্টদের কাছে কোনো নীতিগত প্রশ্ন নয়, এটি একটা কৌশলগত প্রশ্ন মাত্র— বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিচার কোরে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্টরা একে কাজে লাগায় বা বয়কট করে। অন্বেষা মিত্র মূলতঃ এই বক্তব্য সম্পর্কেই দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, একটি পুঁজিবাদী দেশে নির্বাচনে অংশ নেওয়া বা না নেওয়াটা একটা রণকৌশলগত প্রশ্ন বটে, কিন্তু একটি নয়া উপনিবেশিক বা আধা-সামন্তান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক দেশে এটি একটি নীতিগত প্রশ্ন— 'রণকৌশলগত নীতি'। তাঁর মতে, ভারতের বর্তমান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এবং দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পদক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি "একটি রণকৌশলগত নীতির প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায়, যে নীতি বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শক্তি ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে পরিবর্তিত হতে পারে না।" দুঃখের বিষয়, তার এ বক্তব্য আমি মেনে নিতে পারছি না।

এক

প্রথমে দেখা যাক, রণনীতি ও রণকৌশল বলতে আমরা কী বুঝি। স্তালিন আমাদের শিখিয়েছেন,[১] রণনীতি হচ্ছে বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সর্বহারাশ্রেণী কোথায় প্রধান আঘাত হানবে তা ঠিক করা, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপ্লবী বাহিনীর বিন্যাসের পরিকল্পনা করা এবং বিপ্লবের সেই সমগ্র নির্দিষ্ট স্তর জুড়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য লড়াই চালানো। আর রণকৌশল হচ্ছে আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা বা বিপ্লবী লড়াইয়ের উত্থান-পতন অনুসারে সাময়িকভাবে সর্বহারাশ্রেণী কোন্ পন্থা গ্রহণ করবে তা ঠিক করা, এবং লড়াইয়ের পুরোণো রূপের বদলে নোতুন রূপ গ্রহণ, পুরোণো স্লোগানের বদলে নোতুন স্লোগান প্রদান, বিভিন্ন রূপের যথাযথ সমন্বয় প্রভৃতির মাধ্যমে এই পন্থাকে কার্যকরী করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। বিপ্লবের কোনো নির্দিষ্ট স্তরের সমগ্র সময় জুড়েই রণনীতি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু সেই একই স্তরের মধ্যে আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা বা বিপ্লবের উত্থান-পতন অনুসারে রণকৌশল পরিবর্তিত হয়। রণকৌশল রণনীতিরই অধীন থাকে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, যার মূল মর্মবস্তু হচ্ছে কৃষিবিপ্লব এবং প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। বিপ্লবের এই বর্তমান স্তরের সমগ্র

---

১ স্তালিন : Foundations of Leninism (Peking Edn. 1970) / পৃষ্ঠা : ৮২, ৮৬

সময় জুড়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তটিকে একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে হাজির কোরে অন্বেষা মিত্র কার্যতঃ এই প্রশ্নটিকে একটি রণনীতিগত প্রশ্ন হিসেবেই দেখেছেন, যদিও তিনি একে 'রণকৌশলগত নীতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই, আমাদের বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দাড়াচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করার প্রশ্নটিকে ভারতের মতো দেশে কমিউনিষ্টরা কীভাবে দেখবে— রণনীতিগত প্রশ্ন হিসেবে, না রণকৌশলগত প্রশ্ন হিসেবে? অন্বেষা মিত্রের মতে, এটি একটি রণনীতিগত প্রশ্ন, কাজেই ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সমগ্র সময় জুড়ে নির্বাচনে অংশ না নেবার সিদ্ধান্তটি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, এই স্তরের কোনো সময়েই (বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের শক্তি ভারসাম্যে পরিবর্তন না এলে) এর পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমার মতে, এটি একটি রণকৌশলগত প্রশ্ন, কাজেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে প্রয়োজন বুঝলে বিপ্লবের বর্তমান স্তরের যে কোনো সময়ে নির্বাচনে অংশ নেবার প্রশ্নটি বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য আমাদের দুই ভিন্ন অবস্থান (রণনীতি, না রণকৌশল— এই প্রশ্নে) সত্ত্বেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্টদের পক্ষে নির্বাচনে অংশ নেবার কোনো যুক্তি নেই।

দুই

অন্বেষা মিত্র আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিলেই তা 'পার্লামেন্টারীবাদ' (পার্লামেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংশোধনবাদী তত্ত্ব) হয়ে যায় না, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে অনুসরণ কোরেও কমিউনিষ্টরা বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে প্রয়োজন বুঝলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। এ সম্পর্কে মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর মতে, কেবলমাত্র পুঁজিবাদী দেশেই এই শিক্ষা প্রযোজ্য, ভারতের মতো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক দেশে এ শিক্ষা প্রযোজ্য নয়, এ সব দেশে নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্তটি একটি অপরিবর্তনীয় নীতিগত প্রশ্ন, এটি আর কোনো রণকৌশলগত প্রশ্ন নয়। এক কথায়, একটি পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়া পার্লামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি রণকৌশলগত প্রশ্ন, কিন্তু একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক দেশের নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি নীতিগত প্রশ্ন।

তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তার যুক্তি হচ্ছে এই যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টের অন্তর্বস্তু হচ্ছে বুর্জোয়া এবং নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টের অন্তর্বস্তু হচ্ছে উপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্র; বুর্জোয়া পার্লামেন্টের তুলনায় নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্ট অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল— কাজেই রণকৌশলগতভাবে বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠতে পারে বটে, কিন্তু নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ নেবার প্রশ্ন কখনোই উঠতে

পারে না, একে বয়কট করাটাই একটা অপরিবর্তনীয় নীতিগত প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায়।

অন্বেষা মিত্র নিশ্চয়ই লেনিনের এই শিক্ষাকে স্বীকার করবেন যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, এবং পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশেও শোষিত শ্রেণীর মূলতঃ কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে না, সেখানেও বুর্জোয়া পার্লামেন্ট হয়ে দাঁড়ায় একটি লোক ঠকানো বাগাড়ম্বরের দোকানমাত্র। বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে প্রয়োজন বুঝলে এরকম বুর্জোয়া পার্লামেন্টেও যদি কমিউনিষ্টরা বিপ্লবের স্বার্থে অংশগ্রহণ করতে পারে, একে কাজে লাগাতে পারে, তবে সামন্ততন্ত্রের সমর্থক ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশিক নীতির সহায়ক নয়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে বাস্তব প্রয়োজন মতো অংশ নেবার বাধাটা কোথায়? একথা ঠিক যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় নয়া-উপনিবেশ জনগণের অধিকারগুলি অনেক বেশি খণ্ডিত, খর্বিত ও অকার্যকরী থাকে, কিন্তু এ অধিকারগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও তো মূলতঃ অকার্যকরীই থাকে। অধিকার ভোগ করার ব্যাপারে পার্থক্যটা কি তাহলে পরিমাণগত দাঁড়াচ্ছে না? তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কমিউনিষ্টরা তাদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে বুর্জোয়াদের স্বার্থে পরিচালিত পার্লামেন্টকে দরকার মতো কাজে লাগাতে পারলেও সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে পরিচালিত নয়া-উপনিবেশিক পার্লামেন্টকে দরকার মতো (সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলেও) কাজে লাগাবার মতো সৃজনশীলতা তাদের থাকে না? এবং না থাকার কারণ— জনগণের অধিকার কেড়ে নেবার ব্যাপারে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সংগে নয়া-উপনিবেশিক পার্লামেন্টের পরিমাণগত ব্যবধান? অন্বেষা মিত্রের সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে আসা এই বক্তব্য কি যুক্তিগ্রাহ্য?

আমার প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আমি আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির দলিল "সর্বহারা বিপ্লব ও সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভ" থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছিলাম ঃ "মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদীরা চিরকালই এই অভিমত পোষণ কোরে আসছেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি সর্বহারা পার্টির উচিত পার্লামেন্টারী সংগ্রামে অংশ নেওয়া; এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে উদঘাটিত কোরে দেবার জন্য, জনগণকে শিক্ষিত কোরে তোলার জন্য এবং বিপ্লবী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পার্লামেন্টের মঞ্চকে ব্যবহার করা। প্রয়োজনের সময় সংগ্রামের এই আইনসঙ্গত রূপকে ব্যবহার করতে অস্বীকার করাটা ভুল হবে।" অন্বেষা মিত্র দাবী করছেন, চীনের পার্টি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশের পার্লামেন্টের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বক্তব্য রেখেছে, ভারতের মতো আধা-উপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য তারা রাখে নি। অন্বেষা মিত্রের এই দাবীকে আমি চীনের পার্টির বক্তব্যের অসচেতন বিকৃতি হিসেবে না দেখে পারছি না। কারণ, প্রথমতঃ, চীনের পার্টি এ বক্তব্য রেখেছিলো সাধারণভাবে, শুধু পুঁজিবাদী দেশের পরিপ্রেক্ষিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, লেনিনের যুগে নয়া-উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ নেওয়া না নেওয়ার প্রশ্নটি মূল সমস্যা হিসেবে না দেখা দিলেও, ১৯৬৪ সালে চীনের উপরোক্ত দলিল 'পার্লামেন্টারী পথ বনাম সশস্ত্র সংগ্রামের পথ' এর

বিতর্কের পটভূমিকায় আধুনিক সংশোধনবাদীদের শান্তিপূর্ণ উত্তরণের কুৎসিৎ তত্ত্বকে সমালোচনা করতে গিয়েই রচিত হয়েছিলো, এবং এই বিতর্ক সমগ্র দুনিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো।* যেহেতু চীনের পার্টি উপরোক্ত দলিলে এবং অন্য কোনো দলিলে পুঁজিবাদী ও অপুঁজিবাদী দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের প্রশ্ন নিয়ে আলাদা আলাদা কোনো বক্তব্য তুলে ধরে নি, অতএব সেক্ষেত্রে চীনের বক্তব্যকে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে সীমিত কোরে দেখানোর প্রচেষ্টার অর্থ দাঁড়িয়ে যায় এটাই যে, চীনের পার্টি সচেতনভাবে বা অচেতন ভাবে নয়া-উপনিবেশিক পার্লামেন্টে অংশ নেবার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছে। চীনের পার্টি সম্পর্কে এই নেতিবাচক মূল্যায়ণ আমি মানতে পারছি না। "তোগলিয়াত্তির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য সম্পর্কে আরও বক্তব্য"— শীর্ষক একই সময়ের আরেকটি দলিলেও চীনের পার্টি উপরোক্ত বক্তব্যই তুলে ধরেছে, এবং যারা চীনের পার্টিকে সমস্তরকম পার্লামেন্টারী সংগ্রামের বিরোধী বলে আখ্যা দেয়, তাদের সম্পর্কে বলেছে : তারা "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বক্তব্যকে বিকৃত করেছে।" এখানেও চীনের পার্টি নির্বাচনের প্রশ্নে পুঁজিবাদী ও অ-পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্যরেখা না টেনে সাধারণভাবেই বক্তব্য রেখেছে।

কাজেই চীনের পার্টির বক্তব্য সম্পর্কে অন্বেষা মিত্রের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ চীনের পার্টির মতে, ভারতের মতো দেশেও নির্বাচনে অংশ নেওয়া বা না নেওয়ার প্রশ্নটি একটি রণকৌশলগত প্রশ্ন, নীতিগত প্রশ্ন নয়।

তিন

অন্বেষা মিত্র এ প্রসংগে আরও দু'টি বক্তব্য রেখেছেন ঃ (১) ভারতের মতো যেসব আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক দেশে চীন-বিপ্লবের মডেলকে নিজ নিজ দেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রয়োগ করাটা সঠিক, সেসব দেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই যে উঠতে পারে না— চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা নাকি সে কথাই প্রমাণ করে। (২) এ সব দেশে সশস্ত্র জনযুদ্ধের যে পর্যায়ে ব্যাপক মুক্তাঞ্চলে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং কমিউনিষ্টরা একটি নির্ধারক শক্তিতে পরিণতি হবে, সে পর্যায়ে কমিউনিষ্টরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

চীনে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টকে কাজে লাগানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে নি, কারণ, চেয়ারম্যান মাও নিজেই বলেছেন, "কাজে লাগানোর মতো কোনো পার্লামেন্টই আমাদের নেই"। (We have no parliament to make use of)[২] তিনি কিন্তু একথা বলেন নি যে, পার্লামেন্ট থাকলেও তাকে চিরকালের জন্য বয়কট

* এমন কি মহান সর্বহারা সাংস্কৃতি বিপ্লব চলাকালীন চীনের ক্রুশ্চভের তত্ত্বকে সমালোচনা করতে গিয়েও ঠিক উপরোক্ত বক্তব্যই সাধারণভাবে আবার তুলে ধরা হয়েছে দ্রষ্টব্য : পিকিং-রিভিউ পত্রিকা/সেপ্টেম্বর ১, ১৯৬৭/পৃষ্ঠা ৯)।

২ পিকিং রিভিউ : সেপ্টেম্বর ১, ১৯৬৭/পৃষ্ঠা ৯

করাটাই আমাদের নীতি। আর চীনে নির্বাচন তথা কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব কমিউনিষ্টরা দিয়েছিলেন, কিন্তু লালফৌজ ভেঙে দেবার শর্ত মেনে আত্মহত্যার পথ তারা বেছে নেন নি— এবং ফলতঃ নির্বাচনে অংশ নেবার প্রশ্ন আর ওঠে নি।

কিন্তু ভিয়েতনামে কমিউনিষ্টরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, এবং অন্বেষা মিত্রের বক্তব্য মতো ব্যাপক মুক্তাঞ্চল গঠন তথা নির্ধারণ শক্তিতে পরিণত হবার শর্ত না মেনেই। সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন— "সর্বহারাশ্রেণীকে অবশ্যই সকল উপায়ে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে হবে। এগুলির মধ্যে থাকবে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম, ধর্মঘট, মিছিল, রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান (যা হচ্ছে সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ) পর্যন্ত।"[৩] "বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসাধ্য বিপ্লবী আন্দোলনে আমাদের পার্টি দক্ষতার সংগে বিভিন্ন ধরণের সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে ছিলো অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, আইনানুগ ও বেআইনী সংগ্রাম, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম, এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম।"[৪] ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অধীন থাকাকালীন ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে "পার্টি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন কোরে... নির্বাচনী অভিযানে অংশ নিতে এবং পার্লামেন্টের ভেতরে সংগ্রাম পরিচালনা করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলে।"[৫] "আমাদের মতো একটি উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে— যেখানে স্কুলের চেয়ে জেলের সংখ্যা বেশি, যেখানে জনগণের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার, এমন কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত ছিলো না— আমাদের পার্টি যে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ ও আঞ্চলিক পরিষদে অংশ গ্রহণ সহ বিভিন্ন আইনানুগ কার্যক্রমকে কাজে লাগাতে পেরেছিলো, এ ঘটনা কমিউনিষ্টদের বিরাট বিজয়কেই নির্দেশ করেছিলো।"[৬] এসব থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্বেষা মিত্রের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, বাস্তব অবস্থার বিচার কোরে প্রয়োজন বুঝলে কমিউনিষ্টরা একটি অ-পুঁজিবাদী দেশে পর্যন্ত সশস্ত্র জনযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পার্লামেন্টকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করতে এবং এ কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে। ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ কোরে দিচ্ছে।

অন্বেষা মিত্র এ প্রসংগে আরও বলেছেন, মুখে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে পার্লামেন্টে অংশ নেবার ফলে প্রতিবিপ্লবের যে কতো সুবিধে হয়, ইন্দোনেশিয়াই তার প্রমাণ। দুঃখের বিষয়, তার এই মন্তব্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তাধারার অনুসারী বিপ্লবী পার্টি হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির (পি, কে, আই) বক্তব্যের বিরোধিতা করছে। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পর বিপ্লবের পরাজয় সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা যে বলিষ্ঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ

৩, ৪, ৫ ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি : "Peace, or Violence?" (পিকিং থেকে প্রকাশিত : ১৯৬৩)

৬ An outline history of the Vietnam Workers' Party / Hanoi : 1970 / পৃষ্ঠা : ২৮

আত্ম-সমালোচনা করেছিলেন (১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এই দলিল দুনিয়ার বিপ্লবীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলো), তাতে তাঁরা বলেছেন, "১৯৫১ সালে যে বাস্তব পরিস্থিতি ছিলো, তাতে আইনী সংগ্রামের একটা রূপ হিসেবে পার্লামেন্টারী সংগ্রাম মূলতঃ সঠিক ছিলো।" "সমস্ত আইনানুগ ও পার্লামেন্টারী কার্যকলাপকে অবশ্যই সংগ্রামের প্রধান মাধ্যম ও মূল রূপকে (অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম— ?) সিদ্ধ করতে হবে।"[৭] অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীদের মতে, পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করাটা সঠিক কিনা, বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারেই, অর্থাৎ রণকৌশল হিসেবেই, তা বিচার করতে হবে, রণনীতিগতভাবে নয়, বা ব্যাপক মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার সর্তসাপেক্ষে নয়।

কাজেই, উপরোক্ত দেশগুলির অভিজ্ঞতার সার-সংকলন কোরে এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হচ্ছি যে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা বা না করার প্রশ্নটি একটি রণকৌশলগত প্রশ্ন— এবং এ সিদ্ধান্ত পুঁজিবাদী বা অ-পুঁজিবাদী সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

চার

অবশ্য নয়া-উপনিবেশিক পার্লামেন্টে কমিউনিষ্টদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতেই পারে, এবং সে প্রশ্ন অন্বেষা মিত্রও তুলেছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ একটি গোপন পার্টি কীভাবে প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষা মিত্র নিজেই নিজের অজান্তে দিয়ে ফেলেছেন, ওপরে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা থেকেও তার উত্তর মিলেছে। সশস্ত্র বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটা যদি দরকার হয়, তবে একটা গোপন পার্টিও, অন্বেষা মিত্রের বক্তব্য মতো ট্রেড ইউনিয়ন-কলেজ ইউনিয়ন প্রভৃতির নির্বাচনে অংশগ্রহণের মতো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পার্টির অপ্রকাশ্য কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত গণ-সংগ্রামগুলির নামে, বা ভিয়েতনামের মতো গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

আসল কথা, প্রয়োজনটা যথার্থ হলে উপায়টাও বের কোরে নেওয়া যায়। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের গোপন বিপ্লবীরা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রকাশ্য গণ-সংগঠনগুলিকে নিজেদের দোষেই অধিকাংশ সময়ে পুলিশের কাছে চিহ্নিত কোরে দেন— কখনও নিজেদের 'সাফল্য' জাহির করবার জন্য "আমাদের এতোগুলি গণ সংগঠন আছে" ইত্যাদি বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে; কখনও বা নিজেদের 'বামপন্থী' বিচ্যুতির ফলে পার্টি ও গণ-সংগঠনের মধ্যে ব্যবধানটাকে গুলিয়ে ফেলেন। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে আইনানুগ ও বে-আইনী সংগ্রামের যথার্থ সমন্বয়ের রণকৌশল বিপ্লবীরা আয়ত্ত করতে পারলে, প্রয়োজন বুঝলে নির্বাচনে অংশ নেবার পদ্ধতিও তারা নিজেরাই আয়ত্ত করতে পারবেন। গোপন পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রকৃত ব্যাপক কোনো প্রকাশ্য গণ-সংগ্রামের

---

৭ পিকিং রিভিউ : জুলাই ২১, ১৯৬৭/পৃষ্ঠা ১৩ ('ইন্দোনেশিয়ান ট্রিবিউন' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত)

পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির কোনো অপ্রকাশ্য কর্মী যদি আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসেন এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে পার্টি যদি পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তাকে পার্লামেন্টে পাঠানোর সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মনে করে, তবে সেই প্রকাশ্য গণ-সংগঠনের মাধ্যমে তাকে নির্বাচনে দাঁড় করানোর যথোপযুক্ত পদ্ধতি একটি বিপ্লবী পার্টি সৃজনশীলভাবে আয়ত্ত ও বিকশিত করতে পারবে না— এ কথা মনে করার কোনো কারণ আছে কি? ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা যা করতে পেরেছেন, আগামী কোনো ভবিষ্যতে প্রয়োজন বুঝলে ভারতীয় বিপ্লবীরা তা করতে পারবেন না— এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমি রাজী নই।

পাঁচ

আমার মনে হয়, বর্তমান বিতর্ক সম্পর্কে পাঠকবন্ধুদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে এই মর্মে যে, তরুণ রায় ও অন্বেষা মিত্র দুজনেই যখন ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্টদের পার্লামেন্ট বয়কট করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মনে করেন, তবে এটা রণকৌশলগত প্রশ্ন, না নীতিগত প্রশ্ন— তা নিয়ে এতো বাক্‌বিতণ্ডার দরকারটা কী?

আমার মনে হয়, দরকার আছে, বিশেষ দরকার আছে। কারণ, এটা যদি রণকৌশলগত প্রশ্নই হয়, তবে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের লাইনকে কার্যকরী করার পথে আইনী ও বে-আইনী সংগ্রামের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে, বাস্তব পরিস্থিতির বিচার কোরে প্রয়োজন বুঝলে আইনী সংগ্রামের অন্যতম রূপ হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবার প্রশ্নটিকেও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে, এবং তা না করলে সংগ্রামের একটি রূপ সম্পর্কে অহেতুক অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করার ফল স্বরূপ একটা একপেশে স্ব-বিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে— ঠিক যেমনটি পড়েছেন অন্বেষা মিত্র। তিনি পুঁজিবাদী দেশে নির্বাচনে অংশ নেবার প্রশ্নটিকে একটি রণকৌশল হিসেবে স্বীকার কোরেও এই বলে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, "এমন কি পুঁজিবাদী দেশসমূহেও পার্লামেন্টারী নির্বাচন বর্জন করাটাই শ্রেয়।" এবং এভাবে মুখে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে একবাক্যে নির্বাচন বর্জন করার লিন পিয়াওবাদী প্রেসকৃপশানের বিরোধিতা কোরেও তিনি নিজে সেই একই প্রেসকৃপশানই হাজির করেছেন। এর পক্ষে তার যুক্তি হচ্ছে এই যে, আধুনিক সংশোধনবাদীরা আজ যখন পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষাক্ত তত্ত্ব ছড়াচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যই এটা করা দরকার। ঠিক এই জাতীয় বন্ধ্যা যুক্তিবিন্যাসের ফলশ্রুতিতেই যে ভারতে সাম্প্রতিককালে 'বাম' বিচ্যুতির চিন্তানায়করা সংশোধনবাদীদের দ্বারা অর্থনৈতিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনগুলির অর্থনীতিবাদের পাঁকে নিমজ্জিত হবার ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে হাজির কোরে গণ আন্দোলনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকেই বরবাদ কোরে দিয়েছিলেন, তিনি তা ভুলে গেছেন। তাহলে তো, আজকের যুগে আধুনিক সংশোধনবাদীরা 'কমিউনিষ্ট পার্টি'র সাইনবোর্ড ব্যবহারে কোরে

বদমাইসী করছে— এই অজুহাতে 'কমিউনিষ্ট পার্টি' নামকেও পাল্টে দিতে হয়। সংশোধনবাদীরা পার্লামেন্ট সম্পর্কে মোহ আজ প্রথম ছড়াচ্ছে না, সেই মার্কস-এঙ্গেলস্-এর যুগ থেকেই ছড়াচ্ছে— কিন্তু সেজন্য সেদিন প্রয়োজন বোধে পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার রণকৌশল বরবাদ হয়ে যায় নি, আজও যেতে পারে না। আর প্রয়োজন হলেও পার্লামেন্টকে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ তা না হলে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে পার্থক্য টানা যাবে না— এ জাতীয় যুক্তি অক্ষমের যুক্তি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রয়োজন হলে পার্লামেন্টে অংশ নেবে বা বর্জন করবে— এবং এ সব কিছু তারা করবে বিপ্লবের স্বার্থে বিপ্লবী পদ্ধতিতে। জলে নামলে ডুবে যাবার ভয় আছে, অতএব সাঁতার জানা সত্ত্বেও প্রয়োজনে জলে নামবো না— এ যুক্তি কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া, ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাই যখন একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয় তখন পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করার বা না করার প্রশ্নটিকে একটি নীতিগত প্রশ্ন হিসেবে দাঁড় করাবার অর্থই দাঁড়াবে, যাঁরা সশস্ত্র জনযুদ্ধের লাইনকে কার্যকরী করার স্বার্থে এই প্রশ্নটিকে একটি রণকৌশল হিসেবে বিচার-বিবেচনা করতে চান, তাদের এক কথায় দূরে সরিয়ে দেওয়া— যা, শেষ বিচারে, বিপ্লবীদের ঐক্যকেই ব্যাহত করবে। আর এ প্রশ্নটিকে রণকৌশলগত প্রশ্ন হিসেবে দেখলে এই সব বিপ্লবীদেরকেও ঐক্যবদ্ধ করা যাবে, এবং রাজনৈতিক বিতর্কের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌছোবার সুযোগ থাকবে, এবং এরাও তা মানতে বাধ্য হবেন। কাজেই, ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতেও এই প্রশ্নটি রণকৌশলগত, না নীতিগত— সে সম্পর্কে সঠিক একটা সিদ্ধান্তে পৌছোনো বিশেষ দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রতিককালে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ কোরে তোলার ব্যাপারে যে সব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা), তাতেও এই প্রশ্নটিকে একটি রণনীতিগত প্রশ্ন হিসাবে গ্রহণ করবার অনমনীয় মনোভাব দৃষ্টিগোচর হয় নি।

এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র কোরে অনেক সমালোচনা বা কটাক্ষপাত মৌখিকভাবে সামনাসামনি বা পেছন থেকে 'অনীক'-এর কর্মীরা পেয়েছেন, কিন্তু কেউই লিখিত মতামত জানান নি— অন্বেষা মিত্রই প্রথম লিখিত সমালোচনা পাঠিয়ে এ-সম্পর্কিত বিতর্ককে সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে সহায়তা করলেন। সেজন্য তাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসংগে আমার বক্তব্যই যে চূড়ান্ত, এমন দাবী আমি কখনই করতে পারি না। তাই আমার বক্তব্যকে 'সূক্ষ্ম সংশোধনবাদ' বলে উড়িয়ে না দিয়ে আমার বক্তব্যের কোনো মৌলিক ত্রুটি কেউ যদি যথোপযুক্তভাবে ধরিয়ে দেন, তবে তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো।

তরুণ রায়

অনীক, এপ্রিল-মে ১৯৭৫

সংশপ্তক-এর লাঙ্গল

সন্তোষ রায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে যে কৃষক আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত কৃষক সমাজকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছিল, সেই 'তেভাগা' আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'লাঙ্গল' নাটকটি অভিনীত হয় গত ২রা এপ্রিল মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে। নাটকটি উপস্থাপনা করেন 'সংশপ্তক' নাট্যগোষ্ঠী।

ভারতবর্ষের জনগণের শতকরা ৭০/৮০ ভাগ লোকই সরাসরি কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তার থেকে সামগ্রিক ভাবে মুক্তির চাবিকাঠি, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা আন্দোলনকে ভিত্তি করে, ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের এক বৈপ্লবিক ধারাবাহিকতার গতি প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক চরিত্র বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এভাবে কোনোদিন করা হয়নি বলেই নাটকটির সার্থকতা স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। চা-বাগানের একজন সর্বহারা শ্রমিকের নেতৃত্বের দিনাজপুরে ভাগচাষী কৃষকেরা জমিদার, জোতদার আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে, ন্যায় সংগত দাবীর ভিত্তিতে যেভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নাটকের কাহিনী। গৌরবময় কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত দালাল কংগ্রেসীদের ঘৃণ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, আন্দোলনের প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা, পার্টির নেতৃত্ব ও ক্যাডারদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, গরীব কৃষকদের সংগ্রামী উদ্দীপনা, বিপ্লবী ছাত্রের আন্দোলনে অংশগ্রহণ, পা চাটা বুদ্ধিজীবীদের নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি, জমিদার-জোতদারদের প্রতিভূ কংগ্রেস মুস্লিম লীগ নেতাদের প্রশাসনিক আমলাদের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিবর্তিত করার অপচেষ্টা প্রভৃতি যেভাবে কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং ফুটিয়ে তোলা হয়েছে— তার জন্য নাট্যগোষ্ঠীকে সহস্র অভিনন্দন। অভিনন্দন আরও এইজন্য যে, আজকের দিনেও ঐ সব প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম আরও অনেক বেশী করে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরোধিতা করছে। পুরোণো পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখার অক্ষমতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী

অহিংস নামধারী দালালদের মাধ্যমে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম করার সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলকে একটি প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরার ঘটনাটি সত্যিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অকুণ্ঠ প্রশংসাযোগ্য। এসব কারণেই একটি প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে 'সংশপ্তক'-এর আবির্ভাবকে স্বাগত জানাই এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা আরও বেশী বেশী করে বিকশিত হয়ে উঠুন, এই কামনা করি।

প্রাথমিক পর্যায়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রয়োগগত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলিকে তুলে ধরছি, যাতে ভবিষ্যতে আরও সুষ্ঠু ও একটি সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টি হিসেবে 'লাঙ্গল' প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। নাটকটি অত্যন্ত দীর্ঘ। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বাদ দিয়ে নাটকটিকে আরও অনেক কম সময়ে মঞ্চস্থ করা সম্ভব। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিপ্লবী ছাত্র সুহাসের পূর্ব-পরিচয়ের পরিকল্পনা (ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে) শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উজ্জ্বল রত্ন তাঁদের সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কিভাবে কৃষি বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দর্শকদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবেই বর্তমান। দ্বিতীয়তঃ, একজন মৃত্যুপথযাত্রী কৃষক অচেতন অবস্থায়ও 'তেভাগা চাই' বলে যেভাবে চীৎকার করে উঠেছিলেন, তাতে তৎকালীন কৃষকের জীবনে তেভাগার আন্দোলন কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে; অথচ কৃষকটিকে 'তেভাগা চাই' বলে চীৎকার করানোর পেছনে যে প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়েছে সেটা হাস্যকর। মৃত্যু পথযাত্রী 'কৃষকটি কি খেতে চায়, কাকে দেখতে চায়' ইত্যাদি ডাক্তারের দীর্ঘ বক্তব্যটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। অর্দ্ধোস্ফুট গোঙানি শুনে ডাক্তার ছুটে গিয়ে কৃষকটি কি বলতে চায় জানতে চাইলে 'তেভাগা চাই'— এই একটি চীৎকারই সমস্ত অর্থকে পরিস্ফুট করবে। তৃতীয়তঃ, শাসক শক্তির প্রতিভূ হিসেবে পুলিশ সুপারের বাহ্যিক বেশ পরিবর্তন এবং ষ্টেনগান-নির্ভর অহিংসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করার আগে দীর্ঘ বক্তৃতা নাটকের গতিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাহত করছে। এটা বাদ দিলে অথবা একান্তভাবে সংক্ষিপ্ত করলে প্রতীকের মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা আরও অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। নাটকের বক্তব্যকে কত বেশী প্রাঞ্জল করা যায় সেই চিন্তা থেকেই যে নাটকের ডায়ালগগুলি অত দীর্ঘ হয়েছে, এটা বোঝা যায়; সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের বুঝবার ক্ষমতাকে ছোট করে না দেখার ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে অনুরোধ করি। নৌকায় চাল পাচারের দৃশ্যটি এবং কংগ্রেস-লীগ নেতৃদ্বয়ের মাতলামির দৃশ্য দুটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র দীর্ঘতার জন্য অনেক মার খেয়েছে। রাজ্য সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারীর বঞ্চনাময়, দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সমস্যাকে তুলে ধরবার অবকাশ এ নাটকে না থাকতে পারে কিন্তু তাঁকে একটি ভাঁড় হিসেবে উপস্থিত করা একটি বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সিরিয়াস বক্তব্যপূর্ণ নাটকেও কিছু ভাঁড়ামীর আমদানী অবশ্য কর্তব্য— এই তথাকথিত 'প্রগতিশীল' চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। কংগ্রেসী এম-এল-এ জোতদারটির কাজকর্মের মধ্যেই ঐ চরিত্রটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত, অথচ তার

মাথায় গৈরিক টুপী, গায়ে সাদা জামা ও পরণে সবুজ ধুতী দিয়ে এক ধরণের খেলো সরলীকরণ করা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল না। নাটকটির যে ঘটনাটির প্রতি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে, মুমুর্ষু ছাত্রকর্মীটির শরীর থেকে গুলি বার করা যাচ্ছে না, অস্ত্রোপচারের সমস্ত যন্ত্রপাতি ডাক্তারের কাছ থেকে পুলিশ কেড়ে নিয়েছে, এ অবস্থায় আহত স্থানটির ওপর রিভলবারের নলটি ঠেকিয়ে গুলি করলেন তাঁরই প্রিয়তম কমরেড। কেন??? সেটা কোনভাবেই পরিষ্কার নয়। দুটো কারণ হতে পারে, এক— পরবর্তী বুলেটটি আগের বুলেটটিকে ঠেলে বের করে দেবে, অথবা অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে আহত কমরেডটিকে মুক্তি দেবার জন্য তাকে মেরে ফেলা। প্রথমটি বৈজ্ঞানিকভাবে অবাস্তব, কারণ দ্বিতীয় গুলির আঘাত অবশ্যই ভীষণভাবে আহত কমরেডটির মৃত্যুর কারণ হবে; দ্বিতীয়টিও অবাস্তব, কারণ কোনো অবস্থায় একজন কমরেড তাঁর প্রিয়তম কমরেডের দেহে ওভাবে আঘাত করতে পারে না। বহু দর্শকের সংগে আলোচনা করেও দেখা গেছে, কেউই ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন নি— ব্যাপারটা বুঝতেই পারেন নি এবং প্রত্যেকেই ব্যাপারটাকে বাদ দেবার সুপারিশ করেছেন। নাট্যগোষ্ঠী ভেবে দেখবেন। উঁচুমানের অভিনয় সকল সময়ই নাটকের সার্থকতার শ্রেষ্ঠ উপাদান— সে ব্যাপারে নাট্য গোষ্ঠীকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। অবশ্য নিষ্ঠার অভাব কোনো শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়নি।

পরিশেষে আরেকটি কথা বলতে চাই। নাটকের সমাপ্তির পর কুশীলবরা ঐক্যবদ্ধভাবে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে মনে হয় কৃষক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়েও তেভাগার দাবীটি একটি প্রধান ও মূল মৌলিক দাবী। এ ব্যাপারটার সংগে একমত হতে পারছি না। অর্থনৈতিক আন্দোলনের দাবী হিসেবে এ দাবীই আজকের মূল দাবী হতে পারে কিনা— তা ভেবে দেখবার বিষয়। আর উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের, এবং তাকে টিকিয়ে রাখার ও বিস্তৃত করার সমস্যাটাই যখন আজকের ভারতের একটি মৌলিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতেই এইসব অর্থনৈতিক দাবীকে দেখতে এবং তুলে ধরতে হবে— না হলে অবশ্যই ভুল হবে।

অনীক, এপ্রিল-মে, ১৯৭৫

জাগবার দিন আজ

বারাসত-বরানগর-কাশীপুর হত্যাকাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শাসকচক্র তার কালো হাত দুটোকে বারে বারে রক্ত রঞ্জিত করেছে বিভিন্ন জেলের ভেতর রাজবন্দীদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। এরই সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হাওড়া জেলে পাঁচজন রাজবন্দী হত্যা। খুনের খতিয়ানে ২০০ বছরের বৃটিশ শাসনকেও লজ্জা দিয়েছে ২৮ বছরের স্বাধীন সরকার— উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হিজ্‌লী জেল হত্যার অভিজ্ঞতাকে এরা কাজে লাগিয়েছে 'গণতন্ত্র'-এর নামাবলী গায়ে দিয়ে, স্বদেশ ও স্বাধীনতাকে 'রক্ষা'র নাম করে।

গত সাত-আট বছরে সারা দেশে সরকারী খুনী বাহিনী পুলিশ-সি আর পি-মিলিটারী আর বে-সরকারী গুণ্ডাবাহিনী মাস্তানের দল হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে খুন করেছে। সেই সব খুনের অকথিত কাহিনীর সংগে যোগ হয়েছে পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলে পাশবিক হত্যাকাণ্ড। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে বা বিচারের প্রহসনে বছরের পর বছর জেলে পচিয়েও তারা শান্তি পাচ্ছে না, ক্ষণে ক্ষণে বিপ্লবের ভূত দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠছে, প্রতিবাদের সামান্যতম কণ্ঠস্বরকেও তারা স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। তাই এই হত্যাকাণ্ড। 'বৃহত্তম গণতন্ত্র'-র সাইনবোর্ড আঁটা পুলিশী রাষ্ট্রে জেলের বাইরের কোটি কোটি মানুষের ন্যায্য অধিকার ও দাবী-দাওয়ার সামান্যতম আন্দোলনকেও তারা বন্ধ করে দিতে চাইছে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের ষ্টিমরোলার চালিয়ে। এই অসংখ্য নাম-না-জানা নিহতের মিছিলে ফ্যাসিবাদী সরকার এবার যোগ করতে চাইছে নথিভুক্ত খুনের শবদেহ। তাই সারা দেশে ১৪ জন বামপন্থী কর্মীকে তাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও কার্যকলাপের জন্য ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিষ্টাগৌড় ও ভূমাইয়া তাঁদেরই অন্যতম। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সোচ্চার দাবীকেও অগ্রাহ্য করে 'আইনী' কায়দায় তাদের খুন করবার হিংস্র আকাঙ্ক্ষায় শাসকশ্রেণী তাদের জল্লাদের খাঁড়াটিতে শান্ দিয়ে চলেছে।

এবং ভারতের বুকে নরখাদকদের এই তাণ্ডব চলছে ঠিক তখনই, যখন দুনিয়ার দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জনের ত্রিংশবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। কিন্তু হিটলার-মুসোলিনী-তোজো-ফ্র্যাংকো প্রভৃতি ঘৃণ্য কীটদের আসন মোটেই শূন্য পড়ে নেই— থিউ-লন নলদের পতন ঘটলেও এখনও সেই স্থান দখল করে আছে শেখ মুজিব আর শাড়ীপরা হিটলারের দল। এবং ইতিহাসের নির্মম রসিকতা হচ্ছে এটাই যে, মস্কোর নয়া জারদের এদেশীয় এজেন্টদের সহযোগিতায় আমাদের দেশের নয়া হিটলাররাই

আবার আজ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' দিবস উদযাপন করছে গেয়োবল্‌সীয় কায়দায়।

আমরা জানি, বিংশ শতাব্দীর এই সত্তরের দশকে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ত্রিংশতম বছরে, ভারতীয় জনগণের ওপর যে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালাচ্ছে নরঘাতী দানবের দল, ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য নিয়মেই সেই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হতে বাধ্য, এবং তাদের যথাযোগ্য স্থান ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে অনিবার্য ভাবেই নিক্ষিপ্ত হবে এই নয়া হিটলারের দল। কিন্তু এদেশেই হিজ্‌লী জেল হত্যার বিরুদ্ধে একদিন ফুঁসে উঠেছিলেন ব্যাপক মানুষ, কাইয়ুর বীর সন্তানের ফাঁসির বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছিলো জনতার ক্রোধ। আজ তাঁরা নীরব কেন? বামপন্থী পার্টিগুলির সমস্ত সক্রিয়তা কেন শুধু বাঁধা পড়ে থাকে বিবৃতির কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে? দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিরস্ত্র অবস্থায় জেলের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখে বিভিন্ন অজুহাতে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারার ঘটনার আর কতো পুনরাবৃত্তি দরকার আমাদের ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য? ফাঁসির দড়িতে কিষ্টা ও ভূমাইয়া, মনোজ পাল সহ ১৪ জন রাজনৈতিক বন্দী প্রাণ বিসর্জন না দিলে আমাদের ক্রোধের আগুন কি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে না?

এইভাবে দফায় দফায় জেলে বন্দীদের খুন করে, বিপ্লবীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শাসকশ্রেণী আসলে চাইছে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিতে, জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলতে, এবং এইসব খুনকে আর পাঁচটা দৈনন্দিন ঘটনার মতোই স্বাভাবিক করে তুলতে। যে হাজার হাজার বন্দী জনগণের স্বার্থে আত্মহত্যার পথে পা বাড়াবার অপরাধে আজ কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, শ্রেণী সমাজের প্রথম কলুষ প্রভাতে শোষণ ও নিপীড়নের স্বার্থে তাদের কথা মনে রেখেই তৈরী হয়েছিলো শৃঙ্খল। আমাদের নীরবতা তাদের জীবনকেই যে কেবল বিপন্ন করে তুলবে তাই নয়, সেই লাঠি আমাদের পিঠের শিরদাঁড়াকেও ভেঙে গুড়িয়ে দেবে, সেই বুলেট আমাদের বুককেও ঝাঁঝরা করে দেবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে, বন্দীমুক্তির ও বিপ্লবীদের ফাঁসি বন্ধ করার দাবীতে এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ বিক্ষোভ ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে, প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই তা ততো সোচ্চার ও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে নি। তাই আজ প্রয়োজন সংগঠিত প্রতিবাদের, সংগঠিত প্রতিরোধের। প্রয়োজন অমর শহীদ ক্ষুদিরাম-মাষ্টারদা-ভগৎ সিংহের গৌরবময় ঐতিহ্যবহনকারী আজকের ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের প্রাণরক্ষার ও মুক্তির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠবার। প্রয়োজন বন্দীমুক্তির দাবীতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলে এবং গণ-আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়ায় শাসকবর্গের বুকের মধ্যেই মৃত্যুর হিমেল হাওয়া বইয়ে দেবার। আমাদের সামনে রয়েছে ইতিহাস। বন্দীমুক্তির দাবীতে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আন্দোলনের ইতিাস, বিজয় অর্জনের ইতিহাস। শেষ বিচারের ফলাফল জ্বল জ্বল করছে আমাদের চোখের সামনেই। জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী। নম্‌পেন থেকে সায়গন পর্যন্ত চারিদিক তাই প্রকম্পিত হয়ে উঠছে জনতার বাঁধভাঙা উল্লাসে। তা দেখে এর পরেও কি আমরা চুপ করে বসে থাকবো?

গণতান্ত্রিক হত্যা?

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমরা এক আশ্চর্য গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি— যে গণতন্ত্রে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে যে কোন যুবককে ইচ্ছামত গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় এবং বিচারের নামে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর জেলখানায় বন্দী করে রাখা যায়। কেবল বন্দী করে রাখা নয়, যে কোন অপরাধের অপবাদ দিয়ে সেই হতভাগাকে জেলের মধ্যে গুলী করে কিম্বা ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়! অথচ বাইরে যখন জয়প্রকাশ নারায়নের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে যে, শাসক পার্টির বিরোধীরা ভারতে ফ্যাসিজম কায়েম করতে চাইছে, তখন শাসক পার্টির সরকারী কারাগারেই রাজনৈতিক বন্দীদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং এই ভয়াবহ ঘটনাগুলির দিকে তাকিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বন্দীশালার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি গণতান্ত্রিক শাসনের নমুনা কিম্বা ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার নতুন মহড়া, তবে তার জবাব কি হবে।...

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের জীবন, জীবিকা, ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের অধিকার রয়েছে। সেই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দমন-নীতির ষ্টিমরোলার বৃটিশ আমলের মতই কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছে। কৃষক, শ্রমিক খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠি ও বন্দুক অজস্রবার উদ্যত হয়েছে। এমনকি ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যের দাবী ও রুটির দাবীকে পর্যন্ত পুলিশের গুলীতে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মিলিটারীকে পর্যন্ত দমন ও পীড়নের কাজে নামানো হয়েছে।...

প্রকাশ যে, আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক কর্মীকেই জেলখানাতে রাজবন্দীদের বা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয় নি। অথচ ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যাঁদের 'গণতান্ত্রিক শাসনে' আজ জেলখানার অভ্যন্তরে গুলী চলে, তাঁদের শীর্ষ নেতারাই একদা বৃটিশ আমলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেছিলেন, এবং সেই আন্দোলনের ঢেউ বৃটেনে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ...আজ ২৭ বছর পর স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের পাহারাদাররূপে দেখা দিয়েছে মস্তানরা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা। সুতরাং জেলখানার অভ্যন্তরে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডকে গণতন্ত্রের আশীর্বাদ বলেই মেনে নিতে হবে। কেননা, আমরা গান্ধী-শিষ্যদের অহিংস রাজত্বের বাসিন্দা!

যুগান্তর : মে ১৭, ১৯৭৫

নম্‌পেন থেকে সায়গন

মাত্র পনেরো দিনের মধ্যেই জনজোয়ারের এক উথাল-পাথাল ঢেউ নোতুন করে কাঁপিয়ে দিলো পুরোণো দুনিয়ার 'স্বর্গরাজ্যটাকে'। নম্‌পেনের বুকে আছড়ে পড়া জনতার বাঁধভাঙা উল্লাস দুনিয়া প্রকম্পিত করে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে নোতুনতর জনকল্লোল জাগিয়ে তুললো সায়গনের বুকেও— মুক্তিযোদ্ধাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির ট্যাংকটা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের হাতে-গড়া দালালচক্রের নকল সিংহদ্বার। মেকং-এর সেই উত্তাল ঢেউ সাড়া তুলেছে আজ আমাদের গঙ্গার বুকেও, শোষণ মুক্তির রক্তিম স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোটি কোটি ভারতীয় জনতাও তাই বাঁধভাঙা উল্লাসের জোয়ারে হয়ে উঠেছেন অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত, দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই জোয়ারের ঢেউ।

কাম্বোদিয়া ও ভিয়েতনামের গৌরবময় এই বিজয়কে স্বাগত জানাতে গিয়ে দু'টি প্রশ্ন আজ আমাদের মনে সোচ্চার হয়ে উঠছে। প্রথম প্রশ্নটি ইন্দোচীনের জনগণের ধারাবাহিক অগ্রগতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ভারতের বুকে ইন্দোচীনের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের শিক্ষাকে প্রয়োগ করা সম্পর্কে।

ইন্দোচীনের তিনটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে অপরিমেয় আত্মত্যাগ ও অতুলনীয় বীরত্বের যে মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে আজ কাম্বোদিয়া মুক্ত হয়েছে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্ত হয়েছে এবং ভিয়েতনামের দুই অংশকে পুনরেকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এমন কি লাওসেও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের কোনঠাসা করে বিপ্লবীরা এগিয়ে চলেছেন। এসব কিছুই এই তিনটি দেশকে গণ-বিপ্লবের এক নোতুনতর ও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের বিজয় অর্জনই শেষ কথা নয়, বরং বলা যায়, শোষণ-মুক্তির মহান লক্ষ্যের দিকে এগুলি এক একটি বিরাট পদক্ষেপমাত্র, শোষণ-মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে এখনও এসব দেশের জনগণকে পার হতে হবে আরও অনেকগুলি পাহাড়। কিন্তু আগামী দিনে এইসব পাহাড়গুলি পার হবার ধারাবাহিক লড়াই কি নির্বিঘ্নে ঘটবে, পরাভূত সাম্রাজ্যবাদ-সহ এসব দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা কি সেই অগ্রগতির পথকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলবে না? নিশ্চিত পরাজয়ের পরেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামের ও কাম্বোদিয়ার বিরাট এক জনসংখ্যাকে 'মানবিকতার' অজুহাতে জোর করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে যে নোতুনতর চক্রান্তের সূচনা করেছে, নিজেদের কাগুজে বাঘের

চরিত্রটা ধরা পড়ে যাবার পরেও কাম্বোদিয়ার জলপথে অনুপ্রবেশকারী 'মায়াগুয়েজ' জাহাজকে 'উদ্ধার' করার নাম করে জলদস্যুতার যে নোতুনতর অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে, চীন-সহ দুনিয়ার প্রতিটি প্রগতিশীল শক্তি ও মানুষের প্রবল নিন্দা ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা এই পর্যুদস্ত বৃহৎ শক্তির ভবিষ্যৎ ছলা-কলা ও চক্রান্ত সম্পর্কেও সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। আর 'সমাজতন্ত্রের' আবরণে ঢাকা অন্য বৃহৎ শক্তি রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এতোদিন ভিয়েতনামে কিছুটা রেখে-ঢেকে এবং কাম্বোদিয়ায় প্রায় খোলাখুলিভাবেই জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে পেছন থেকে ছুরি মেরে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছে। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটেছে এবং তার ফলে সেখানে যে তথাকথিত 'শক্তিশূন্যতা' সৃষ্ট হয়েছে, দুনিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিনী বৃহৎশক্তির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ নয়া জাররা কি তার সুযোগ নিয়ে সেখানে নিজেদের সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী থাবাটা প্রসারিত করার নিত্যনোতুন চক্রান্ত না চালিয়ে 'বুদ্ধ' বনে যাবে? তাদের আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ও ছল-চাতুরির যে সব প্রমাণ আমরা অতীতে পেয়েছি, তা থেকে কিন্তু তাদেরকে 'সুবোধ বালক' বলে ধরে নেবার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। এবং এসব থেকে একটি সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে যে, ভিয়েতনাম ও কাম্বোদিয়ার জনগণের অগ্রগতির আগামী ইতিহাসও আগের মতোই জটিল ও কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যারা কয়েক দশক ধরে এতো আত্মত্যাগ ও এতো বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আজকের গৌরবময় বিজয়ের দুয়োরে এসে পৌছেছেন, ভবিষ্যতেও তারা একইভাবে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে গণ-বিপ্লবের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সমর্থ হবেন— এবং এ ব্যাপারে দুনিয়ার প্রতিটি প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন আগের মতোই তারা পাবেন।

আর ভারতের বুকে দেখা যাচ্ছে, সব রাজনৈতিক শক্তিই আজ ভিয়েতনাম ও কাম্বোদিয়ার জনগণের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করছেন। কিন্তু এদের মধ্যে কার কার এই উল্লাস প্রকৃত ও আন্তরিক, কার কার সেটা লোক-দেখানো— সেটা কি আমরা ভেবে দেখবো না? ভেবে দেখবো না কি, এদের মধ্যে কাদের প্রকৃতই অধিকার রয়েছে ভিয়েতনাম কাম্বোদিয়াকে লাল সেলাম জানাবার?

প্রথমতঃ, এদেশের বুকে যারা আজ ফ্যাসিষ্ট নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়ে জনগণকে মূক ও স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, ভারতীয় বিপ্লবীদের বা বিপ্লবের শুভেচ্ছাসম্পন্ন বামপন্থী কর্মীদের হত্যা করে বিপ্লবের গতিরোধ করার মিথ্যে স্বপ্ন দেখছে, তাদের— অর্থাৎ ভারতের শাসকশ্রেণীর তথা শাসকদলের— কোনো কারণ নেই ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার জনগণের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করবার, এবং সে কারণেই হাজার বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও তাদের এই তথাকথিত আনন্দকে আমরা আন্তরিক বলে মনে করতে পারছি না। এবং একথা বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দলগুলি সম্পর্কেও সমভাবেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়তঃ, মস্কোর যে ভারতীয় অনুচরবৃন্দ, অর্থাৎ সি-পি-আই, দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথকে বর্জন করে তথাকথিত শান্তিপূর্ণ পার্লামেন্টারী বন্ধ্যা পথকে জনগণের

মুক্তির পথ বলে তুলে ধরছে এবং মস্কোর প্রভুদের নির্দেশে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর সংগে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় বিপ্লবের প্রতি খোলাখুলিভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদেরও কোনো অধিকার নেই এখন ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার নাম ভাঙিয়ে বাজার গরম করবার।

তৃতীয়তঃ, এদেশে ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের স্ব-ঘোষিত 'সবচয়ে বড়ো সমর্থক' সি-পি-আই (এম) দলের ব্যাপক জঙ্গী ও বিপ্লবী শুভেচ্ছাসম্পন্ন কর্মীদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ না থাকলেও, তাদের নেতৃত্বের আন্তরিকতা বা এ-সম্পর্কিত অধিকার সম্পর্কে আমাদের প্রচণ্ড প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, তারা ভিয়েতনাম নিয়ে বাজার গরম করার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলেও, ভিয়েতনামের শিক্ষাকে এদেশের পরিস্থিতি অনুসারে এদেশের মাটিতে প্রয়োগ করার সমস্ত প্রচেষ্টার সচেতন বিরোধিতাই এতোদিন ধরে করে এসেছেন, মুখে "নির্বাচনের মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তি আসবে না" ইত্যাদি ঘোষণা করেও তাদের নেতৃত্বে সমস্ত আন্দোলনকেই নির্বাচন-মুখী করে রেখেছেন, "এদেশেও ভিয়েতনাম গড়ার" হুংকার ছেড়েও শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিষ্ট হামলার বিরুদ্ধে সাধারণ কর্মীদেরকে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন। এবং তারা যাতে ভিয়েতনামের পথ অনুসরণ করে পাল্টা আঘাত না হানেন তার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, ভিয়েতনামকে মুক্ত করার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে ভিয়েতনামের জনগণের ওপর নির্ভরশীলতার মার্কসবাদী লেনিনবাদী লাইনকে বরবাদ করে রুশ সংশোধনবাদীরা বাইরের সাহায্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেবার যে কুৎসিৎ বহির্কারণ তত্ত্ব বাজারে চালু করেছে, তার প্রতিধ্বনি করে তারা এতোদিন ধরে কর্মীদেরকে বুঝিয়ে এসেছেন যে, চীন যদি রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে 'যুক্ত কার্যক্রম' গ্রহণ করে, তাহলেই কেবল ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ঘটবে। কিন্তু তাদের এই নীতিবিরোধী থিসিসের দেউলিয়াপনা প্রমাণ করে দিয়ে ভিয়েতনাম ও কাম্বোদিয়ার জনগণ যখন মূলতঃ নিজেদের ওপরেই নির্ভর করে আজ মুক্তি অর্জন করেছেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই এদের আর অধিকার থাকতে পারে না ভিয়েতনামের নাম মুখে আনার।

আর যারা ভিয়েতনামের শিক্ষাকে মূলতঃ গ্রহণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশের কোটি কোটি মেহনতী জনগণকে শোষণমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে পথে আত্মনিয়োগ করে অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী মনোভাবের এক চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তারাই যথার্থ অর্থে এ দেশে ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছেন। এবং তাঁরাও যে সাময়িকভাবে হলেও আজ অনেকটা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন, তারও মূল কারণ হচ্ছে এটাই যে, ভিয়েতনামের লড়াইয়ের পথ অনুসরণ করেও তাঁরা ভিয়েতনামের বহু শিক্ষা থেকেই বিচ্যুত হয়েছিলেন— দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের বদলে তাঁরা 'দ্রুত বিজয়ের' তত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন, গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠনের গুরুত্বকে তাঁরা বরবাদ করে দিয়েছিলেন, রণ-কৌশলের প্রশ্নে

যথোপযুক্ত নমনীয়তার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাজেই, আজ যখন এ দেশের বিপ্লবীরা নিজেদের অতীত ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে এগোবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন ভিয়েতনামের শিক্ষা তাঁদেরকে অবশ্যই জীবন্তভাবে সাহায্য করবে, এবং এ দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামের শিক্ষার জীবন্ত প্রয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার নামে জয়ধ্বনি দিয়েই ভারতীয় জনগণের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না— ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার বিপ্লবী শিক্ষাকে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করাটাই হবে ইন্দোচীনের জনগণের প্রতি ভারতের জনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা-উপহার।।

অনীক, জুন ১৯৭৫

ভারত, সিকিম, এবং চীন

এ বছরের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে চীনা খেলোয়াড়দের ভারতে আগমনে ভারত চীন মৈত্রীর এক নোতুন আবহাওয়া যখন সৃষ্ট হয়েছিলো, তখন থেকেই ভারত-চীন মৈত্রীর পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক রুশ নয়া জারদের ভারতীয় অনুচরবৃন্দ নব উদ্যমে এই আবহাওয়াকে কলুষিত করে দেবার চক্রান্ত চালাতে শুরু করেছিলো। শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত-নিপীড়িত ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভকে দমিয়ে দেবার এবং আসন্ন নির্বাচনের পাথেয় তৈরী করার প্রয়োজনে সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তস্যা সাঙ্গোপাঙ্গবৃন্দ নোতুন করে "চীনা জুজুবুড়ীর" ভয় দেখাতে শুরু করে বস্তুতঃ ভারত-চীন মৈত্রী বিরোধী সেই চক্রান্তকেই মদৎ দিয়েছে। তারপর সিকিম প্রশ্নে চীন সরকারের ন্যায়সংগত অবস্থানকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে ভারত সরকার অভিযোগ তুলেছে— চীন নাকি ভারতের "অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে"। এবং এই প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতিতে রুশ নয়া জারদের সেবাদাস 'প্রগতিশীল' কংগ্রেসী-সি.পি.আই ঘৃণ্য জোট দিল্লীর চীনা দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এই চক্রান্তকে আরও জোরদার করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও এ জাতীয় অনেক ঘটনা ঘটবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে।

অর্থাৎ, সিকিম প্রশ্নে চীনের অবস্থানকেই এখন ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা হাতের তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। কিন্তু এ ব্যাপারে চীনের অবস্থান কি সত্যিসত্যিই অযৌক্তিক? সিকিম কি সত্যি সত্যিই ভারতের "অভ্যন্তরীণ ব্যাপার"? দৃষ্টিকে একটু দূরে প্রসারিত করলেই দেখতে পাচ্ছি, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ছেঁড়া জুতোটা পায়ে গলিয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে ভিয়েতনাম ও কাম্বোদিয়ায় তার আগ্রাসী ঈগলের ডানা মেলতে শুরু করেছিলো 'গণতন্ত্র' রক্ষার 'পবিত্র' আদর্শকেই সামনে রেখে, 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তারা সেখানে বেয়নেটের ডগায় 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' অনুষ্ঠিত করে পা-চাটা দালালদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলো— এবং কার্যতঃ ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়াকে তারা নিজেদের "অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" হিসেবে প্রচার করতো। কিন্তু ভিয়েতনামের জনগণ তাদের সেই জলদস্যুর যুক্তি মানেন নি, কাম্বোদিয়ার জনগণ মানেন নি, ইন্দোচীনের জনগণ মানেন নি, বস্তুতঃ দুনিয়ার কোনো দেশের জনগণই মানেন নি— এবং আজকের নির্মম ইতিহাস তাঁদের পক্ষেই রায় দিয়েছে। ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়ার জনযুদ্ধ ছিলো ন্যায়সঙ্গত (যে কথা আজ ভারতীয় শাসকশ্রেণীও 'প্রগতিশীলতা' জাহির করার স্বার্থে

অস্বীকার করতে পারছে না), এবং সেকারণে ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়া আর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের "অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" থাকে নি, বরং চীন-সহ দুনিয়ার যতো দেশ ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়া জনযুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়ে গেছে, তাদের অবস্থানটাই ছিলো সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছেঁড়া জুতো পায়ে গলিয়ে রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনের ভিত্তিতে সিকিমে ঠিক একই রকম আগ্রাসী নীতিকে কার্যকরী করেছে, এবং চীন-সহ দুনিয়ার যে সব দেশ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সিকিমের জনগণের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবীকে সমর্থন করেছে, তাদের অবস্থানটাও ঠিক একই রকমভাবেই সঠিক ন্যায়সঙ্গত— সিকিম একমাত্র জলদস্যুদের দৃষ্টিতে ছাড়া আর কারও দৃষ্টিতে ভারতের "অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। ভিয়েতনাম ও কাম্বোদিয়ার জনগণ যেমন নিজেদের রক্তের দামে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সিকিমের জনগণও ঠিক একইভাবে সুনিশ্চিতভাবেই তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর স্বীকৃতি আদায় করে নেবেন।

অনীক, জুন ১৯৭৫

সায়গন ঃ ১লা মে, ১৯৭৫

অনুপম সেন

কেমন আশ্চর্য দ্যাখো— ইতিহাস কথা বলে অমোঘ নিয়মে!
১৯৪৫, ৩০শে এপ্রিল।
বার্লিনের অন্ধকার কোণে মাটির গহ্বরে—
ছাই হয় অসাড় হিটলার।
মুক্ত নিঃশ্বাসে ভরে— পাশ্চাত্যের শত ভগ্নস্তূপ।

অতিক্রান্ত দশক তিনটি—
পচাত্তরের তিরিশে এপ্রিল।
সায়গনের রাজপথে
লক্ষ বর্ষ উপবাসী অতৃপ্ত কামনার রুদ্ধ নিঃশ্বাস
চূর্ণ বিচূর্ণ করে ডলারের সদম্ভ প্রাকার।
মুক্তির সূর্য স্নান
প্রাচ্যের আনাচে কানাচে।
বন্ধ্যা নারীর পুত্র
সাহারায় রাশি রাশি মেঘ
কিংবা মঙ্গলে মানুষের পা—
নিতান্তই তুচ্ছ আজ।

এখন পৃথিবীর একোণ-সেকোণে দুরন্ত হিল্লোলে
ভেসে চলে সমুদ্র সফেন
দুটি স্বপ্ন, দুটি নাম—
সায়গন— নমপেন্!
ইতিহাস কথা বলে অমোঘ নিয়মে!
সেদিন বার্লিনের মতো
যুগান্তের অভিশাপ মুছে—
সায়গনের পথে পথে আমাদের উৎসব—
মে দিবস, মে দিবস।

অনীক, জুন, ১৯৭৫

ঝড় আসছে!

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে প্রচণ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। এদেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতাকে শাসন ও শোষণ করবার ক্ষমতার অধিকার নিয়ে এদেশের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-থেকে বঞ্চিত দুই অংশের মধ্যে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই, এবং যবনিকার আড়াল থেকে যে খেয়োখেয়িকে মদৎ দিয়ে চলছে দুটি বৃহৎ আধিপত্যবাদী শক্তি সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ, তারই ফলশ্রুতিতে ক্রমশঃই ঘন হয়ে উঠছে কালো মেঘের পুঞ্জ, যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড বিভীষিকাময় এক ঝড়ের রূপ নিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ ধরা পড়ছে।

আজকের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করতে গেলে ধরা পড়বে, আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হচ্ছে জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কী প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে, কী আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজার হিসেবে, কী গণ-জাগরণের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের রণনীতিগত ঘাঁটি হিসেবে ভারতের গুরুত্ব অসাধারণ। একথা মনে রেখেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে তাদের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের মধ্যমণি হিসেবে গণ্য করতো। শেষ পর্যন্ত বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণই থেকে যায়, এবং পরবর্তীকালে তাদের ক্রম-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এশিয়ার বুকে তাদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে হাসিল করার জন্য ধূর্ত চক্রান্ত শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় শাসকশ্রেণী নিজেদের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার তাগিদে গত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে সক্রিয়ভাবেই তাদের সেই চক্রান্তের শরিক হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মৌলিক নিয়মই হচ্ছে দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির মধ্যে পারস্পরিক খেয়োখেয়ি। এই নিয়মের ফলশ্রুতিতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও ভারতের ওপর বেশিদিন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি, অচিরেই এদেশে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ। স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করে সংশোধনবাদী চক্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বুর্জোয়া

একনায়কত্ব (যেহেতু সংশোধনবাদীদের শ্রেণীচরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া), ধীরে ধীরে ও সুপরিকল্পিতভাবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দিয়ে এবং মুনাফাকে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলো রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে, এবং পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা। এভাবেই লেনিন-স্তালিনের হাতে গড়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন রূপান্তরিত হয়েছিলো সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী* ("মুখে সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ") সোভিয়েত ইউনিয়নের। ষাটের দশকের শেষদিক থেকে মস্কোর এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী নয়া জাররাই দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রধান পাণ্ডা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে। স্বভাবতঃই তারাও এশিয়ার বুকে তাদের প্রতিবিপ্লবী স্বার্থসিদ্ধির ঘাঁটি হিসেবে ভারতের বিশেষ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো একই পদ্ধতিতে প্রথমে অর্থনৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়েই ভারতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক এক প্রচেষ্টা শুরু করে। এভাবেই সত্তরের দশক শুরু হবার আগে থেকেই ভারতের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে দুই বৃহৎ আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিনটি দশক ধরে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও শোষণ চালাতে গিয়ে জনগণের দুনিয়াজোড়া ব্যাপক ঘৃণা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড এক সার্বিক সংকটে জর্জরিত হয়ে পড়ে, তার ফলশ্রুতিতে তাকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সাময়িক ও আংশিকভাবে হলেও অনেকটা পিছু হটে আসতে হয়, এবং গত কয়েক বছর ধরে এদেশে অনেকাংশেই তার স্থান দখল করে নিয়েছে মস্কোর নয়া জাররা। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন অংশের ওপর এ মুহূর্তে তাই তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণই অনেক বেশি। তাদের এই নিয়ন্ত্রণ আজ প্রতিফলিত হচ্ছে শাসক কংগ্রেস দলের ক্ষমতাসীন অংশ এবং এদেশে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ট সিপিআই-এর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও তার হারানো স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে, এবং তাদের এই ক্ষমতা দখলের লড়াই মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী শক্তি ও শাসক কংগ্রেস দলের 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। ইন্দিরা সরকারের 'গরীবী হটাও' স্লোগানের নির্লজ্জ ভাঁওতাটা আজ যখন এদেশের ব্যাপক মেহনতী জনতার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনাহারে অর্ধাহারে শোষিত এবং ফ্যাসিবাদী দমননীতির নির্মম পেষণে নিপীড়িত জনগণ আজ যখন গুমরে গুমরে উঠছেন, বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন, কিন্তু সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না তখন মার্কিণ লবীর এই সব

* লেনিন : Collected works / vol. 29, p- 302 / Moscow, 1965 Edn.

শক্তিগুলিই জয়প্রকাশ নারায়ণকে সামনে রেখে এবং কংগ্রেসের 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর পরোক্ষ সহায়তায় জনগণের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, জনগণের সরকার বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসেবে জয়প্রকাশের আন্দোলন এদেশের বর্তমান দম-বন্ধ করা ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার যে সুযোগ করে দিয়েছে, বিভিন্ন সংসদীয় দল তো বটেই, এমনকি কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরাও, সঠিক যুক্তিতেই, সেই আন্দোলনে কম-বেশি সামিল হয়েছে। এরই প্রমাণ বহন করেছে গত ৫ই জুন কলকাতার বুকে প্রায়-অভূতপূর্ব এক জনজোয়ারের ঢেউ, জয়প্রকাশকে সামনে রেখে প্রধানতঃ বামপন্থীরা এবং আংশিকভাবে হলেও কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা সেদিন বজ্রগর্জনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে, এবং জনতার সেই কল্লোলের পাশে ৭ই জুন শাসকদলের প্রায় ভাড়া-করা মিছিল, শাসকদলের পাণ্ডাদের বহু তর্জন-গর্জন সত্ত্বেও, নিতান্ত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এবং এ সব কিছুই ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট গণ-বিক্ষোভের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

এই যখন অবস্থা, ঠিক সেই মুহূর্তে শাসকদলের পক্ষে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এবং বিরোধীদের পক্ষে মেঘ না চাইতেই জলের মতো ঘোষিত হয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়— দুর্নীতির অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের নির্বাচনকে বাতিল করে দিয়ে। এতো বড়ো রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়ের পর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম আস্থা সম্পন্ন ও ন্যূনতম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তিই পদত্যাগ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ তো করেনই নি, উপরন্তু যেন তেন-প্রকারেণ লোক জড়ো করে তথাকথিত "জনগণের রায়" দিয়ে "আদালতের রায়"কে বানচাল করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন— এবং অদূর ভবিষ্যতে পদত্যাগের সামান্যতম ইঙ্গিতও তার দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে একটা হাস্যকর ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরা কোনো দেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রে বিচার ব্যবস্থাকে 'শ্রেণী ঊর্ধ' একটা পবিত্র ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করলেও, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের এই ব্যাখ্যা কোনো ক্রমেই স্বীকার করেন না, তারা বরং বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থাকেও মেহনতী জনতাকে শোষণ ও দমনের যন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রেরই একটি অংগ হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু বর্তমান ভারতে ইতিহাসের একটা নির্মম রসিকতাই হচ্ছে এই যে, শাসক কংগ্রেস দলের মাতব্বর থেকে শুরু করে চুনোপুঁটিরা পর্যন্ত এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে মানতে অস্বীকার করছে, এবং একে "প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত" বলে হৈ হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। এবং এসব কিছুই শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছে।

"ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে" এলাহাবাদ কোর্টের রায় সত্ত্বেও— ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত— এই বক্তব্যের পেছনে সমর্থন কম নেই! মস্কোর নয়া জাররা এবং তস্য সিপিআই-নামধারী অনুচরবর্গ এবং তাদের সংজ্ঞা

অনুসারে তথাকথিত 'প্রগতিশীল' কংগ্রেসীরা তো বটেই, এমন কি বিড়লা-সিংহানিয়া-জৈন-গোয়েংকা-চরতরাম প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়ারাও প্রকাশ্যেই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সমবেত হয়েছে। আর সমস্ত সরকার-বিরোধী দল তো বটেই, এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেকার 'বিদ্রোহীরাও' ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করছে। দেশের মোটামুটি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরাও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে চলে গেছেন। এক কথায়, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে তাদের অনুগামী তথা সমর্থকেরা এবং বিড়লা প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়াদের এক বিরাট অংশ আজ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে অপরিহার্য বলে দাবী করেছে— এবং মার্কিনী লবীর দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি, সংসদীয় বামপন্থী দলগুলি, এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করছে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী কী করবেন? স্পষ্টতঃই তার সামনে দুটি মাত্র বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। প্রথমতঃ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাধারণ রীতিনীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে পারেন। বস্তুতঃ শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী লোকজনেরা প্রকাশ্যে বা পরোক্ষভাবে সেটাকেই সঠিক অবস্থান বলে মনে করছে। কিন্তু এই পন্থা গ্রহণ করার পথে ঝুঁকি রয়ে গেছে অনেক। যদিও প্রায় প্রতিটি সাধারণ লোকই একথা বিশ্বাস করে যে, সুপ্রিম কোর্টে গত বছর সমস্ত প্রচলিত রীতি-নীতি উপেক্ষা করে যেভাবে 'কমিটেড' বিচারকদের প্রধান পদে বসানো হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে এলাহাবাদ কোর্ট আজ যে রায়ই দিক না কেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় অবশ্যই ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে যাবে— তবুও, সুপ্রিম কোর্টের ছুটিকালীন বিচারক যেভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে নিঃশর্ত ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালাতে দিতে অস্বীকার করেছেন, তার পরে এব্যাপারে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কিছুটা অনিশ্চিতি দেখা দিয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত অন্ততঃ ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন, এবং সাময়িকভাবে জগজীবন রাম জাতীয় কেউ সে পদে অধিষ্ঠিত হন, তবে শাসকদলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য যে শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে চলে যাবে, তা বলা মুস্কিল। এটা সবারই জানা যে, জগজীবন রাম প্রমুখরা প্রকাশ্যতই মস্কো-বিরোধী, এবং মূল ক্ষমতা যার হাতে, তার সমর্থকও শাসকদলের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই বাড়তে থাকে— ১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইণ্ডিকেট বনাম সিণ্ডিকেটের লড়াই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেছে। কাজেই, ইন্দিরা গান্ধী একসপ্তাহ বা একমাসের জন্যও বিচারব্যবস্থার প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে ক্ষমতা জগজীবন রামের হাতে তুলে দেন, তবে স্বভাবতঃই কংগ্রেস দলের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী লোকেরা একটা সুবিধেজনক অবস্থানে চলে যাবে এবং মস্কোপন্থীদের কোণঠাসা করে দেবার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। তার ফলশ্রুতিতে ইন্দিরা গান্ধীর তথা মস্কোপন্থীদের পক্ষে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসাটা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। আর সুপ্রিম কোর্ট যদি শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে রায় দেয়, তাহলে তো কথাই নেই, ছ'বছর ইন্দিরা গান্ধী আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না— অর্থাৎ তার রাজনৈতিক অবসর গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়বে। কাজেই,

সাময়িকভাবে হলেও পদত্যাগ করে মুখ বাঁচানোর এই প্রথম বিকল্প পথটি ইন্দিরা গান্ধী তথা মস্কোপন্থী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে প্রচণ্ড বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে— এবং সেকারণেই এ পথ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের কোনো উদ্যোগ বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

এবং এর বিপরীত যে দ্বিতীয় বিকল্প পথটি খোলা রয়েছে— অর্থাৎ গায়ের জোরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত আবরণকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে খোলাখুলি ফ্যাসিস্ট ডিক্‌টেরশিপ জারী করার পথ সেদিকেই মনে হচ্ছে, ইন্দিরা পন্থী তথা মস্কোপন্থীরা ঝুঁকে পড়ছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বের হবার পর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লীর জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়ে হাজার হাজার ইন্দিরাপন্থীদের সমবেত করার যে পথ তারা গ্রহণ করছে, প্রকাশ্যেই 'জনগণের রায়' দিয়ে 'আদালতের রায়'কে নস্যাৎ করে দেবার যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ২০শে জুনের বাংলা বন্‌ধকে বানচাল করবার জন্য অভূতপূর্ব যে পাশব শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রতিদিন সারা দেশে অসংখ্য বক্তৃতা-মিছিল ও আকাশবাণীর মাইনে করা প্রচারকের মাধ্যমে "জাতীয় স্বার্থে" ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের অনিবার্যতা নিয়ে যে হুংকার ছাড়া হচ্ছে, সমস্ত বিরোধী দলগুলির ইন্দিরা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে যে ভাবে "ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত" বলে গোয়েবল্‌সীয় কায়দায় প্রচার চলছে— সে সব কিছুই ইন্দিরাপন্থীদের সেদিকে যাবার ইঙ্গিতকেই সুস্পষ্ট করে তুলছে।

এ প্রসঙ্গেই স্মরণীয় মস্কোর নয়া জার ব্রেজনেভের মুখনিঃসৃত সেই 'মহান' বাণী, যেটা সে গত ১৯৭৩ সালে দিল্লীতে এসে বলেছিলো— "ভারতে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্বের কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাই না।" এ বছরেরই গোড়ার দিকে বাংলাদেশে শেখ মুজিব যখন ব্রেজনেভের সেই মহান বাণীকেই কার্যকরী রূপ দিয়ে সমস্ত বিরোধীদলকে বেআইনী করে দিয়ে এবং একচ্ছত্র একনায়কত্ব কায়েম করে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলো, তখন মস্কোর নয়া জার এবং ভারতের ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যেই তার সেই ফ্যাসিবাদী পদসঞ্চারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। তখন আমাদের দেশের অনেকেই একটু অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীও শেখ মুজিবের পথ নেবেন কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা চলেছিলো। আজ মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আর বিশেষ বিতর্কের অবকাশ থাকছে না, ঘটনার গতি সুস্পষ্টভাবে সেদিকেই এগোচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে ইন্দিরা গান্ধীরা বিদেশী আক্রমণের জুজুবুড়ীর ভয় দেখিয়ে এ দেশের বর্তমান ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখতে চাইছেন। তারপর আবার ইন্দিরা-বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলির দ্রুত পুনর্বিন্যাস ও অগ্রগতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের ওপর তাদের সুস্পষ্ট প্রভাববৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার জন্য ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠি যদি "প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট চক্রান্তের" অজুহাত তুলে দেশের সমস্ত বিরোধী শক্তিকেই "জাতি ও গণতন্ত্রের শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর পুলিশ-মিলিটারি-মাস্তান দিয়ে তীব্রতর হামলা শুরু করে, তাদেরকে এবং কংগ্রেসের মধ্যেকার মস্কো-বিরোধী গোষ্ঠির লোকজনদেরও কারারুদ্ধ করে, শেখ মুজিবী কায়দায় সমস্ত রকম

বিরোধী অভিমতের কণ্ঠরুদ্ধ করে, এবং এভাবে মহামতি ব্রেজনেভ-নির্দেশিত পথে শেখ মুজিবী কায়দায় আমাদের দেশেও নোতুন কোনো 'বিপ্লব' সংঘটিত করে বসে— তবে সেটা খুব স্বাভাবিক ঘটনাই হবে। এবং স্বভাবতঃই তখন মস্কোর নয়া জাররা ও তাদের ভারতীয় অনুচররা এবং বিড়লা-জৈন প্রভৃতি বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাবে— এবং এভাবে ভারত মস্কোর নয়া জারদের ফর্মুলা অনুসারে দ্রুত 'সমাজতন্ত্রের' দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করবে।

এই মুহূর্তে ভারতের আকাশে-বাতাসে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতই ধরা পড়ছে— আঘাত আসছে! এ আঘাত এ মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে ভারতে ক্ষমতার অধিকার নিয়ে সোভিয়েত ও মার্কিণ দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ নিয়ে এলেও, বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি ও বিপ্লবীরাও এ আঘাত থেকে রেহাই পাবেন না, রেহাই পাবেন না গণতান্ত্রিক মানুষেরা, দেশের কোটি কোটি মেহনতী জনতা। ফ্যাসিবাদ যে অজুহাত খাড়া করে, যে রূপ নিয়ে এবং যে শ্লোগান নিয়েই আবির্ভূত হোকনা কেন— হিটলারের ও শেখ মুজিবের "এক জাতি, একদল ও এক নেতা"র শ্লোগানের সঙ্গে ইন্দিরাপন্থীদের "ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত" শ্লোগানের মূলগত কোনো পার্থক্যই নেই— ফ্যাসিবাদী উন্মত্ততার সামনে কারও রেহাই নেই। এ আঘাত যদি আসে, তবে এ মুহূর্তে তার প্রধান লক্ষ্য মার্কিণ লবীর নেতৃবৃন্দ স্বভাবতঃই অকেজো হয়ে পড়বেন। এমনকি বিভিন্ন সংসদীয় দলগুলিও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে— এবং বল্গাহীনভাবে এগিয়ে চলবে ফ্যাসিবাদের কালো ঘোড়া, তীব্রতর শোষণ ও নিপীড়নের ফাঁদে নিস্পেষিত হবেন ভারতের কোটি কোটি জনতা। তাই, এই সুস্পষ্ট সম্ভাবনাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতেই হবে, মূল শত্রুর বিরুদ্ধে দল-মত-নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে অবশ্যই ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, এবং নির্ভীকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ফ্যাসিবাদী আঘাত নেমে আসছেই, নেমে আসবেই। এ আঘাত একদিকে যেমন এদেশের সর্বহারাশ্রেণী তথা বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতার ফলশ্রুতি, সংসদীয় বামপন্থী দলগুলির বিপ্লবের প্রতি ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতি ঠিক একইভাবে তা আবার শাসকশক্তিরও মৌলিক দুর্বলতার ফলশ্রুতি— গণতন্ত্রের ভাঁওতাটাকে তারা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না, নিজেদের শ্রেণী স্বার্থেই তারা আজ এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক আবরণটাকে সশব্দে খুলে ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই, এ আঘাত সুনিশ্চিতভাবেই জন্ম দেবে প্রত্যাঘাতের এবং তারই ফলশ্রুতিতে উঠবে ঝড়। ঝড় আসছে! ইতিহাস সাক্ষী দেবে, এই ঝড়ের পটভূমিকায় কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করছে— ইতিহাসের কাঠগড়ায় প্রত্যেককেই জবাবদিহি করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

২৪.৬.৭৫

অনীক, জুলাই, ১৯৭৫

জন্মভূমি আজ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।
এখন গভীর রাত,
অন্ধকার তোমার বুকের ওপর পাথরের মতো,
তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর হিংস্র আকাশ
এখন বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে আছে।
তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও—
তুমি ভয় পাওনি।
কাঠি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো;
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।
যে মানুষ গান গাইতে জানে না,
যখন প্রলয় আসে, সে বোকা ও অন্ধ হয়ে যায় ।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।।

অনীক, জুলাই, ১৯৭৫

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর ফ্যাসিবাদী হামলা

কলকাতায় গত মাস ২/৩ ধরে অপেশাদার নাট্যানুষ্ঠানের ওপর কলকাতা কর্পোরেশন আরোপিত নাট্যকরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের যে যুক্ত আন্দোলন চলছে, সম্প্রতি নাট্য কর্মীরা যখন কলকাতা কর্পোরশনের সামনে অবস্থান করছিলেন, এবং নাটক-গান প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদকে সোচ্চার করে তুলছিলেন, তখন হঠাৎ পুলিশ এসে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্বপূর্ণভাবে সেই সভা বন্ধ করে দেয়, এবং কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এ সব কিছু একথাই আবার নোতুন করে প্রমাণ করছে যে, শাসকশক্তি প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে যেন-তেন-প্রকারেণ গলা টিপে হত্যা করতে চায়, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও ফ্যাসিবাদী হামলা চালিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চায়। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ব্যক্তি এই ফ্যাসিবাদী হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। আমরা আশা করবো যে, সাংস্কৃতিক কর্মীরা ফ্যাসিবাদী হামলায় ভীত না হয়ে তাদের আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তুলবেন। গত বছর ২০শে জুলাই কার্জন পার্কে পুলিশ কর্তৃক প্রবীর দত্তকে হত্যা করার স্মৃতি আমাদের মন থেকে কোনো দিনই মুছে যেতে পারে না। শাসকশক্তি যেমন নিত্য-নোতুন কায়দা নিচ্ছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য, আমাদেরকেও ঠিক তেমনি পরিস্থিতি অনুসারে সন্ত্রাসের মোকাবেলায় যথোপযুক্ত পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, এবং ব্যাপক জনগণকে এইসব আন্দোলনে সামিল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শাসকশক্তির ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিষ্ট হামলার বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে না তুলতে পারলে কোনো গণ-আন্দোলন যে এগোতো পারবে না— একথা গভীরতরভাবে উপলব্ধি আমাদের করতেই হবে।

অনীক, জুলাই ১৯৭৫

ভোজপুরী ভাঁওতা!

সরকারী বিবৃতিতে জানা গেছে, বিহারের ভোজপুর, পুন-পুন প্রভৃতি স্থানে 'উগ্রপন্থীদের' আক্রমণের মোকাবিলা করার ফলে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বেশ কিছু 'উগ্রপন্থী' নিহত হয়েছেন।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এধরণের সরকারী বিবৃতিতে লোকে আর বিশ্বাস করে না। কারণ, মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছে, গত কয়েক বছর ধরে ঠাণ্ডা মাথায় হাজার হাজার বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করে শাসকশ্রেণী এধরণের একটা অজুহাতই খাড়া করে থাকে। আর বিহারের সাম্প্রতিক এসব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বুর্জোয়া পত্র পত্রিকায় যে সব খবর বেরিয়েছে, তা থেকেই ধরা পড়েছে, এসব জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় চলছিলো নির্মম শোষণ, তারপর তার সঙ্গে যোগ হয়েছিলো বিত্তবান 'উচ্চবর্ণের'' জোতদার মহাজনদের দ্বারা 'নিম্ন বর্ণের' শোষিত হরিজন মানুষদের ওপর বর্বর নিপীড়ন। তারই ফলশ্রুতিতে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদের নেতৃত্বে এই শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের দল যে মুহূর্তে রুখে দাঁড়িয়েছেন, অমনি নেমে এসেছে শাসকশক্তির খড়্গাঘাত— জোতদার-মহাজনদের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। শেষ পর্যন্ত অসংখ্য সাধারণ মানুষকে খুন করা হয়েছে, 'শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক' পুলিশ-মিলিটারির সামনেই, তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চলেছে। এবং এসবকে ঢেকে রাখার জন্যই শাসকশক্তি তৈরী করেছে আজগুবি ধাপ্পা। অবশ্য ফ্যাসিবাদী সরকারের কাছ থেকে এ ছাড়া কিছু আশা করাটাও ভুল হবে।

বিহারের এই সব নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, 'অনীক' তার সংগে নিজের ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরকে যোগ করছে।

অনীক, জুলাই ১৯৭৫

প্রত্যেক মায়ের সন্তানেরা

উদয় রায়

ছুটি হয়ে গেছে সেই কখন, ওর অবশ্য ছুটি ছুটি লাগছে শেষ ঘন্টা বাজার অনেকক্ষণ আগে থেকেই। সেই তখন থেকে, যখন থেকে ও দেখছে বিকেলের শেষ রোদটা গড়াতে গড়াতে এসে থমকে পড়েছে ওদের ক্লাসঘরের পিছনে তেঁতুল গাছের ঝিরঝিরে পাতার ওপর। সেই তখন থেকে মনে হচ্ছে, ছুটি ছুটি— খেলতে যাওয়ার সময়। স্যারের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও চট করে দেখে নিয়েছে তেঁতুল গাছের মাথাটা, রোদটা এখনো ওখানে ধরা, কিন্তু আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বন্ধুদের মুখগুলো ওর খালি খালি মনে হচ্ছে— এত বিশ্রী লাগছে— সেই শেষ ঘন্টা বাজার বহুক্ষণ আগে থেকেই।

ও পা উঁচু করে আরেকবার দেখে নিলো বাইরের রাস্তাটা। গেটের গ্রীলের ফাঁকটা দিয়ে তাকিয়েই থাকলো, যতক্ষণ না পা টন্ টন্ করে ওঠে। যদি সেই বরাবর বড় রাস্তা অব্দি দেখা যেতো, তাহলে ও দেখতে পেতো, বাবা বাস থেকে নেবে সোজা হেঁটে আসছে স্কুলের দিকে। কিন্তু ছোট রাস্তার মোড়ে বড় রাস্তার বাস আওয়াজও শোনা যায় না। ও গলির মোড়ের তিনতলা বাড়ীর ছাদের দিকে তাকালো। রোদটা লেগে আছে কার্নিশের তলায়। এরপরই লাফ মেরে উঠবে কার্নিশের ওপরে, তারপর গুটি গুটি এগোতে থাকবে ছাদের দিকে। ততক্ষণে রোদের রঙটাও আসবে ম্লান হয়ে। তিনতলা বাড়ীর ছাদে একটা মেয়ে শুকনো শাড়ি কাপড় তুলতে এসে চেঁচিয়ে কথা বলছে সামনের বাড়ীর কার সঙ্গে। ওর এতো খারাপ লাগছে। ও নিজের মনেই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। কোথায় যেন বোমা ফাটলো কটা পরপর, বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরলো তাদের আওয়াজ। ও মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো কোথায় ফাটলো। আওয়াজটা ধমকের মতো ফিরে এলো চারদিক থেকে। দারোয়ানটা গেটের পাশের খুপরি ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন বললো। কিন্তু ও ঠিক শোনার আগেই খুপরিটা থেকে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরোতে লাগলো, আর তাতে দারোয়ান খুপরিঘর গেট সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে গেলো। ও পিছন ফিরে সোজা ছুট লাগালো। স্কুলের দিকে। স্কুলটা যেন গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছিলো— চট করে ওকে ঢুকিয়ে নিলো। নির্জন করিডর হা-হা করা ঘরের জঙ্গলে। খালি পিট প্যাট.....পিট প্যাট করে ওর পায়ের আওয়াজ ছুটতে লাগলো কখনও ওর পিছনে পিছনে— কখনও ওর সামনে সামনে। ও ক্লাস ঘরে ঢুকে পড়ে স্যারের টেবলটা ধরে দম নিয়ে নিলো। ক্লাস ঘরের বেঞ্চিগুলো এদিক ওদিক, বাড়ী যাওয়ার

তাড়ায় ছেলেরা বেঞ্চিগুলোর ওপর দিয়েই হেটে গেছে। ও জুতোর ছাপ দেখে বলে দিতে পারে, কে কে বেঞ্চির ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। সন্টু হড়কে গেছে, ওর জুতোর তলাটাও চামড়ার। জয়ের চারকোণা ছাপ— কেডস্-এর। কিন্তু কেউ নেই এখন, সব বাড়ী চলে গেছে। ফাঁকা ঘর এলোমেলো, বেঞ্চি মেঝের ওপর ধূলোর আস্তরণ, সবকিছুর ওপরে বিকেলের আলো দেখে আর সব চেয়ে বেশী বন্ধুদের বাড়ী চলে যাওয়ার কথা ভেবে ওর কান্না পেলো। ও বেঞ্চির ওপর বসে থাকলো কোনো দিকে না তাকিয়ে। বন্ধুদের নীরব অস্তিত্ব ওকে আরো বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে— ও একা। ও ফোঁপাতে লাগলো মাথা নিচু করে। একটা শুকনো ঘূর্ণি বার বার এসে ধাক্কা খেতে লাগলো মাথার ভিতরে চোখের পেছনে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুঝলো, ওর কিছু করার নেই। ও ঠোঁট টিপে তাকিয়ে নিলো ঘরের চারিদিকে, এমনভাবে ঘরটাকে ও কোনোদিন দেখে নি। ছাদের নিচে কালো কালো দাগগুলোকে দেখলো ঘাড় উঁচু করে। দেওয়ালের অসংখ্য জায়গায় দেখলো ওর নাম লেখা। দেওয়ালের এক জায়গায় ওর পাশে রামুর নাম লেখা আছে। গতসপ্তাহে রামুর সঙ্গে মারপিট হওয়ার পরে নামটা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রামুর সঙ্গে কালকেই ভাব করে নেবে। বেঞ্চি থেকে উঠে ও এদিক ওদিক একটা পেন্সিলের টুকরো খুঁজলো অথবা একটা ভাঙ্গা নিব। কিন্তু কিছুই না পেয়ে চকের গুঁড়ো দিয়েই নামটা লিখে দিলো। কালকেই রামুর সাথে ভাব করতে হবে। কালকে— ? কালকে কি করে হবে, আজকেই ওকে কেউ বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে না! সমস্ত রাতটা কি হবে ওর? জানলার গ্রীলের ভিতর দিয়ে ও বাইরের দিকে তাকালো। কিভাবে বিকেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রিলে মুখটা চেপে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়েই থাকলো। একা একা বাড়ী চলে যাবে, রাগে গ্রিলটাকে ঠেলতে ঠেলতে ভাবলো ও। হঠাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে গ্রিলটাকে ঠেলে ভাবলো— একাই বাড়ী চলে যাবে—

সরু গলিটার একটা মোড়—

মিষ্টির দোকান—

আরেকটা মোড়—

বড় রাস্তায় ট্রামটা সামনের দিকে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ছুটে আসে—

ড্রাইভার একবার বাঁদিকে একবার ডানদিকে হ্যাণ্ডেলটা ঘোরায়, ট্রামটা কিন্তু ঠিক সোজা যায়—

ফায়ার ব্রিগেডের লাল গাড়িগুলোকে কোনো রকমে এলোমেলো ভাবে মাঠে ঠেলেই ড্রাইভাররা চা খেতে যায় সামনের দোকানে—

কানু একটা লাঠি তাক করে—

হল্ট্—

থ্রি নট্ থ্রি পাইপগান— ফ্যাট্—

বোমাটা ফাটলো প্রায় থেকে থেকে— দুটোর মতো শব্দ করে। অনেকগুলো কাক উড়ে গেলো কার্ণিশের তলা দিয়ে। ওর সামনে দিয়ে বিকেলটা গুটিয়ে যেতে লাগলো।

ও টেবল চাপড়ে সামনে ঝুঁকে বললো, "কোনো গণ্ডগোল নয়— কোনো গণ্ডগোল নয়।" রোল নাম্বার ডাকতে আরম্ভ করলো থেমে থেমে, যেমন রক্ষিত স্যারকে ডাকতে শুনেছে ইলেভেন ক্লাসে। বেঞ্চিগুলো পড়ে থাকলো এলোমেলো। ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে অজানা সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে মজা পাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু নির্জন চুপচাপ চারিদিকে। কাউকে তো দেখতে হয় যে, ইলেভেন ক্লাসে একেবারে উঁচু তক্তার ওপর উঠে কি রকম রক্ষিত স্যারের নকল করছে। ওর একদম মজা লাগছে না, বরং আরও খারাপ লাগছে এতো বড় ঘরে। দেওয়ালে নোংরা হলদেটে পোছের ওপর অসংখ্য নাম কথা ছবি আঁকা— মাথা ঘোরাতেই পিছনে স্কুলের মাঠে লাল মত কি একটা দেখতে পেলো। ওটা একটা বল, ভাবলো ও। পাড়ার দিলীপদার মতো টেবল চাপড়ে বললো, "আমি বাজি রাখতে পারি!" ও দুর্ দুর করে ছুটে গেলো পিছনের মাঠে, কিন্তু বলটা তুলেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। আধাআধি আছে বলটার। তবু আধাআধি বলটা নিয়েই চেষ্টা করলো, ওদিকে যদি গোলকিটা দাঁড়ায়। বলটা পা দিয়ে তাক করে ছুঁড়ে দিলো ও মাঠের একদিকে। বলটা প্রথমে আটকে গেলো পায়ে, তারপর উঁচু হয়ে পড়লো মাঠের মাঝখানে। কোন্‌দিকে যেন অনেকগুলো বোমা ফাটলো, তাদের একটার আওয়াজের সাথে আরেকটা আওয়াজ এমনভাবে মিশে গেলো যেন একটা বোমাই অনেকক্ষণ ধরে ফাটলো। ও আধখানা বলই তাড়িয়ে নিয়ে চললো মাঠের একদিক থেকে আরেকদিকে— "ওপ্‌নটোয়াল" চিৎকার করতে থাকলো ও। পায়ের সবটুকু জোর দিয়ে মারলো বলটাকে। বলটা ঢব্ ঢব্ করে গিয়ে আটকে গেলো ঝোঁপে। ঝোঁপ থেকে বল তুলতে গিয়ে ওর চোখে পড়লো ছেলেটাকে।

পাঁচিলের গায়ে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল ছোঁয়ালো ছেলেটা, তারপর আবার দাঁড়িয়ে থাকলো একইভাবে কান খাড়া করে। খালি পাখির ডাক, মাঠের ওপর গাছের ওপরে এলোমেলো উনুনের ধোঁয়ার ছোপ, আকাশে হলদে নীল মেশা আলো। ছেলেটা ঠোঁটে আবার আঙ্গুল রাখলো। ও বল না তুলেই দাঁড়িয়ে থাকলো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে।

হাঁটুর ওপর হাতের ভর রেখে ছেলেটা ওর মুখের কাছে মুখটা এনে বললো, "আর কে কে আছে", মাথাটা একদিকে হেলানো, "তুমি ছাড়া"? ও রেগে গেলো, দেখতে পাচ্ছে না যেন, "কে থাকবে আবার— স্কুল সেই কখন ছুটি হয়ে গেছে।" বলটা তুলে নিয়ে ও আবার মারলো, বলটা আবারও আটকে গেলো পাঁচিলের কাছে। ছেলেটা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেউ নেই— সত্যি কেউ নেই?" "দারোয়ানটা আছে", বলটা তুলে আনতে আনতে ও বললো। ওর বল মারা দেখতে দেখতে ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকালো, "ওভাবে বল মারে না।" বাচ্চাদের সাহসী রাগে ঘুসি পাকালো ও— চিৎকার করে উঠলো, "আমি যেমন খুশি খেলবো— চলে যাও তুমি এখান থেকে।" কেন ও রেগে যাচ্ছে, না বুঝে বিমর্ষভাবে মাথা নাড়ল ছেলেটা, "ওভাবে খেলে না— তাছাড়া বাইরে সি-আর-পি আছে।" ছেলেটা হঠাৎ পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি

গোলকিপার!" ব্যস— ওকে আর কিছু বলে দিতে হলো না। চারিদিকে পাখির কিচিরমিচির— সবুজ ঘাসের ওপর গোলাপি ছোপ— মাঝে মাঝে শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া যা শুধু বিকেলে ওঠে। ও পা দিয়ে আপ্রাণ মারতে লাগল আধখানা বল। ছেলেটা লাফ দিয়ে উঠলো, হাঁটু গেড়ে বসলো, পাশে সরে গেলো, বল ফেরত পাঠাতে লাগলো। "আমি একসময় দিব্যি খেলতাম।" বল পেড়ে আনলো শূন্য থেকে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো ও, "এখন খেলোনা কেন?" কোমরের পাশ দিয়ে বলটা গলে গেলো, ছেলেটা দৌড়তে দৌড়তে বললো, "সময় নেই— বিলকুল সময় নেই— দিনকালও", বলটা গোড়ালি দিয়ে জোরে ঠেলে দিলো ওর দিকে। ঢব্ ঢব্ করে চলে এলো ওর হাতে।

ছেলেটা হাত-পা টান দিয়ে শুয়ে পড়লো মাঠে। হাঁপাতে লাগলো হাঁ করে। তারপর কি যেন কি শুনে— ধড়মড় করে উপুড় হয়ে ঘাসের ওপর চিবুক ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করলো পুরোণো প্রশ্ন, "ঠিক জানো, কেউ নেই— দু'একটা মাষ্টার?" ছেলেটাকে এখন ওর মোটামুটি ভালোই লাগছে, তাই না রেগেই ও জবাব দিলো, "সত্যি কেউ নেই— তুমি দেখে এসো।" "আমি যাবো", শুয়ে শুয়েই প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি খুটে বার করে মুখে দিলো, "সি-আর-পি-দের চোখে পড়লেই ঘিরে ফেলবে", মাথার ওপর হাত দিয়ে জোরে থাপ্পর মারলো, "খুলি উড়িয়ে দেবে গুলি চালিয়ে— স্রেফ মর্গে ফ্ল্যাট করে দেবে।" ও বোঝার চেষ্টা করলো। একটু শঙ্কিত ভাবেই মাথা কাৎ করলো, "তুমি বোমা মারো?" "আমি—হ্যাঁ, বোমা মারি— শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি— সময় এলে গ্রামেও চলে যাবো।" বিজ্ঞের মত গলাভারি করে ও বললো, "জানি, পাইপগান!" ছেলেটা যেন সেটা বুঝেই হাসিটা হঠাৎ বন্ধ করলো। "শুধু পাইপগান নয়— সংগঠন— একটা বিরাট পার্টি আছে— ও সে সব তুমি বুঝবে না— তোমার বয়স হয়নি।" ও কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়েই শুনছিলো, ছেলেটা হঠাৎ কথা বন্ধ করায় একটু মনক্ষুণ্ন হলো! ছেলেটা পকেটে হাত ঢকিয়ে আবার কি খুঁটে খেলো। ওর দিকে চোখ পড়াতে একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বললো, "কালকের মুড়ি।" ওর মনে পড়ে যাওয়াতে ও খুব খুশি হয়ে উঠলো, "কিছু খাবে নাকি তুমি— খিদে পেয়েছে?" ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ বন্ধ করলো, মেয়েদের গলা করে বললো, "এম্যা, টিফিন খাওনি বুঝি, মাকে বলে দেবো!" ও স্কুলের দিকে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ালো, ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি নাম তোমার?" ছেলেটা চেঁচিয়ে জবাব দিলো, "রতন।"

ও ব্যাগের ভিতর থেকে বাক্সটা বার করতে লাগলো আর ছেলেটা বললো, "তুমি স্পারটানদের গল্প জানো তো, ক্যাম্পে কি ভাবে থাকতো তারা।" ও মাথা ঝাঁকালো, খুব সন্তর্পণে টিফিন বাক্স থেকে বার করলো দু স্লাইস রুটি, একটা কলা। রুটিটা বাড়িয়ে দিলো ছেলেটার দিকে। ছেলেটা হাত না বাড়িয়ে বলল— "তুমি খাবে কি কলা? তোমার তো ক্ষিদে পেয়েছে— কলাটা আমায় দাও।" ও ছেলে বয়সের সাহসী মহৎ গোঁয়ার্তুমিতে রুটিটা মুখের সামনে নাড়িয়ে বললো "খেয়ে নাও— আমি তো টিফিন খেয়েছি—

আমার ক্ষিদে নেই।" ও কথাটা মিথ্যে বললো, কারণ ক্ষিদেতে ওর পেট চিন্ চিন্ করছে। কিন্তু ছেলেটাকে খেতে দেখে বেমালুম সেটা ভুলে গেলো। কলাতে একটা বড়ো কামড় লাগিয়ে চোখ মিট মিট করে তাকালো ছেলেটার দিকে। ছেলেটা ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রুটিটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো, ও ভাবলো, ছেলেটা বোধহয় ভাবছে, রুটিটাকে ভাল করে দেখলেই দুখণ্ড রুটি তিন টুকরো হবে। ছেলেটা ওর দিক তাকিয়ে বুঝে ফেললো কি ও ভাবছে, মুখে রুটি পুরে চিবোবার ফাঁকে ফাঁকে বললো, "কোনো, আশা নেই, তবে জেলী রুটি আমি খুব ভালবাসতাম"। "এখন ভালবাসো না?" ছেলেটার রুটি চিবোনো বন্ধ হয়ে গেলো, পাঁচিলের ওপর দিয়ে দূরে কোথায় যেন তাকালো, খুব আস্তে আস্তে বললো, "এখনও বাসি— কিন্তু জোটেনা— আর সবাই না পেলে আমি খেতে পারি না।" বহুক্ষণ পরে ওর আবার মা'র কথা মনে হলো। স্কুল ছুটির দুপুরে অনেক বেলায় মা যখন খায়, ও তখন মা'র কাছে এসে বসে। ঠাণ্ডা কর্‌কর়ে ভাতে খুব তাড়াতাড়ি হাত নাড়তে নাড়তে মা বলে, "এই কটা ভাতের জন্যে মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, আর মহাপ্রভুরা দিল্লীতে গিয়ে চব্যচষ্য খাচ্ছে। খেতে চাও, গুলি চালাবে!" মা'র হাত অবশ্যম্ভাবী ভাবে থেমে যায় ভাতের থালার ওপর। আনমনে চেয়ে থাকে ভাতের দিকে। ও অবশ্য জানে, মা কি ভাবছে। ও মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা, তুমি তোমার ভাইয়ের কথা ভাবছো— না?" টল্ টলে চোখ তুলে মা মাথা নাড়ে, "ছেলেটাতো বাড়তি র‍্যাশনের মিছিল করেছিলো বলে গুলি করে মারলো—। এই রকম সময়ে ওর, কেন জানে না, একটা রাগ হয়। ভিতরে ভিতরেও রাগ গর্ গর্ করতে থাকে। ও বুঝতে পারে, ভাতের দলা মা'র গলায় আটকে আটকে যাচ্ছে। কি যে তখন খারাপ লাগে, "মা খেয়ে নাও— খেয়ে নাও", ওর মনে হয় মা বুঝি ভাতের গরাস নাবিয়ে হঠাৎ বলবে— "আমি কক্ষণো খাব না" ব্যাস্— মা আর খাবে না। মা ওর দিকে তাকিয়ে তখন কিরকম করে যেন হাসে, "আমি তোর জন্যেই বেঁচে আছি। তুই বড়ো হবি— দেখবি ঠিক এই শয়তানগুলোর শাস্তি হবে—। দেখবি এই যে ছেলেগুলোকে গুলি করে মারছে কতো মায়ের কোল খালি হচ্ছে এদের কি মেরে শেষ করতে পারবে— দেখবি ঠিক একদিন—!" মা হয়তো তখন বাবাকে দেখে থেমে যায়, নয়তো জল খেয়ে নেয় ঢক্ ঢক্ করে। আর ও ভাবে, মা এতো কম খায়!

ছেলেটার কপাল ঢাকা চুল, হাসি হাসি চোখ, কালচে মুখ, থুতনির তলায় জমা দাড়ি আর হাড়সর্বস্ব রোগা শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলো ও ছেলেটাকে, ভালবেসে। ওর ভালোবাসার ছোটো জগতে ছেলেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে এলো। ও বুঝে উঠতো পারলো না, ছেলেটার জন্যে কি করবে। "জল খাবে?" আগ্রহে ছেলেটাকে খুশি করার সামান্য প্রচেষ্টায় ও ছুট লাগালো স্কুলের দিকে। জলের বোতলে জল ভরতে ভরতে ভাবলো, টিফিনে যদি কিছু না খেতো, তাহলে ছেলেটা পেট ভরে খেতে পারতো। ও জীবনে এই প্রথম নিজেকে বোকা ভাবলো। ছেলেটা খানিকটা জল খেয়ে বোতলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো, ঘাস টেনে তুলতে লাগলো তাদের শিকড় শুদ্ধু, টানা টানা গলায় বললো,

"কতদিন মাকে দেখি নি— কাল রাত্রে যেখানে শুয়ে ছিলাম, সেখানে পুলিশ ঢুকতে পারবে না দুচোখ বন্ধ করে ঘুমিয়েছিলাম— স্বপ্নে মাকে দেখেছিলাম— ঠিক— একেবারে— মা যেমন পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতো, ঠিক করে পড়াশুনা কর্— না করলে রোজগার করবি কেমন করে— ঠিক মা'র গলা।" ও ছেলেটার হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগলো, প্রাণপণে ঠেলে রাখলো কান্না চোখের পিছনে। অনেক কথা বলার ইচ্ছায় ও ফোঁপাতে লাগলো। ও কেন কাঁদতে আরম্ভ করলো, ছেলেটা বুঝে উঠতে পারলো না, আগেও তো দু একজনকে বলেছে— এ কাঁদে কেন? অসহায়ের মতো বসে থাকলো ছেলেটা, আর ও হাত দুটো চোখের ওপর ডলতে ডলতে কেঁদে চললো। ছেলেটা বিড় বিড় করে উঠলো, "পাঁচ বছর পরেই আমি ফিরে যেতে পারবো মা'র কাছে— পাঁচটা বছর পরে!"

ওরা দুজনে বসেছিল ঘেসাঘেসি করে, কেউ কারো সাথে কথা বলছিলো না। যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে ওরা যেন সেটা অনুভব করছিলো সূর্যডোবা শেষ বিকেলের আকাশের নিচে বসে। ছেলেটা ভাবছিলো প্রাত্যহিক বিপদ ভয়ের ওপর ছাপিয়ে ওঠা মায়ের কথা; আর এটা সে ভাবছিলো যৌবনের দৃপ্ত সাহসে। ও কি ভাবছিলো? ও নিজেই জানে না। ভাবনাগুলো আসছিলো— উড়ে যাচ্ছিলো পাখা মেলে ঐ বয়সের অজ্ঞান সাহসিকতার আকাশে। একটা ছোট্টো হাওয়া গড়িয়ে গেলো শুকনো পাতার ওপর দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, ছেলেটা ঝট করে জামার তলায় কোমরে হাত দিয়ে পিছন দিকে তাকালো, এটা খুব খারাপ এক জায়গায় আছি— কখন যে ব্যাটারা আসে।" ও চারদিকে তাকিয়ে বললো, "কি রকম চুপচাপ, না!" ছেলেটা শিস্ মতো করলো, "এটা খুব খারাপ—এটা খুব খারাপ!" দেওয়ার ওর হাত ধরে আঙ্গুলে চাপ দিলো, খুব থেমে থেমে বললো, "তোমার ভয় করছে?" ও ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লো, "আমি ভয় পাই না।" ছেলেটা ওর পিঠে হাত রাখলো, ঝক্মকে গলায় বললো, "সাবাস্— তোমাদের সময় ভয় পেলে চলবে না, তোমাদের লড়াই আরও সাঙঘাতিক হবে।" লড়াই, ও মনে মনে ভাবলো, ওর কানে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকলো, ও কান পেতে শুনলো। নেপোলিয়নের গল্প ওর মা ওকে বলেছে। ও চিৎকার করে পাক দিয়ে উঠলো, ছোটো হাতটা মুঠো করে ছুঁড়ে দিলো আকাশের দিকে, "আক্রমণ করো!" ছেলেটা ওকে থামাতে গিয়েও থামালো না, কি যেন ভেবে হাসিতে ভরে গেলো মুখ, হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, "হুর্‌রা!" ছোটো মাঠটা ওদের সামনে বড়ো হয়ে যেতে লাগল— ট্রেঞ্চ— কামানের গোলা ফেটে পড়তে লাগলো ওদের চারদিকে। ওরা পাশাপাশি মাঠটা পার হয়ে যেতে লাগলো।

ছেলেটা কান খাড়া করে হঠাৎ কি শুনলো, ওকে টেনে নিয়ে এলো গাছের আড়ালে, ফিস্ ফিস্ করে বললো "কেউ কথা বলছে না ইস্কুলে?" ও শুনলো, কেউ ওর নাম ধরে ডাকছে। ও ছেলেটার কাছে সরে এলো, "আমাকে ডাকছে— আমাকেই ডাকছে।" "আমি চলি বুঝলে— কাউকে বলোনা আমার সঙ্গে ছিলে এতোক্ষণ।" ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো,

"তুমি চলে যাবে?" ছেলেটা বুঝে উঠতে পারলো না কি করবে। কি বলতে গেলো, না বলেই ছুট লাগালো পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলের ওপর বসে চট্ করে ওর দিকে তাকলো— হাতের মুঠো তুলে ধরলো ওপর দিকে— সূর্যের দিকে। ও মুখ নাড়া দেখে বুঝলো, ছেলেটা ওকে বলছে— আক্রমণ করো— ও...। ও হাত মুঠো করলো, চিৎকার করে উঠলো "হুর্‌রা!" ছেলেটাকে আর দেখা গেলো না।

ও স্কুলের দিকে ফিরে চললো এলোমেলো ভাবে ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে। ওর বাবা তখনও ওর নাম ধরে ডাকছিলো। ওকে দেখে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করলো। ও কিছু শুনলো, কিছু শুনলো না। ছেলেটা নাম যেন কি বলছিলো—

"যা অবস্থা, সর্বত্র কারফু আর বোমা—"

কি নাম—

"চল, কি করছিলি এতোক্ষণ, কোথায় ছিলি—"

একটা বোমা ফাটলো— বন্দুকের ভোঁতা আওয়াজ। ওরা স্কুলের বাইরে পা দিলো।

ওর বাবা ওকে প্রায় টেনেই নিয়ে চললেন শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। ও চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলো। ধ্যুর, ছেলেটার নাম যেন কি?

ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওর দিকে না ঠিক, যখন মাঠে শুয়েছিলো, তেমনি আকাশের দিকে। হাঁ করা মুখ থেকে রক্ত পড়ছিলো, বুকের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিলো, বন্ধ জানলার পিছনে কারা যেন কাদের বলছিলো ছেলেটা মরে গেছে। ও এক ঝটকায় বাবার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে আনলো— চিৎকারে কুঁজো হয়ে গেলো, "ওরা মেরে ফেলেছে— গুলি করে মেরেছে!" সি-আর-পিরা অস্বস্তিতে এ-ওর দিকে তাকালো। অফিসারটা দাঁত বার করে প্যাচ থুতু ফেললো বুটের সামনে।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিলো ট্রাম স্টপে। ওর বাবা বিড় বিড় করে উঠলেন, "কি করলি, বল তো?" চাপা ভয়ে উৎকণ্ঠায় ভাবতে লাগলেন, এখনও ট্রাম নেই, ট্যাক্সি নেবেন নাকি? তারপর ট্রাম বাস ট্যাক্সি কিছু না পেয়ে হেঁটেই ফিরে চললেন বাড়ীর দিকে।

মৃত ছেলেটি পড়ে ছিলো রাস্তার ওপর। ইতিমধ্যেই তার হাঁ-করা মুখের উপর মাছি উড়ছে ভন্ ভন্ করে। ছেলটি মৃত চোখ দিয়ে দেখছিলো শহরের ওপর ছোট্ট তারাভরা আকাশ। আর সেই একই তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো ও। একজন মৃত— একজন বন্ধুর প্রতি ভালবাসায়, বন্ধুর হত্যাকারীর প্রতি ঘৃণায়— জীবন্ত।

অনীক, জুলাই ১৯৭৫

ছড়া

সৃজন সেন

আর্য্যভট্ চারিয়া
এই পৃথিবী ছাড়িয়া
মহাকাশে ঘোরেন।
কে যে আসল জনক তার—
ইন্ডিয়া, না নয়া জার—
ভেবেই তিনি মরেন!
দূর করতে ভাবনা তার
মেসেজ পাঠান নয়া-জার—
'ভাবনা কেন পুত্র?
বেজন্মার নেই খুঁজতে বাবা
কে আসল কে নকল বাবা,
কিংবা জন্ম সূত্র!'

অনীক, জুলাই ১৯৭৫

অংকুর

প্রণব কুমার বসু

শুরুতে কিছু গাছ। একটা শোভাযাত্রা। কিছু পাথর। গাছ স্থির। পাথর অনড়। বাজনার শব্দ ক্ষীণ। তারপর জোরালো। শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। সামনে এক ঝাঁকড়া-চুল খালি-গা পুরুষ। দুহাতে সাপের মতো দুগোছো পাকানো দাড়ি। মেয়েদের মাথায় ঘট। ছেলেদের হাতে বাজনা। পথের পাশে অনড় গাছ আর পাথর। শোভাযাত্রা চলেছে মন্দিরে।

তারপর শহর। শহরের কলেজ। কলেজে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কয়েকটি যুবক। রুক্ষ পাথরের পথ। যুবকদের একজনের বাড়ি। যুবকটির আরও পড়বার ইচ্ছা, বাবার আপত্তি। বাবার চাপে পড়ে বিয়ে। বাবার ইচ্ছেতেই বউকে শহরে রেখে যাত্রা শুরু। স্বভাবতই শহর থেকে দূরে, গ্রামে। অর্থাৎ সেই গ্রাম— সেই গাছ পাথর মন্দির আর শোভাযাত্রার স্থির অচঞ্চল শান্ত গ্রাম।

এবং মূল কাহিনীরও শুরু এইখান থেকেই।

যুবকটি গ্রামে আসছে, যেহেতু গ্রামে তাদের বিস্তর জমিজমা। নিজস্ব জলাধার থেকে শুরু করে গোরুর গাড়ি এমন কি বহু তালগাছও আছে। এর প্রতিটি জিনিস একটু হিসেব করে ব্যবহার করতে পারলে বিস্তর লাভ হয়। তার গ্রামে আসার সেটাই অন্যতম কারণ।

শুরু হলো তার মালিকীয়ানা।

নিজস্ব জলাধার থেকে জল নিতো গ্রামের আর পাঁচজন, সে হুকুম দিলো— এসব আর চলবে না। যে মানুষটি তার এবং তার বাবার অনুপস্থিতিতে জমিজমা খামাবাড়ি দেখাশুনো করতো, তার প্রয়োজন ফুরোলো। নিজের জমিসেচের উদ্বৃত্ত জল গিয়ে পড়তো তারই বাবার রক্ষিতার জমিতে, সেটা বন্ধ হলো। এমনকি, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজের বাড়ির 'পবিত্র' রান্না করা খাবার তাকে দুবেলা বিক্রী করে কিছু রোজগার করতো, প্রথম দু-একদিন পরে তারও আর দরকার রইলো না।

বাকী রইলো লছমী আর তার বোবা কালা তাড়িখোর ভালোমানুষ স্বামী কেষ্ট।

লছ্‌মীর কাজ খামারবাড়ি ঝাড়পোঁছ করা, মশলা পেষা, ডাল ভাঙা। ক্রমে তাকে মালিকের রান্নাবান্নার কাজেও লাগতে হলো। যদিও সে নীচু জাত, প্রয়োজন এবং পয়সা বাঁচাবার তাগিদে মালিকের তাতে কোনো আপত্তি রইলো না। লছ্‌মীরই সুপারিশে

মালিকের দয়ায় গাড়োয়ানের কাজ পেলো কেষ্ট। লছ্‌মী কৃতার্থ। নেশার প্রচণ্ড তাড়নায় কেষ্ট একদিন মালিকের গাছ থেকে তাড়ি চুরি করে খেলো। ফলে কাজ গেলো। মাথা কামিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে তাকে ঘোরানো হলো সারা গ্রামময়। ক্ষোভে লজ্জায় কেষ্ট গ্রাম ছাড়লো।

রইলো একলা লছ্‌মী। মা হবার তার ভারী সাধ। স্বামী গ্রামছাড়া, কোথায় গেছে জানা নেই। মালিক ইদানীং তাকে একটু ভালো চোখে দেখছে— কাছে ডাকে, কথা বলে। সরল লছ্‌মী সহজেই আত্ম সমর্পণ করলো।

এলো শহর থেকে মালিকের বউ। অর্থাৎ তাকে পাঠানো হয়েছে। অনিবার্য কারণেই চাকরী গেলো লছ্‌মীর। সে পথে বেরুলো, অর্থাৎ দিনমজুর। গর্ভে তখন তার সন্তান— যাকে ধ্বংস করতে মালিক প্রায় উঠেপড়ে লেগেছে। সেই অবস্থাতেই একদিন মালিকের বাড়ি থেকে চাল চুরি করতে গিয়ে লছ্‌মী হাতেনাতে ধরা পড়লো।

ইতিমধ্যে ধুমকেতুর মতনই ফিরে এসেছে কেষ্ট। সঙ্গে এনেছে রোজগার করা টাকা। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা দেখে তার ভারী আনন্দ। আনন্দের টানেই পরদিন সকালে সে চললো মালিকের সাথে দেখা করতে, বলে কয়ে নতুন করে গাড়োয়ানের চাকরীটা বাগিয়ে নিতে। মালিক তখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। ওড়াতে ওড়াতে চোখ পড়লো কেষ্টর দিকে। কেষ্ট আসছে। দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গী। হাতে লাঠি, বুক উঁচু। আসছে। তিনি ভয় পেলেন। আসছে। তার ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হলো। আসছে— তিনি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ে এলেন চাবুক, উঠোনে পা রাখতেই উন্মাদের মতো কেষ্টকে মারতে লাগলেন।

ছুটে এলো গ্রামের লোক, ছুটে এলো লছ্‌মী। চাবুক ফেলে মালিক গিয়ে ঢুকলো ঘরে, দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে কুম্ভীরাশ্রু ফেললো। লছ্‌মী অভিশাপ দিলো, কাঁদলো, তারপর মার খাওয়া স্বামীকে নিয়ে এগোলো নিজের কুটিরের দিকে। গ্রামের মানুষেরাও যে যার নিঃশব্দে পথ ধরলো।

শুধু একটি কিশোর, যে একটু আগে মালিকের ঘুড়ি ওড়ানোয় সাহায্য করছিলো, তুলে নিলো একটা ঢিল, মালিকের জানলার কাঁচ তাক করে ছুঁড়লো। কাঁচটা ফাটলো, কিন্তু ভাঙলো না। তারপর কয়েকটি বোবা বাছুরের পাশ কাটিয়ে সে ছুটলো মাটির পথ ধরে।

সারা পর্দাটা ততক্ষণে লাল হয়ে উঠছে।

এই হলো সংক্ষেপে অংকুরের কাহিনী। চিত্রনাট্য মোটের ওপর সুসংবদ্ধ। ক্যামেরার কাজ চমৎকার। কয়েকটি দৃশ্য মনে রাখার মতো। ছবিটি আগাগোড়া রঙীন। রঙের ব্যবহারও সর্বত্র মানানসই। অভিনয় মর্মস্পর্শী। প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীই অভিনয় জানেন। এদের মধ্যে অনেকেই আবার পুনা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী। অভিনয়ের হাজারো কৌশল হাজারো পদ্ধতি যার যতটুকু জানা আছে, মনে হয়, ছবিতে সকলেই উজাড় করে সব ঢেলে দিয়েছেন।

এ গেলো একটা দিক, এবার আরেকটা। ছবির অন্তর্বস্তু এবং তার বিন্যাস।

শুরুতেই বলেছি, ছবির পটভূমি এক গ্রাম— এই ভারতেরই শতসহস্র গ্রামের মধ্যে সরল সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের মানুষেরা নানান পেশায় নিযুক্ত রইলেও মূলতঃ তারা কৃষিজীবী। কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাদের রুটির সম্পর্ক। যে মালিকের জমিজমা তালগাছ খামারবাড়ি কেন্দ্র করে ছবিটির মূল বিন্যাস, সেই জমিজমা তালগাছ খামারবাড়িতেও দেখি জীবিকার জন্য কাজে লিপ্ত অনেক গ্রাম্য মানুষকে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এই মানুষগুলি বড় নিঃশব্দ, বড় শান্ত। তারা প্রতিবাদ করে না, প্রতিরোধ তো দূরের কথা। মালিক যখন নিজস্ব জলাধার থেকে সকলের জল নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখনও তারা যেমন চুপচাপ, লছ্‌মীর স্বামীকে অকারণে যখন বেধড়ক চাবুক মারে, তখনও। এদিকে মালিকের প্রত্যক্ষ অস্ত্র বলতে কিন্তু ঐ সামান্য চাবুকটা। কোনো বন্দুক নেই, রাইফেল নেই, কাছাকাছি তেমন কোনো কোতোয়ালীও নেই। (কেষ্টকে গাধায় চড়িয়ে গ্রাম পরিক্রমার দৃশ্যে এই কোতোয়ালীর একজন জমাদারকে আমরা দেখেছি, শোভাযাত্রার পুরোভাগে সে, অতি দীন পোশাক, হাতে মাত্র একটা লাঠি)। সর্বোপরি, বিস্তীর্ণ খামারবাড়িতে মালিক থাকে একলা। এমতাবস্থায়, এতো অত্যাচার সয়েও গ্রামের লোকগুলো গর্জে ওঠে না? সোচ্চার, কি কোনো নিরুচ্চার প্রতিবাদ পর্যন্ত করে না? প্রতিরোধের জন্য সংঘবদ্ধ হয় না?

জানিনা, এ কোন্ গ্রামের ছবি আঁকতে চেয়েছেন পরিচালক! যদি সময়ের বিচারে আসি, এ হলো সেই যুগ, যখন থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চেহারা পালটাচ্ছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়টা। সন তারিখের হিসেব মেলালে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে। কিন্তু সেই সময়ের সেই গ্রাম কি আজও আছে? সেই ব্যবস্থা? সেই এক তরফা প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন-শোষণ? তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরে এই উনিশশো পঁচাত্তরেও কি অনড় অচল গাছপাথরের গ্রাম অনড় অচলই হয়ে আছে?

অবশ্যই না। বিগত তিরিশ বছরে সংগ্রামের হাজারো ইতিহাস লেখা হয়েছে ভারতের হাজারো গ্রামের ধূলিকণায়। সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে সশস্ত্র লড়াই পর্যন্ত হয়েছে, হচ্ছে। শোষণ ইতিমধ্যে রূপ বদলেছে। বদলেছে মানুষেরাও। যে একদিন মাথা নীচু করে সব মেনে নিতো, সে এখন মানে না, গর্জে ওঠে, অস্ত্র শানায়। এগুলো বাস্তব। এর নজির রোজ যে কোনো খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই চোখ পড়ে।

এবং একজন সৎ শিল্পীর কাজ হলো ব্যাপক মানুষের এই শ্রেণী-ঘৃণা, এই বলিষ্ঠতার দিকটাই বারবার দর্শকদের সামনে তুলে ধরা, এই বলিষ্ঠতাকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের ছবি আঁকা। এরই নাম বিপ্লবী রোম্যান্টিকতা বা বিপ্লবী বাস্তবতা। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিনে' যা দেখেছি। ঐতিহাসিকভাবে এই যুদ্ধ জাহাজের নাবিকেরা শেষ পর্যন্ত জিততে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা যে সংগ্রাম করেছিলেন, যে বীরত্ব ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই বলিষ্ঠতাটুকু দিয়েই আইজেনস্টাইন শেষ করেছেন তাঁর ছবি, এঁকেছেন ভবিষ্যতের আশার চিত্র— নাবিকেরা বিজয়ী, জাহাজের মাথায়

উড়ছে বিপ্লবী নাবিকদের নিজস্ব পতাকা, জাহাজ জল কেটে এগিয়ে চলেছে, হাজার হাজার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

আর অংকুর? যেখানে আজকের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো গ্রামে গ্রামে সংবদ্ধ মানুষের অভ্যুত্থান— প্রতিরোধ, সংগ্রাম, সশস্ত্র লড়াই— অংকুরের গ্রামে এর কোনোটাই নয়, কেবল একটা ছোট্ট ঢিল, যার আঘাতে নিরস্ত্র একাকী চরম ভীরু প্রকৃতির সামন্তমালিকের জানলার কাচে ফাটল ধরে, কিন্তু ভাঙে না। এই কি আজকের বাস্তব? যদি বলি, এইভাবে লেখক ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের অব্যাহত ধারাকে এতোটুকু না এগিয়ে অনেক অ-নে-ক পেছনে ঠেলে দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে দর্শকের চিন্তাধারাকেও— কথাটা কি খুব একটা অন্যায় হবে?

গভীর দুঃখের বিষয়, 'কোরাস' আর 'অংকুর' একই সময়ের ছবি, 'কোরাস' চলেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ, 'অংকুর' এখনো চলছে। তাবৎ তথাকথিত লোক দেখানো বিপ্লবীর দল অংকুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর শিল্পকার্য কাহিনী বিন্যাস এবং সর্বোপরি শেষের ঢিল ছোঁড়াটি নিয়ে তাঁরা বিস্তর ভালো ভালো মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন— এই হলো আজকের ভারতীয় গ্রামদেশের সঠিক ছবি। জানিনা, তাঁরা সকলে 'কোরাস' দেখেছেন কিনা। কোরাসে গ্রামের জোতদারের বাড়িতে ঢুকে হাজার হাজার ত্রিশহাজারী মানুষের সেই গোলা লুঠ করার দৃশ্যটি— সেটাকে তাঁরা কি বলবেন?— বেঠিক?

অনীক, জুলাই ১৯৭৫